AN E-E PUBLICATION

শিক্ষাবিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব



অরুণ ঘোষ

এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজ

শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব

অরুণ ঘোষ এম্.-এ. (দর্শন ও শিক্ষা) বি-এড্
স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত (বিশ্বভারতী)
অধ্যাপক, শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজ, কলিকাতা-১৯

এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজার্স
কেন্দ্রালয় - ১৬ এ, ফার্ন রোড, কলি-১৯ :: বিক্রয়কেন্দ্র-৫/১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলি-৯

শুক্লা রায়চৌধুরী কর্তৃক
এডুকেশানাল এণ্টারপ্রাইজার্সের
পক্ষ থেকে প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৫৯
দ্বিতীয় সংস্করণ : আগষ্ট ১৯৬১
তৃতীয় সংস্করণ : জুলাই ১৯৬২
চতুর্থ সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৬২

দাম আট : টাকা

পিয়ারলেস প্রেস, ৯, রাধানাথ মল্লিক লেন
থেকে কমল কুমার নাগ কর্তৃক মুদ্রিত

প্রথম সংস্করণ

শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব লেখার সময় একটা বিস্ময়কর অনুভূতির মধ্যে দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছিল। মনে হয়েছিল আমি যেন একটা অতি-দ্রুত-চলমান রেলগাড়ি করে চলেছি। আর দু-পাশের জমি ঘরবাড়ি গাছপালাগুলি মুহূর্তের জন্য দেখা দিয়ে পেছনে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, কোনটাই স্থির বা অপরিবর্তি থাকছে না। বিস্মৃত অতীতের বৈদিক যুগ বা গ্রীসের সোফিষ্টদের সময় থেকে সুরু করে আজকের দিন পর্যন্ত শিক্ষাবিজ্ঞানে যে সকল নীতি, তত্ত্ব এবং প্রথাগুলি প্রচলিত হয়ে এসেছে সেগুলি একের পর এক আমার চোখের সামনে আবির্ভূত হয়ে পর মুহূর্তে মিলিয়ে যেতে সুরু করল। যে তত্ত্ব, যে বিশ্বাস, যে ব্যাখ্যা একটা বিশেষ যুগে সর্বোত্তম এবং সুপ্রতিষ্ঠিত বলে মনে হল পরবর্তী যুগে সেটি অসার অসত্য এমন কি ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হল। যে আদর্শ ও পদ্ধতিকে ভিত্তি করে এক যুগে সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাটাই গড়ে উঠেছিল পরবর্তী যুগে সে আদর্শকে বিতাড়িত করাই যেন শিক্ষার একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়াল। পরিবর্তন ও নূতনত্ব মানব চিন্তার সমস্ত বিভাগের একটা পরম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন এত মূলগত ও দ্রুত যে অন্য কোন ক্ষেত্রের সঙ্গে তার তুলনা চলে না।

শিক্ষার তত্ত্বগুলির এই অস্বাভাবিক পরিবর্তশীলতার একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। শিক্ষাবিজ্ঞানকে যদিও একটা স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে আমরা গঠন করার প্রয়াস পেয়েছি প্রকৃতপক্ষে এটি মানব আচরণের সমস্ত দিকগুলির একটা সুসমন্বিত রূপ। মানব-সত্তার বিভিন্ন জীবনাংশগুলিকে সুসংহত ও সুসংবদ্ধ করে এক পূর্ণাঙ্গ সার্থক জীবন গড়ে তুলতে সাহায্য করাই শিক্ষাবিজ্ঞানের লক্ষ্য। অতএব শিক্ষার লক্ষ্য, পদ্ধতি, সংগঠন ইত্যাদির সুষ্ঠু সংব্যাখ্যান নির্ভর করছে মানবচিন্তার অন্যান্য বিভাগগুলির পূর্ণতাপ্রাপ্তির উপর। দর্শনশাস্ত্র থেকে সুরু করে মনোবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞান, শরীররতত্ত্ব, জননতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র, কলাশাস্ত্র, সৌন্দর্যতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন চিন্তাধারার ত্রুটিহীন সংব্যাখ্যানই শিক্ষার তত্ত্বরচনার পক্ষে অপরিহার্য। যেহেতু এর সব কটি শাস্ত্রই তাদের বিকাশপ্রক্রিয়ার মধ্যপথে সেজন্য শিক্ষার মূল-তত্ত্বগুলিও সদা-পরিবর্তনশীল। বর্তমানে শিক্ষাবিজ্ঞানে অধুনা গৃহীত শিক্ষাতত্ত্ব-গুলি সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। তবে সেগুলি দীর্ঘ পরীক্ষণ ও গবেষণা থেকেলব্ধ তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে সেগুলির বুনিয়াদ অপেক্ষাকৃত দৃঢ়।

বিংশ শতাব্দীর সূত্রপাতে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে ভাব-বিপ্লব সুরু হয় তার অভিনবত্ব ও বিরাটত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে

গোটা শিক্ষাব্যবস্থাটাকেই এই বিদ্রোহী চিন্তাধারার চাপে নতুন রূপে ঢেলে গড়া হয়েছে। ভারতে তার দু'একটা বিচ্ছিন্ন তরঙ্গ এসে পৌছনর ফলে এখানে ওখানে মন্টেসরি কিণ্ডারগার্টেন ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে, বা সরকারী দপ্তরে নতুন শিক্ষাধারা গড়ার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু কোথাও শিক্ষার এই নতুন পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণ রূপ দেবার ব্যবস্থা নেই। সর্বত্রই স্বল্পজ্ঞানজনিত অসংহত প্রচেষ্টা।

যে সকল মৌলিক তত্ত্বগুলির উপর শিক্ষাপ্রক্রিয়াটি প্রতিষ্ঠিত সেগুলির আধুনিক সংব্যাখ্যান এই বইটিতে পাওয়া যাবে। আমাদের দেশে শিক্ষার প্রচলিত রূপটি কত ত্রুটিপূর্ণ এবং তার ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়েরই যে শ্রম ও উদ্যমের কি অপরিসীম অপব্যয় নিত্য ঘটে থাকে তার কিছুটা আভাস শিক্ষার এই আধুনিক সংব্যাখ্যানের সঙ্গে পরিচিত হলে আমরা জানতে পারি।

এই বইখানি প্রধানত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের জন্যই লেখা এবং এর বিষয়বস্তু নির্বাচনে বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত পাঠক্রমকে অনুসরণ করা হয়েছে। কিন্তু আলোচনার প্রকৃতি ও গতিধারাকে সাধারণের পঠন ও গ্রহণের উপযোগী করেই নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীরা এই বইটি থেকে যেমন সাহায্য পাবেন, তেমনই পিতামাতা এবং সাধারণ মানুষ তাঁদের সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা ভূখণ্ডে ভ্রমণের সুযোগ পেয়ে কিছুটা উপকৃত হবেন।

১৬এ ফার্ন রোড
কলিকাতা — ১৯
১লা ডিসেম্বর, ১৯৬১

অরুণ ঘোষ

তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ

শিক্ষাবিজ্ঞানর মূলতত্ত্বের তৃতীয় সংস্করণে কতকগুলি নতুন পরিচ্ছেদ যোগ করা হল। শিক্ষার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ কয়েকজন শিক্ষাবিদের শিক্ষাতত্ত্ব ও পদ্ধতির বিশদ আলোচনাও এ সংস্করণে সংযোজিত হল। শিক্ষার মৌলিক তত্ত্বগুলি সমুদ্রের মত গভীর হলেও পার্বত্য নির্ঝরিণীর মত চঞ্চল ও পরিবর্তনধর্মী। অতএব এ সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ পুস্তকরচনার দাবী করা সম্ভবই নয়। তবে বর্তমান সংস্করণে আধুনিক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বগুলি যতদূর সম্ভব পরিবেশনের চেষ্টা করা হয়েছে।

১৬এ ফার্ন রোড
কলিকাতা — ১৯
২৮শে জুলাই, ১৯৬৫

অরুণ ঘোষ

সূচীপত্র

এক

শিক্ষা

সভ্য অসভ্য আধুনিক প্রাচীন যে কোন জাতির নিত্য-ব্যবহৃত শব্দমালা পরীক্ষা করলে যে কথাটির প্রতিশব্দ অতি অবশ্যই পাওয়া যাবে সেটি হল শিক্ষা। আর এ কথাও বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে ভবিষ্যতে যে কোন নতুন জাতিই পৃথিবীর বুকে দেখা দিক না কেন, শিক্ষা কথাটা যে তাদের শব্দ-সম্ভারের একটা বড় জায়গা জুড়ে থাকবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শিক্ষার গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা সম্বন্ধে সব কালের মানবসমাজই একান্তভাবে সচেতন। বিশেষ করে শিক্ষা ছাড়া আধুনিক যুগের প্রগতিশীল মানবসমাজের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, চিন্তামূলক সকল-প্রকার অগ্রগতিই যে শিক্ষার উপর নির্ভরশীল একথা সর্বজনস্বীকৃত। জীবিকা অর্জন, রাষ্ট্রিক কর্তব্যপালন, সু-সংহত সমাজগঠন, চিন্তাশক্তির উন্নতি, সভ্যতার অগ্রগতি, এমন কি সুষ্ঠুভাবে ব্যক্তি-জীবনযাপন এ সকলের জন্যই যে আমরা শিক্ষার কাছে ঋণী এ সত্যও অনস্বীকার্য। এক কথায় বলা যেতে পারে যে শিক্ষা আমাদের অতীত সংস্কৃতির বাহক, বর্তমান সভ্যতার পোষক ও ভবিষ্যৎ প্রগতির জনক।

শিক্ষার সঙ্কীর্ণ বা লৌকিক অর্থ

কিন্তু তবু সাধারণ মানুষ তার দৈনন্দিন ভাষণে শিক্ষার একটা সঙ্কীর্ণ অর্থের উপরই নির্ভর করে থাকে। শিক্ষা বলতে সে বোঝে কোন একটি বিশেষ জ্ঞান-অর্জন বা কোন বিশেষ একটি কৌশল আয়ত্ত করা। ইংরাজী ভাষায় ব্যবহৃত এডুকেশান (education) কথাটির মূল ল্যাটিন অর্থও অনেকটা এই ধরনের—কোন জ্ঞান বা কৌশল আয়ত্ত করা। আদিম মানুষ যখন তার পিতা বা সমাজের অন্যান্য বয়ঃপ্রাপ্তদের কাছ থেকে শিখল কেমন করে পশু শিকার করতে হয় বা কেমন করে কুটীর বাঁধতে হয় বা আধুনিক মানুষ যখন জানল কেমন করে রোগের

চিকিৎসা করতে হয় বা কেমন করে আইনের ব্যাখ্যা করতে হয় তখনই বলা হয় যে সে শিক্ষালাভ করেছে। শিক্ষার এই অর্থকে এগিয়ে নিয়ে গেলে দেখা যাবে যে শিক্ষার বিষয়বস্তুরূপে বিভিন্ন শাস্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে, এবং তাদের পৃথকত্ব বজায় রাখার জন্য তাদের বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে, যেমন সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যা, আইনশাস্ত্র, ভাস্কর্য ইত্যাদি। এই সকল বিদ্যায় আবার শিক্ষার্থীকে পারদর্শী করার জন্য তৈরী হয়েছে বিশেষধর্মী সব বিদ্যায়তন এবং দেখা দিয়েছেন বিভিন্ন শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগোষ্ঠী। যারা এই শ্রেণীর সুনির্দিষ্ট বিদ্যায়তনের মাধ্যমে এবং বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের অধ্যাপনায় কোন না কোন শাস্ত্রে দক্ষতা লাভ করে থাকে তাদেরই সাধারণত আমাদের সমাজে শিক্ষিত বলা হয়ে থাকে, আর যারা তেমন কোন বিশেষ শাস্ত্রে পারদর্শিতার দাবী করতে পারে না, তারা অশিক্ষিত বলেই পরিচিত। এক কথায় সঙ্কীর্ণ বা লৌকিক অর্থে শিক্ষা এবং কোন বিশেষ বিদ্যায় পারদর্শিতা-অর্জন এই দুইই হল সমার্থক। সেইজন্য এই অর্থ অনুযায়ী এমন মানুষ বহু থাকতে পারে যারা অশিক্ষিত। বস্তুত আমাদের সভ্য সমাজে শিক্ষিত অশিক্ষিতের যে ভেদাভেদ করা হয় তা শিক্ষার এই সঙ্কীর্ণ ব্যাখ্যার উপরই প্রতিষ্ঠিত।

এই সঙ্কীর্ণ অর্থে শিক্ষাকে গ্রহণ করলে এবং যা এতদিন করে আসা হয়েছে—শিক্ষার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেগুলি সংক্ষেপে এই—

প্রথমত, সঙ্কীর্ণ অর্থে শিক্ষা হল কোন বিদ্যায়তনের মাধ্যমে শিক্ষকদের নিকট হতে বিশেষ পাঠ গ্রহণ এবং অনুশীলন ও প্রচেষ্টার সাহায্যে সেই পাঠ আয়ত্ত করা। অর্থাৎ এককথায় শিক্ষা বললে বোঝায় স্কুল কলেজ প্রভৃতি বিদ্যায়তনে অধ্যয়ন এবং যারা তা করেনি তারা সমাজে অশিক্ষিতের গোষ্ঠীভুক্ত। আধুনিক কালে আবার শিক্ষায় সাফল্যের মাপকাঠি হিসাবে সৃষ্ট হয়েছে পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি এবং ফলাফলের উপর ডিগ্রী, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট প্রভৃতি প্রদানের প্রথা। ফলে লৌকিক ব্যবহারে আজকাল শিক্ষা বলতে দাঁড়িয়েছে কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পাঠ শেষ করে একটি ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট হস্তগত করা। এটি হল শিক্ষার সঙ্কীর্ণতম ব্যাখ্যা।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক হল নিছক দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ক। শিক্ষক দেবেন, শিক্ষার্থী নেবে। শিক্ষার্থীর মনটি যেন শূন্য ভাণ্ডের মত, শিক্ষক তাঁর অর্জিত জ্ঞান ও বিদ্যা দিয়ে সে ভাণ্ডার পূর্ণ করে দেবেন

শিক্ষার্থীর পক্ষে নিশ্চেষ্টভাবে গ্রহণ করা ছাড়া আর কিছু করবার নেই, যেমন কলের তলায় বসান কলসীর নিজের কিছু করার থাকে না।

তৃতীয়তঃ শিক্ষার বিষয়বস্তু, তা সে জ্ঞান বা কৌশল যাই হক না কেন, তার প্রকৃতি সুনির্দিষ্ট, পূর্ণাঙ্গপ্রাপ্ত এবং অপরিবর্তনীয়। শিক্ষকের কাজ হল সেই পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দেওয়া। সেই জ্ঞানের মধ্যে কোন পরিবর্তন আনা শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব নয়, এবং তার প্রয়োজনও নেই। এই অর্থে স্কুল কলেজ প্রভৃতিকে জ্ঞান-বিপণী (Knowledge shop) বলা যেতে পারে, যেখানে শিক্ষক হলেন জ্ঞানের পসারী, ছাত্রছাত্রীগণ হল সেই জ্ঞানের ক্রেতা। আধুনিক শিক্ষাবিদগণ জ্ঞানের এই নিষ্ক্রিয় পরিকল্পনার তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে এই ধরনের পূর্ণাঙ্গ ও অপরিবর্তনীয় জ্ঞান প্রাণহীন এবং তার কোন বাস্তব উপকারিতা নেই, কেননা শিক্ষার্থী তার জীবন-সমস্যার সমাধানে সেগুলির প্রয়োগ করতে পারে না।

চতুর্থত শিক্ষার এই ব্যাখ্যায় শিক্ষার্থীর নিজস্ব চাহিদাকে কোন স্থান দেওয়া হয়নি। অপরিণত শিক্ষার্থীর উপর বয়ঃপ্রাপ্তদের প্রতিক্রিয়াকেই শিক্ষা বলা হয়েছে। শিক্ষার্থী যেন এক তাল নরম মাটি, আর পিতামাতা-শিক্ষকদের প্রভাব যেন কঠিন ছাঁচ, যার চাপে ঐ নরম কাদার তাল বিশেষ ও অভীষ্ট আকৃতি গ্রহণ করে। শিক্ষার্থীর যে নিজস্ব একটা গঠন প্রচেষ্টা থাকতে পারে তা এখানে স্বীকার করা হয় না।

পঞ্চমত, শিক্ষার এই সঙ্কীর্ণ ব্যাখ্যা থেকে জন্মগ্রহণ করেছে শিক্ষার বহুবিধ লক্ষ্যের বর্ণনা। যেমন কারও মতে শিক্ষার লক্ষ্য পূর্বপুরুষদের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া, কারও মতে মনের উন্নতি করা, কারও মতে আবার বৃত্তি নির্বাহের যোগ্যতা অর্জন করা ইত্যাদি। কিন্তু এই লক্ষ্যগুলির বর্ণনার মূলে শিক্ষা সম্বন্ধে অতি সঙ্কীর্ণ ধারণা থাকার ফলে এর কোন লক্ষ্যটিই সম্পূর্ণ নয়। "শিক্ষার লক্ষ্য" পর্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

শিক্ষার ব্যাপক অর্থ বা প্রকৃত শিক্ষার রূপ

কিন্তু শিক্ষার এই অর্থ নিতান্তই সঙ্কীর্ণ এবং ভ্রমাত্মক। শিক্ষাবিজ্ঞানে শিক্ষাকে গ্রহণ করা হয়েছে তার প্রকৃত তাৎপর্যে—অনেক ব্যাপক ও উদার অর্থে।

শিক্ষার এই ব্যাপকতর ব্যাখ্যার মূলে আছে আধুনিক কালের সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের বহুল উন্নতি। মানুষের ব্যক্তিগত ও সমাজগত এই উভয় প্রকারের আচরণ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে শিক্ষার কর্মক্ষেত্র কেবলমাত্র নিছক কোন তথ্য আহরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, দৈর্ঘ্য ও প্রসার উভয় দিক দিয়েই তা মানবজীবনের সঙ্গে সমব্যাপী। শিক্ষার সুরু হয় জন্ম হতে,—আরও নিখুঁতভাবে বলতে গেলে মাতৃগর্ভে থাকার সময় হতেই এবং শিক্ষার শেষ হয় জীবনের সমাপ্তিতে।

এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে আমরা কি বুঝি? এককথায় মানুষের যে কোন নতুন অভিজ্ঞতাকেই শিক্ষা বলা চলতে পারে। জন্মের সময় থেকেই শিশুর প্রতিটি মুহূর্ত অভিজ্ঞতাময়। প্রতি ক্ষণেই সে নিত্য অভিজ্ঞতা অর্জন করে চলেছে। যে অভিজ্ঞতা পূর্বমুহূর্তে ছিল সত্য, পরমুহূর্তে সে অভিজ্ঞতা গেল বদলে, সেটি হয়ে গেল বাতিল, তার স্থান অধিকার করল নতুন আর একটি অভিজ্ঞতা। এই যে ক্রমাগত বিরামহীন অভিজ্ঞতার সৃষ্টি, পরিবর্তন ও পুনর্গঠন একেই সত্যকারের শিক্ষা বলা হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে স্কুল কলেজে লব্ধ বিদ্যা বা বিশেষ কোন শিল্পে অর্জিত পারদর্শিতাই কেবলমাত্র শিক্ষা নয়। শিক্ষা জীবনব্যাপী একটি ছেদহীন প্রক্রিয়া, যার মধ্যে দিয়ে প্রতি প্রাণীকেই প্রতিনিয়তই জীবন কাটাতে হচ্ছে।

সত্যকারের শিক্ষা স্কুল-কলেজ বা শিক্ষকের উপর সব সময় নির্ভরশীল নয়। কেননা অভিজ্ঞতাবিহীন মানুষ নেই, হতে পারে না।

যদিও বৈচিত্র্য, উৎকর্ষ ও সংখ্যার দিক দিয়ে দু'জন মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রচুর বৈষম্য থাকতে পারে, তবুও একেবারে শিক্ষা নেই এমন লোক হতে পারে না। বর্ণমালা কখনও চোখে দেখেনি এমন ব্যক্তি থাকতে পারে কিন্তু তবুও সে শিক্ষাহীন নয়। এমনও হতে পারে যে, সে অনেক গ্রন্থকীট অপেক্ষা অধিক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষার অধিকারী। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে শিক্ষার এই অর্থ গ্রহণ করা হয়। এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য-গুলি সংক্ষেপে এই।

প্রথমত শিক্ষার প্রথম বৈশিষ্ট্য হল এর অভিনবত্ব। সেই অভিজ্ঞতাই শিক্ষা, যার মধ্যে কিছু-না-কিছু নতুন উপাদান আছে।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষা বা নতুন অভিজ্ঞতার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল প্রাণীর আচরণের উপর এর প্রভাব। সত্যকারের শিক্ষামাত্রেই প্রাণীর বর্তমান আচরণের

মধ্যে কোন-না-কোনরূপ পরিবর্তন আনবেই। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা সেখানেই। যে অভিজ্ঞতা প্রাণীর আচরণকে প্রভাবান্বিত করতে পারে না বা তার মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন আনতে পারে না তাকে শিক্ষা বলা চলবে না। শিক্ষার একটা বড় লক্ষণ হচ্ছে যে সেটি আমাদের অভিজ্ঞতাকে আমাদের কাছে অর্থময় করে তোলে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। অনেক পুঁথিলব্ধ বিদ্যা এই কারণে সত্যকারের শিক্ষার পর্যায়ে পড়ে না। প্রায়ই দেখা গেছে যে শিক্ষার্থী বহু তথ্য ও জ্ঞান আয়ত্ত করেছে কিন্তু সেগুলি সে তার বাস্তব আচরণে কাজে লাগাতে পারছে না। অতএব এ জ্ঞান নিষ্ক্রিয় জ্ঞান এবং সত্যকারের শিক্ষা নামের যোগ্য নয়।

তৃতীয়ত, আচরণ পরিবর্তনে সক্ষম অভিজ্ঞতা মাত্রকেই আবার শিক্ষা নাম দেওয়া হয় না, যদিও এই শ্রেণীর সকল অভিজ্ঞতাই শিক্ষা নামের যোগ্য। এমন কতকগুলি অভিজ্ঞতা আছে যেগুলি আমাদেব আচরণে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হলেও, সেগুলির মধ্যে শিক্ষণীয় উপাদানের অভাব বা অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্য থাকার জন্য সেগুলি শিক্ষার পর্যায়ে পড়ে না। যেমন মনে করা যেতে পারে চুরি করা, হত্যা করা, প্রবঞ্চনা করা, প্রভৃতি অভিজ্ঞতাগুলি প্রাণীর আচরণে পরিবর্তন আনতে সক্ষম। কিন্তু এগুলির অবাঞ্ছিত প্রকৃতির জন্য এগুলিকে শিক্ষা বলা যেতে পারে না। কোন্ অভিজ্ঞতাটি বাঞ্ছনীয় আর কোনটি অবাঞ্ছনীয় তার নির্ণয় অবশ্য করবে সামাজিক অনুশাসন ও ব্যক্তির নিজস্ব মঙ্গলের মাপকাঠি।

সামাজিক অনুশাসন আবার সব দেশে সব কালে এক নয়। ফলে দেশ ও সময় ভেদে শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতার স্বরূপের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। যেমন, প্রাচীন গ্রীক রাষ্ট্র স্পার্টায় রুগ্ন বা দুর্বল সন্তান জন্মালে তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করাটা কর্তব্য বলে বিবেচিত হত। কিন্তু আধুনিক কোন সভ্যসমাজই এ প্রথাটিকে কখন সমর্থন করবে না, অনুসরণ করা দূরে থাকুক। তবে বিভিন্ন মানব সমাজের মধ্যে এই রকম কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও অধিকাংশ মৌলিক ধারণার দিক দিয়ে সকল সভ্য সমাজই একমত, সেইজন্য শিক্ষার একটা সর্বদেশীয় ও সর্বজনীন রূপ খুঁজে পেতে কষ্ট হয় না।

ব্যক্তির মঙ্গলের মাপকাঠিটি নির্ধারিত করাটা কিন্তু একটা সমস্যামূলক ব্যাপার। প্রাচীনকালে যখন মনোবিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হয় নি, তখন ব্যক্তির পক্ষে কোন্ অভিজ্ঞতাটি ভাল আর কোন্ অভিজ্ঞতাটি মন্দ এটি নির্ণয় করা হত কতকগুলো ধারণা ও অনুমানের উপর নির্ভর করে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে ভ্রমাত্মক

এমন কি ক্ষতিকর নির্দেশও দেওয়া হত। কিন্তু আধুনিক কালে মনোবিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতির ফলে ব্যক্তির পক্ষে বাঞ্ছনীয় অভিজ্ঞতার স্বরূপ নির্ণয় করা সহজ হয়ে উঠেছে। যেমন, প্রাচীনকালে মনে করা হত যে শিশু জন্মায় কতকগুলি কু-প্রবৃত্তি ও অবাঞ্ছিত প্রবণতা নিয়ে, অতএব তাকে ভালভাবে মানুষ করতে হলে কঠোর শাসনের মধ্যে রাখতে হবে। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে শিশুর এই জন্মগত কু-প্রবণতার কথা বিশ্বাস ত করা হয়ই না বরং শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশের জন্য তাকে যে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন এই কথাই বিশেষ করে বলা হয়।

শিক্ষাই সঙ্গতিবিধান

আমরা পূর্বেই বলেছি যে শিক্ষার এই আধুনিক ও ব্যাপক ব্যাখ্যার মূলে আছে মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের বহুল উন্নতি। মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে প্রাণীর আচরণ মাত্রেই হল তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা। পরিবেশ আবার কতকগুলি বিভিন্নধর্মী শক্তির সমাবেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই পারিবেশিক শক্তিগুলির সঙ্গে ঠিকমত খাপ খাওয়াতে পারার উপরই নির্ভর করছে প্রাণীর অস্তিত্ব এবং সেইজন্যই পরিবেশের তাগাদা অনুযায়ী প্রাণীকে তার আচরণ নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, বদলাতে হবে, প্রয়োজন হলে পুরাতন আচরণকে পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ নতুন আচরণকে গ্রহণ করতে হবে। যে প্রাণী তা পারে সে পৃথিবীতে টিঁকে থাকে, যে পারে না সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই যে আচরণের বা অভিজ্ঞতার নিয়ন্ত্রণ, পরিবর্তন, পুনর্গঠন—এরই নাম শিক্ষা। অতএব দেখা যাচ্ছে যে মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে শিক্ষা প্রাণীর বেঁচে থাকার একমাত্র পাথেয়, এবং কেবলমাত্র স্কুলে-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ করা ব্যক্তিই শিক্ষিত নয়. পৃথিবীর হীনতম মানুষেরও যথেষ্ট শিক্ষা আছে, এমন কি বনের নিম্নতম পশুও শিক্ষা ছাড়া এক পাও চলতে পারে না।

শিক্ষা ও শিখন

এটি হল কিন্তু শিক্ষার ব্যাপকতম অর্থ। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এই প্রক্রিয়ার নাম দেওয়া হয়েছে শিখন (learning)। কিন্তু শিক্ষাবিজ্ঞানে এই

অর্থকে কিছুটা সঙ্কুচিত করে গ্রহণ করা হয়েছে। সেখানে শিখন (learning) এবং শিক্ষা (education) এ দুইএর মধ্যে পার্থক্য করা হয়। সব শিখনই শিক্ষা নয়; যদিও সব শিক্ষাই শিখন। শিক্ষা বলতে কেবল সেই সকল অভিজ্ঞতা বা আচরণকে বোঝায় যা সমাজ ও ব্যক্তির পক্ষে বাঞ্ছনীয়। শিক্ষার এই মান নির্ণয়ে শিক্ষাবিজ্ঞানকে সাহায্য করে সমাজবিজ্ঞান অর্থাৎ যে সব নতুন অভিজ্ঞতা ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর নয় সেগুলিকে শিক্ষাবিজ্ঞানে শিক্ষা বলে গ্রহণ করা হবে না, যদিও মনোবিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় সেগুলি শিখনের পর্যায়ে পড়বে। কোন্ শিখনটি শিক্ষামূলক এবং কোন্ শিখনটি শিক্ষামূলক নয় এটি নির্ধারণ করাই শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রধানতম কাজ এবং নীতিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি অন্যান্য বিজ্ঞানগুলি শিক্ষাবিজ্ঞানকে এই কাজে সাহায্য করে থাকে।

শিক্ষাই সমাজ-সংরক্ষণ

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যেমন শিক্ষা ব্যক্তির অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রচেষ্টা তেমনি সমাজবিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় শিক্ষা হল সমাজকে বাঁচিয়ে রাখার একটি প্রক্রিয়া বিশেষ। সমাজ বলতে কেবল খানিকটা দেশ বা বাড়ী ঘর বা কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টিকেই বোঝায় না। সেই ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচলিত রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, তাদের অতীত ঐতিহ্য ও কৃষ্টি, তাদের ভাব, ভাষা, চিন্তা, বিশ্বাস, সংস্কার, জ্ঞান, কৌশল এই সকলের একটি সামগ্রিক রূপকে বোঝায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যেই নিহিত থাকে কোন একটি সমাজের নিজস্বতা এবং একটি সমাজ থেকে আর একটি সমাজের যে পার্থক্য তাও থাকে ঐ বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে।

অতএব কোন সমাজকে বেঁচে থাকতে হলে তার এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তার জন্য বর্তমান সমাজের যারা নাগরিক তাদের হাত থেকে যারা ভবিষ্যতের নাগরিক হবে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে এই সঞ্চিত কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও ভাবধারার ভাণ্ডারটি। যদি তা না দেওয়া হয় তবে সেই দিনই সমাজের মৃত্যু ঘটবে। এই বর্তমান নাগরিকদের নিকট হতে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মধ্যে সঞ্চিত ভাবধারা ও ঐতিহ্যের সঞ্চালনের নামই শিক্ষা। এই শিক্ষার মাধ্যমেই সমস্ত সমাজ বেঁচে থাকে। পুরনো নাগরিকের দল যখন চলে যায় এবং তাদের স্থান অধিকার করে নতুন বংশধরেরা তখন শিক্ষার মাধ্যমেই সমাজ আবার নতুন জীবন লাভ করে। এইভাবে তার পুনর্জীবন লাভের ইতিহাস এগিয়ে চলে যতদিন শিক্ষার

কাজ অব্যাহত থাকে। এই সঞ্চিত ঐতিহ্য, কৃষ্টি, ভাব ও ভাণ্ডারকে এককথায় সামাজিক উত্তরাধিকার (social heritage) বলা হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে এক গোষ্ঠী হতে অপর গোষ্ঠীতে সামাজিক উত্তরাধিকারের সঞ্চালনের অপর নামই শিক্ষা এবং এইজন্যই শিক্ষাকে সমাজ-সংরক্ষণের একটি প্রক্রিয়া বলেই বর্ণনা করা হয়।

শিক্ষাই সমাজীকরণ

সমাজবিজ্ঞানের এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী ব্যক্তির আচরণ কেবলমাত্র তার দৈহিক অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যই সৃষ্ট নয় তার সামাজিক অস্তিত্বও বজায় রাখার উদ্দেশ্যে প্রসূত। এইখানেই মানুষ ও নিম্ন প্রাণীর আচরণের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের সমাজ-জীবন বলতে তেমন কিছু নেই এবং তাদের সব শিক্ষাই মূলত দৈহিক অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রসূত। এই দিক দিয়ে নিম্নপ্রাণীদের ক্ষেত্রে শিক্ষা কথাটি অপেক্ষা শিখন কথাটি অধিক প্রযোজ্য। মানুষের ক্ষেত্রে তার আচরণের একটা বড় উদ্দেশ্য হল তার সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া। কেবলমাত্র তার দৈহিক নিরাপত্তা বজায় থাকলেই সে তৃপ্ত নয়, তার চতুষ্পার্শের সমাজজীবনে নিজেকে সার্থকভাবে অঙ্গীভূত করাটাও তার একটা বড় লক্ষ্য। এই প্রক্রিয়াকে সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় সমাজীকরণ (socialisation) বলা হয়। অতএব সেই সকল অভিজ্ঞতা বা আচরণকেই শিক্ষার পর্যায়ে ফেলা হবে যেগুলি শিশুকে তার চতুষ্পার্শের সমাজজীবনের একজন করে তুলতে সাহায্য করবে। শিক্ষার সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞায় শিক্ষার এই অতি প্রয়োজনীয় দিকটাকে বাদ দেওয়া হয়েছিল।

শিক্ষাই ক্রমবিকাশ

প্রসিদ্ধ আমেরিকান শিক্ষাবিদ জন্ ডিউই এইজন্য শিক্ষাকে ব্যক্তির বিকাশ বা বৃদ্ধির (growth) প্রক্রিয়ার সঙ্গে অভিন্ন বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে শিশুর শিক্ষা তার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সমার্থক। প্রত্যেক শিশুই জন্মায় কতকগুলি সম্ভাবনা নিয়ে, যেগুলির পূর্ণ বিকাশই হচ্ছে তার জীবনের লক্ষ্য, তার অস্তিত্বের সার্থকতা। এই ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়াটি স্বতঃপ্রণোদিত,

স্বনির্ভর ও স্বাভাবিক। পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সে তার অভীষ্ট পূর্ণতায় গিয়ে পৌছয়। জন্ ডিউই এই স্বতঃপ্রণোদিত ও স্বাভাবিক বিকাশ প্রক্রিয়ারই শিক্ষা নাম দিয়েছেন।

ডিউই তাঁর শিক্ষার এই নবতম সংজ্ঞায় মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান—এই দুইয়ের দৃষ্টিকোণকে অতি সুন্দরভাবে মিলিয়েছেন। শিক্ষাকে ব্যক্তির বৃদ্ধি বা ক্রমবিকাশ বলে বর্ণনা করায় ব্যক্তির নিজস্ব ও অন্তর্নিহিত চাহিদাগুলিকে যেমন একদিকে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে তেমনি সমাজের প্রয়োজন ও নিয়ন্ত্রণকেও স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। ব্যক্তির ক্রমবিকাশ তখনই অভীষ্ট ও সুষ্ঠু পরিণতি লাভ করবে যখন ব্যক্তি তার নিজস্ব সম্ভাবনাগুলিকে পূর্ণ বিকশিত করতে পারবে আবার সেইসঙ্গে তাঁর চারপাশের সমাজজীবনের সঙ্গে নিজেকে সাফল্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। অতএব অভীষ্ট বৃদ্ধি বা ক্রমবিকাশ কথাটির দ্বারা ডিউই মানবসত্তার দুটি অতি-প্রয়োজনীয় দিকের মধ্যে একটা সংহতি এনেছেন এবং শিক্ষাকে সেই অভীষ্ট বৃদ্ধি বা ক্রমবিকাশের সঙ্গে অভিন্ন বলে বর্ণনা করে শিক্ষার জীবনব্যাপী কার্যের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন।

ব্যাপক অর্থে শিক্ষার আরও দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। প্রথমত শিক্ষা একটি প্রক্রিয়া বিশেষ এবং এই প্রক্রিয়াটি সামাজিক ও জীবনব্যাপী। শিশুর শিক্ষা সংঘটিত হয় সামাজিক পরিবেশে অর্থাৎ সমাজের অন্যান্য নর-নারী, প্রতিষ্ঠান-সংস্থা প্রভৃতির সঙ্গে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার বিনিময়ের মধ্য দিয়ে। সমাজ-বহির্ভূত পরিবেশে কোনরূপ শিক্ষা সম্ভবপর নয়। কেননা সামাজিক পরিবেশের বাইরে কোন অভিজ্ঞতা জন্মলাভ করতে পারে না, আর অভিজ্ঞতাই হল শিক্ষার একমাত্র উপাদান। এই জন্যই শিক্ষাকে জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া বলা হয়। কারণ বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা সুরু হয় মাতৃগর্ভ হতে এবং বিরামহীন গতিতে এগিয়ে চলে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। শিক্ষা বেঁচে থাকার প্রক্রিয়ারই নামান্তর।

শিক্ষার সঙ্কীর্ণ অর্থে জ্ঞান অর্জনকে শিক্ষা বলা হত এবং সেই জ্ঞান ছিল পূর্ণাঙ্গ, সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়। কিন্তু এ ধরনের জ্ঞানের সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার কোন সম্পর্ক না থাকার জন্য একে বলা হয় নিষ্ক্রিয় জ্ঞান (inert knowledge)। ডিউইর মতে জ্ঞান হবে সক্রিয় (active) ও প্রাণবন্ত।

বর্তমানের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে হবে তার উৎপত্তি এবং ভবিষ্যতের নতুন অভিজ্ঞতার সে হবে জনক।

সঙ্কীর্ণ অর্থে শিক্ষাকে মনে করা হত একমুখী প্রক্রিয়া। শিক্ষকের প্রভাব কাজ করে শিক্ষার্থীর উপর এবং নিশ্চেষ্টভাবে সে প্রভাবকে মেনে নেওয়া ছাড়া শিক্ষার্থীর আর কিছুই করার থাকে না। কিন্তু শিক্ষার এ ব্যাখ্যা অবাস্তব। শিক্ষা একটি উভয়মুখী (bipolar) প্রক্রিয়া। এতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক আদান প্রদান চলে সমভাবে। শিক্ষকের প্রভাব যেমন কাজ করে শিক্ষার্থীর উপর, তেমনই শিক্ষার্থীর প্রভাবও কাজ করে শিক্ষকের উপর। এই পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলরূপে দেখা দেয় শিক্ষা। শিক্ষার্থী কেবলমাত্র নিষ্ক্রিয় গ্রাহক নয়। সে যা নেয়, তার উপর নিজের প্রভাবকে প্রয়োগ করে, তাকে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করে আপনার মত করে নিয়ে তবে তা সে গ্রহণ করে।

প্রশ্নাবলী

1. What is education? Discuss the difference in the meanings of education when taken in the popular and in the scientific sense.

Ans. (পৃঃ ১—পৃঃ ১০)

2. What is the modern concept of education. Distinguish it from learning.

Ans. (পৃঃ ১—পৃঃ ১০)

3. Education has been used in a wider sense as well as in a narrower sense. Explain clearly the two uses of the word "Education". (B. A. Educ. 1959)

Ans. (পৃঃ ১—পৃঃ ১০)

দুই

শিক্ষার কাজ (Functions of Education)

শিক্ষা হল ব্যক্তির উপর পরিবেশের সেই প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া যা তার আচরণ, চিন্তা বা মনোভাবের মধ্যে স্থায়ী পরিবর্তন আনতে সমর্থ হয়। পরিবেশের প্রভাব বা প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে মানুষ এবং নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর উপর পরিবেশ কাজ করে বটে কিন্তু তাতে তাদের অভ্যাস বা আচরণ বদলায় না। কেননা তাদের আচরণ পরিচালিত হয় তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া প্রবৃত্তির (instinct) দ্বারা এবং ফলে সে আচরণ হয় যান্ত্রিক ও অপরিবর্তনীয়। এই জন্যই দেখা যায় যে নতুন বা পরিবর্তিত পরিবেশে পড়লেও নিম্নশ্রেণীর প্রাণীরা একই ধরনের আচরণ করে যায়, নতুন কোন আচরণ করতে পারে না। কিন্তু পরিবর্তিত পরিবেশ অনুযায়ী আচরণকে পরিবর্তন করা বা প্রয়োজন মত একেবারে নতুন আচরণ সম্পন্ন করার ক্ষমতা মানুষ এবং অন্যান্য উচ্চতর প্রাণীর মধ্যে দেখা যায়। এই ক্ষমতাটিরই মনোবিজ্ঞানে নাম দেওয়া হয়েছে নমনীয়তা (Plasticity)। এই ক্ষমতার বলে পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী মানুষ তার আচরণ বা অভ্যাসকে বদলে ফেলতে পারে।

মানুষের মধ্যে এই নমনীয়তারূপ বৈশিষ্ট্যটি আছে বলেই তার বহু আচরণ ও অভ্যাস পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে অর্জিত। অর্থাৎ এককথায় তার বহু আচরণ ও অভ্যাসই শিক্ষা-লব্ধ। কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় ও প্রাথমিক আচরণ ছাড়া আর সব আচরণই মানুষ তার পরিবেশের সংস্পর্শে এসে শেখে এবং সেই মত তার অভ্যাস গঠন করে। কিন্তু নিম্নতর প্রাণীর ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রভাব অতি অল্পই বা নেই বললেই চলে। তার সমস্ত আচরণধারা ও অভ্যাসই জন্ম থেকে তার মধ্যে নিবদ্ধ থাকে এবং সহজে বদলায় না। এর ফলে তার পক্ষে নতুন ও পরিবর্তিত পরিবেশে সহজে খাপ খাইয়ে নেওয়া সম্ভব হয় না যেমন হয় মানুষের পক্ষে। নিম্নতর প্রাণী পুরনো ও গতানুগতিক পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারে, কিন্তু নতুন পরিবেশের সামনে পড়লেই সে হতবুদ্ধি হয়ে যায়। এর ফলে তার অস্তিত্ব বজায় রাখা কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। এই দিক দিয়ে মানুষ অধিকতর

ভাগ্যবান। শিক্ষা তাকে নতুন ও পরিবর্তিত আচরণ করতে সমর্থ করেছে। ফলে নিম্নতর প্রাণীর চেয়ে উন্নততর ও অধিকতর নিরাপদ জীবনযাপনে সে সক্ষম। শিক্ষার সহায়তা পায় না বলে নিম্নতর প্রাণীর জীবনসংগ্রাম দুষ্কর, অনিশ্চিত ও সঙ্কটময় আর শিক্ষার সহায়তা লাভ করে বলেই মানুষের জীবনসংগ্রাম সহজ, নিরাপদ ও সাফল্যপূর্ণ। শিক্ষার কাজকে তাহলে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাকে আমরা মোটামুটিভাবে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি, ব্যক্তিগত সঙ্গতিসাধন, সমাজসংরক্ষণ ও অগ্রগতি।

ব্যক্তিগত সঙ্গতিসাধন (Individual Adjustment)

ব্যক্তির সঙ্গে শিক্ষার সাক্ষাৎ সম্পর্কের দিক দিয়ে ব্যক্তিগত সংগতিসাধনকে (Individual Adjustment)আমরা শিক্ষার প্রথম কাজ বলে বর্ণনা করতে পারি। শিক্ষাই ব্যক্তিকে সদাপরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সমর্থ করে। এই খাপ খাইয়ে নেওয়া কাজটা ব্যক্তির অস্তিত্ব বজায় রাখা এবং সুষ্ঠু জীবনযাপন করা এ দুয়ের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। বস্তুর শিক্ষার সৃষ্টিই হয়েছে এই দুই উদ্দেশ্যে—ব্যক্তিকে তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে সাহায্য করতে এবং তার নিজস্ব জীবনযাপনকে উন্নততর করে তুলতে।

এই দিক দিয়ে মানুষের সমগ্র পরিবেশকে তার শিক্ষার মাধ্যম বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। যে সব আচরণ মানবের অস্তিত্বরক্ষা ও সার্থক জীবনযাপনের পক্ষে অনুকূল সে সব আচরণই পরিবেশের কাছ থেকে পুষ্টি ও সহায়তা লাভ করে ও ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। আর যে সব আচরণ অস্তিত্বরক্ষা ও সার্থক জীবনযাপনের প্রতিকূল সেগুলি শেষ পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এইভাবে মানব-শিশুর মধ্যে নতুন নতুন ও অতি প্রয়োজনীয় নানা আচরণ-ধারা ও অভ্যাস প্রণালী গড়ে ওঠে। বহু প্রতিকূলধর্মী সহজাত প্রবৃত্তিও একই ভাবে পরিবেশের চাপে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে যায় বা একেবারে লুপ্ত হয়েও যায়। এই আচরণ-শিক্ষা ও অভ্যাসগঠনে শিশুর খেলাও গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তির এই সঙ্গতিবিধান প্রক্রিয়ায় পরিবেশের চাপে কেবলমাত্র ব্যক্তিই বদলায় না, ব্যক্তির চাপে পরিবেশও বদলে যায়। অসংখ্য ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী মানুষ পরিবেশকে পরিবর্তিত করে নিয়েছে। সঙ্গতিবিধানের ক্ষেত্রে শিক্ষার কাজ আবার দ্বিবিধ—পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার যোগ্য করে ব্যক্তিকে তৈরী করা

এবং পরিবেশের কাছে নিষ্ক্রিয়ভাবে আত্মসমর্পণ না করে তাকে প্রয়োজনমত পরিবর্তিত করে নিতে সমর্থ করা। শিক্ষার এই দ্বিতীয় কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাণীজগতে যে নিয়মটি সাধারণভাবে প্রাণীজীবন নিয়ন্ত্রণ করে তার নাম হল প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection)। এই নিয়ম অনুযায়ী সহস্র সহস্র ব্যক্তিজীবনের অপচয় করে জাতিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। সেখানে প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন শক্তিই নির্ধারণ করে দেয় কোন্ ব্যক্তি বেঁচে থাকবে আর কোন্ ব্যক্তি বেঁচে থাকবে না। ব্যক্তির নিজস্ব প্রচেষ্টা বা ইচ্ছার কোন মূল্যই সেখানে নেই। কিন্তু উচ্চতর প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নির্বাচনের এই নিয়মটির স্থান অধিকার করেছে শিক্ষা। প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে শিক্ষাই ব্যক্তিকে বেঁচে থাকতে এবং সার্থকতর জীবন-যাপন করতে সমর্থ করেছে। শিক্ষার সাহায্যে মানুষ এবং উচ্চতর প্রাণীরা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয় এবং দীর্ঘ ও নিরাপদ জীবনের অধিকারী হতে পারে।

সমাজ-সংরক্ষণ (Social Conservation)

শিক্ষার কাজ মূলত ব্যক্তিজীবনকে সম্ভব ও সমৃদ্ধ করা হলেও সমাজজীবনকেও তা প্রচুরভাবে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। ব্যক্তিকে তার পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিবিধান করতে সাহায্য করা হল শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য। কিন্তু ব্যক্তির পরিবেশের একটি বড় ও প্রয়োজনীয় অঙ্গ হল অন্যান্য ব্যক্তি। অতএব অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের কাজটিও শিক্ষার কাজের মধ্যে পড়ে। ফলে সমাজ-মূলক জীবনের উপর শিক্ষার প্রভাব প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

যখন কোন বিশেষ প্রাণী প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয় তখন সেই বিশেষ প্রাণীকে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ শ্রেণী বা জাতি গড়ে ওঠে। এই বিশেষ শ্রেণী বা জাতির অস্তিত্ব নির্ভর করে ঐ শ্রেণী বা জাতির অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির আচরণের উপর। ব্যক্তির সার্থক আচরণ ও সাফল্যের সঙ্গে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার উপরই নির্ভর করে জাতির অস্তিত্ব। যদি ব্যক্তি তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয় তবেই জাতি টিকে থাকতে পারে, নতুবা নয়। অবশ্য কখনও কখনও জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বিশেষ

বিশেষ ব্যক্তিকে নিজস্ব সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিতে এমন কি প্রাণ দিতেও হয়, (যেমন যুদ্ধের সময়), তবু যে সকল ব্যক্তি বেঁচে থাকে তাদের অস্তিত্বের উপরই জাতির অস্তিত্ব বজায় রাখাটা নির্ভর করে। এক কথায় জাতিগত অস্তিত্ব বলতে মূলত ব্যক্তিগত অস্তিত্বকে বোঝায় এবং শিক্ষার প্রধান কাজই হল ব্যক্তিকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও সামাজিক শক্তির প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সাহায্য করা।

কোন বিশেষ শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে যখন বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায় তখন উপরের সিদ্ধান্তটি অপরিহার্য। শিক্ষাকে ব্যক্তির সঙ্গতিবিধানের উপকরণ ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। কিন্তু শিক্ষাকে যখন সমগ্রভাবে বিচার করা যাবে তখন শিক্ষার আর একটি অতি-প্রয়োজনীয় কাজের আমরা সন্ধান পাই। সেটি হল সমাজ সংরক্ষণ বা সমাজকে বাঁচিয়ে রাখা। বিশেষ কোন শিক্ষাপ্রক্রিয়ার কাজ হল বিশেষ কোন ব্যক্তিকে সঙ্গতিবিধানে সাহায্য করা। এখন এই বিশেষ শিক্ষা-প্রক্রিয়াগুলিকে যদি এক করা যায় তবে সমগ্রভাবে শিক্ষার কাজ হবে সমস্ত ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে রাখা বা এককথায় জাতি বা সমাজকে বাঁচিয়ে রাখা।

কোন বিশেষ সমাজকে বেঁচে থাকতে হলে তাকে তার পূর্বপুরুষদের শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান, কৌশল, আদর্শ, ভাবধারা ইত্যাদির সঞ্চিত ভাণ্ডারটির অধিকারী হতে হবে। যদি আগামী বংশধরেরা এই মহামূল্য ঐতিহ্য ও জ্ঞানের ভাণ্ডারটি থেকে বঞ্চিত হয় তবে সে সমাজের অস্তিত্বই আর থাকবে না। এই ঐতিহ্য ও জ্ঞানের ভাণ্ডারটির এক গোষ্ঠী থেকে আর এক গোষ্ঠীতে হস্তান্তরকরণের নামই শিক্ষা। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, আলাপ-আলোচনা, মেলা-মেশা, উৎসব, মেলা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা অপরিণত ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের হাতে আমাদের সঞ্চিত কৃষ্টি ও জ্ঞানের ভাণ্ডারটি অল্প অল্প করে উঠিয়ে দিয়ে থাকি। শিক্ষার এই কাজটি যদি না থাকত তাহলে বিশেষ কোন গোষ্ঠীর সদস্যদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই সমাজেরও মৃত্যু হত। কিন্তু শিক্ষা আছে বলেই গোষ্ঠীর বর্তমান সদস্যদের মৃত্যুর পরেও তাদের বংশধরদের মধ্যে সমাজ আবার পুনর্জীবন লাভ করে। যদিও ব্যক্তির জীবন অস্থায়ী তবু শিক্ষার দৌলতে এইভাবে সমাজ চিরস্থায়ীত্ব লাভ করে থাকে। সমাজকে এইভাবে এক গোষ্ঠী থেকে আর এক গোষ্ঠীতে বাঁচিয়ে রাখাই হল শিক্ষার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

অগ্রগতি (Progress)

কেবলমাত্র ব্যক্তি এবং সমাজকে নিছক বেঁচে থাকতে সাহায্য করার মধ্যেই শিক্ষার কাজ সীমাবদ্ধ নয়। ব্যক্তি ও সমাজের অগ্রগতি আনাটাও শিক্ষার আর একটি অতি-প্রয়োজনীয় কাজ। এমন কি ব্যক্তি ও সমাজের অস্তিত্বরক্ষাও কালক্রমে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না যদি তাদের মধ্যে অগ্রগতি না থাকে।

ব্যক্তির অগ্রগতি বলতে বোঝায় উন্নততর সঙ্গতিবিধান। বিশেষ একটা পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করাটা ব্যক্তির অস্তিত্ব রক্ষার পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু উৎকর্ষ বা কার্যকারিতার দিক দিয়ে এই সঙ্গতিবিধান বিভিন্ন মাত্রা বা মানের হতে পারে। আদিম মানুষ ঝড়-জল-রোদ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিত। শীত থেকে রক্ষা পাবার জন্য গাছের পাতা, ছাল দিয়ে শরীর ঢাকত। ক্ষুধা মেটাবার জন্য গাছের ফল পাড়ত, মাটি খুঁড়ে শেকড় বার করত, জলের মাছ ধরত, বনের পশু মেরে খেত। কিন্তু ক্রমশ মানুষ সঙ্গতিবিধানের এই পন্থাগুলির ধীরে ধীরে উন্নতি করতে শিখল। ঝড় জল রোদ থেকে বাঁচবার জন্য সে গাছের ডাল লতাপাতা দিয়ে ঘর বাঁধতে শিখল, তারপর শিখল মাটি কাঠ দিয়ে বাড়ী তৈরী করতে, আজ শিখেছে ইট সিমেণ্ট কংক্রিটের প্রাসাদ গড়তে। তেমনই শীত থেকে শরীরকে বাঁচবারে জন্য মানুষ তুলো থেকে সূতো বার করে কাপড়জামা তৈরী করতে শিখল, পশুর লোম দিয়ে কাপড় তৈরী করল, আজ রাসায়নিক পন্থায় রেয়ন, নাইলন, টেরিলিন ইত্যাদি কত কৃত্রিম দেহাবরণ তৈরী করতে সমর্থ হয়েছে। তেমনই যে মানুষ একদিন কাঁচা ফলমূল, পশুর মাংস খেয়ে ক্ষুধা মেটাত আজ সে অসংখ্য সুস্বাদু ও পুষ্টিকর চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের উদ্ভাবন করেছে। এই সব উদাহরণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, একই সঙ্গতিবিধানের পন্থা ধীরে ধীরে উন্নত থেকে উন্নততর হয়ে উঠেছে। একেই আমরা ব্যক্তির অগ্রগতি বলে বর্ণনা করতে পারি এবং এ অগ্রগতি সম্ভবপর হয় একমাত্র শিক্ষার জন্যেই।

এ ত গেল ব্যক্তির বাহিক বা প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের অগ্রগতি। ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ বা মানসিক জগতের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের উন্নতিও একইভাবে শিক্ষা এনে থাকে। আগে মানুষের লব্ধ জ্ঞান ছিল স্বল্প, ফলে তার মানসিক সমৃদ্ধির মানও ছিল নীচু। কিন্তু ধীরে ধীরে নিত্য নতুন জ্ঞান হতে হতে মানুষের কৃষ্টির পরিধি সম্প্রসারিত হয়ে উঠেছে। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান

ইত্যাদির সুবিপুল প্রসার মানুষের মনকে আগের চেয়ে অনেক বেশী উন্নত করে তুলেছে। ফলে তার আভ্যন্তরীণ সঙ্গতিবিধান এখন অনেক বেশী তৃপ্তিদায়ক ও সমৃদ্ধ হতে পেরেছে।

সমাজের অগ্রগতির অর্থ হল নতুন চিন্তা, জ্ঞান ও কৌশলের সৃষ্টি বা আহরণ। সমাজের অস্তিত্ব নির্ভর করে পূর্বগামীদের অর্জিত জ্ঞান, কৌশল, চিন্তা প্রভৃতির সঞ্চিত ভাণ্ডারটিকে অগ্রগামীদের হাতে তুলে দেওয়ার উপর। কিন্তু পূর্বগামীদের অর্জিত চিন্তা, জ্ঞান এবং কৌশলের ভাণ্ডারটিতেই যদি শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে সমাজের অস্তিত্ব ক্রমশ বিপদাপন্ন হয়ে ওঠে, যদি না সেই ভাণ্ডারটিতে নতুন নতুন চিন্তা, জ্ঞান ও কৌশলের সংযোজন ঘটে। পূর্বগামীদের অর্জিত জ্ঞান ও কৌশলগুলির মধ্যে অনেকগুলিই পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে তাদের কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে এবং সেগুলির স্থান নতুন নতুন চিন্তা ও জ্ঞান দিয়ে পূরণ করতে হয়। যে সমাজ প্রয়োজনমত নতুন চিন্তা, জ্ঞান, কৌশল ইত্যাদি সৃষ্টি বা আহরণ করতে পারে না তার এই কৃষ্টির সঞ্চিত ভাণ্ডারটি ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে এবং এমন একটা দিন আসে যেদিন সমাজকে বেঁধে রাখবার তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার ক্ষমতা তার আর থাকে না। ফলে সে সমাজ ধীরে ধীরে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে এবং কালক্রমে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। একদা-সমৃদ্ধ বহুসমাজের আজ পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার প্রধান কারণই হল তাদের পুরাতন চিন্তা ও ভাবধারার উপর অতিমাত্রায় নির্ভরতা এবং নতুন চিন্তা ও জ্ঞানের সৃষ্টি বা আহরণে অসমর্থতা। আর যে সমাজ পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নতুন চিন্তা ও ভাবধারার সৃষ্টি বা আহরণের দ্বারা নিজের সঞ্চিত ঐতিহ্যের ভাণ্ডারটিকে নিয়ত সমৃদ্ধ করে চলে তার পক্ষে অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব ও সহজ হয়ে ওঠে। এই নতুন ভাব ও জ্ঞান লাভ করার পথ দুটি। প্রথম নিজেরে নতুন জ্ঞান ও চিন্তার উদ্ভাবন বা সৃষ্টি করা, দ্বিতীয় অপরের সৃষ্ট ও উদ্ভাবিত জ্ঞান এবং চিন্তা আহরণ করা। প্রত্যেক সমাজেই নতুন চিন্তা ও জ্ঞানের জন্মদাতা মনীষী কিছু না কিছু সংখ্যক জন্মে থাকেন। তাঁরা তাঁদের চিন্তাপ্রসূত নতুন ভাবধারা ও জ্ঞানের সাহায্যে পূর্বপুরুষদের আহরিত জ্ঞানভাণ্ডারটিকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। তাছাড়া বাইরের অন্যান্য জনসমাজের সঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমে বিশেষ কোন সমাজ প্রচুর নতুন চিন্তা ও জ্ঞান আহরণ করতে পারে। বিভিন্ন জনসমাজের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে প্রত্যেক সমাজেরই নতুন নতুন চিন্তা ও জ্ঞান অপর সমাজের মধ্যে সঞ্চালিত হতে

পারে এবং এইভাবে চিন্তার আদানপ্রদানের সাহায্যে প্রতিটি সমাজই সর্বদাই নবতম চিন্তা ও জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে। ভাবধারার এই সঞ্চালনই আধুনিক যুগে মানবজাতির সামগ্রিক অগ্রগতির প্রধানতম পন্থা।

প্রশ্নাবলী

1. What are the functions of education and how does education perform them ?

Ans. (পৃঃ ১১—পৃঃ ১৭)

2. Though individual adjustment is the primary function of education, preservation of the society is no less a vital task that education has to perform—Discuss the statement and show how these two functions are interrelated.

Ans. (পৃঃ ১১—পৃঃ ১৪)

3. Education that fails to enrich the existing fund of thought and culture and lead the nation along a path of progress is not worth its name—Discuss the statement with reference to the various functions of education.

Ans. (পৃঃ ১১—পৃঃ ১৭)

তিন

শিক্ষার উপাদান (Factors of Education)

শিক্ষা হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা ব্যক্তি তার সদা পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের উপযোগী আচরণগুলি আয়ত্ত করে। এই আচরণগুলি আয়ত্ত করা তার অস্তিত্ব রক্ষা ও সুষ্ঠ জীবন যাপনের পক্ষে একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। সমাজের দিক দিয়েও এই নতুন আচরণ শেখাটার মূল্য প্রচুর। কেননা পরিবর্তনশীল পরিবেশের মধ্যে সমাজকে টিঁকে থাকতে হলে তার পুরাতন আচরণকে ক্রমান্বয়ে বদলে যেতে হবে অতএব এককথায় ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই অস্তিত্ব রক্ষা এবং সুষ্ঠ জীবনযাপনের পক্ষে শিক্ষা অপরিহার্য।

শিক্ষার মাধ্যম বলতে গেলে ব্যক্তির সম্পূর্ণ পরিবেশকেই বোঝায়। প্রাকৃতিক সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক যে পরিবেশের মধ্যে ব্যক্তি জীবন কাটায় সেই সমগ্র পরিবেশের মধ্যে দিয়েই তার শিক্ষা সংঘটিত হয়ে থাকে। কিন্তু তবু আমরা আমাদের সুবিধার জন্য এই পরিবেশকে কতকগুলি ভাগে ভাগ করতে পারে। যেমন শিক্ষক, স্কুল, পরিবার, ধর্মায়তন, সমাজ, রাষ্ট্র, বিভিন্ন সঙ্ঘ ইত্যাদি।

শিক্ষার প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে আমরা একদিকে পাই শিক্ষার্থী এবং অপর দিকে পাই এই শিক্ষার মাধ্যমগুলি। এ সবগুলিকেই আমরা এক কথায় শিক্ষার উপাদান বলে বর্ণনা করতে পারি। শিক্ষার্থী এবং শিক্ষার মাধ্যমগুলির মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই শিক্ষা ঘটে থাকে।

শিক্ষার্থী

শিক্ষার উপাদানের মধ্যে প্রথমে আসে শিক্ষার্থী নিজে। শিক্ষার্থীর বিশেষ প্রয়োজন মেটাবার জন্যেই শিক্ষার সৃষ্টি এবং যখনই শিক্ষা শিক্ষার্থীকে তার প্রয়োজনমত আচরণ আয়ত্ত করতে সমর্থ করে তখনই আসে শিক্ষার সার্থকতা।

ঘটনাচক্রে মানুষকে এমন একটি পরিবেশে জন্ম নিতে হয় যে পরিবেশ সতত পরিবর্তনশীল এবং বহুক্ষেত্রে তার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। এই পরিবর্তনশীল পরিবেশে কেমন করে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়, কেমন করে শত্রুভাবাপন্ন পরিবেশকে

আয়ত্তে আনা যায় এবং কেমন করে অনুকূল পরিবেশকে পূর্ণভাবে কাজে লাগান যায় ইত্যাদি ব্যক্তি নির্ণয় করে তার শিক্ষার মধ্যে দিয়ে। যখনই শিক্ষা তাকে এই মূল্যবান আচরণগুলি সম্পন্ন করতে সমর্থ করে তখনই ব্যক্তি তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে এবং সুষ্ঠু জীবনযাপন করতে সমর্থ হয়। আর যদি তা না পারে তাহলে প্রতিকূল পারিবেশিক শক্তির চাপে ব্যক্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

নিছক অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারলেই আধুনিক মানুষের দেহগত কাজ শেষ হয় না, তার সামাজিক অস্তিত্ব বজায় রাখাটাও সমানভাবে তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে খাপ খাওয়ান এবং শরীরতত্ত্বমূলক চাহিদাগুলি মেটাতে পারলেই প্রাণীর পক্ষে দেহগত অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব। তার জন্য প্রকৃতি তাকে কতকগুলি জন্মগত ক্ষমতা দিয়ে পাঠায় বটে, কিন্তু জটিলতর পরিস্থিতি দেখা দিলেই সেই সহজাত ক্ষমতা এবং আচরণ অপর্যাপ্ত বলে প্রমাণিত হয় এবং প্রয়োজন হয় নতুন ও উন্নত আচরণ সম্পন্ন করার। অর্থাৎ এককথায় তখনই প্রয়োজন হয় শিক্ষার।

কিন্তু সামাজিক অস্তিত্ব বজায় রাখাটা আরও জটিল কাজ। এখানে সহজাত ক্ষমতা বা আচরণধারা বিশেষ কোন কাজে লাগে না। একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই ব্যক্তি শেখে কি করে সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আচরণ করতে হয় এবং কি করে নিজের জীবনকে সুষ্ঠু ও মর্যাদাসম্পন্ন করে তোলা যায়। উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া ব্যক্তির পক্ষে নিশ্চিন্ত ও সন্তোষজনক সামাজিক জীবনযাপন করা সম্ভবই নয়। অতএব সামাজিক অস্তিত্ব রক্ষার দিক দিয়ে শিক্ষার গুরুত্ব অসীম।

শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণ করার ক্ষমতাটা তার সহজাত। এর নাম দেওয়া হয়েছে নমনীয়তা (plasticity)। নমনীয়তা বলতে বোঝায় পুরোনো আচরণের স্থানে নতুন আচরণ আয়ত্ত করার ক্ষমতা। এই ক্ষমতা প্রাণীর মধ্যে আছে বলেই তার পক্ষে শিক্ষাগ্রহণ করা সম্ভব হয়ে থাকে।

জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য এবং অতি প্রয়োজনীয় আচরণগুলি প্রাণী শেখে তার শৈশবে। যে প্রাণীর শৈশব যত দীর্ঘকাল স্থায়ী তার শিক্ষার পরিমাণও তত বেশী হয়। নিম্ন প্রাণীদের শৈশব অল্পস্থায়ী ফলে তাদের শিক্ষা হয় পরিমাণে স্বল্প ও প্রকৃতিতে বৈচিত্র্যহীন। কিন্তু মানুষের শৈশব তুলনায় যথেষ্ট দীর্ঘ। অতএব মানুষের শিক্ষার পরিমাণও যেমন অনেক বেশী, তেমনই তার শিক্ষা বৈচিত্র্যময়ও হয়ে থাকে। এই দীর্ঘ শৈশবের ফলেই মানুষ অধিকতর কার্যকরী শিক্ষার

অধিকারী এবং তারই জোরে সে আজ উন্নত জীবনযাপনে আর সব প্রাণীকে অনেক পেছনে ফেলে গেছে।

শিক্ষক

শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করে তার সমগ্র পরিবেশের কাছ থেকে। এই পরিবেশের মধ্যে থাকে নানাবিধ শক্তি—প্রাকৃতিক ও সামাজিক। শিক্ষক, পিতামাতা ও অন্যান্য যাদের কাছ থেকে শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করে থাকে তারাও এই পারিবেশিক শক্তির অন্তর্গত। আধুনিক সভ্য সমাজে মানুষের শিক্ষণীয় বিষয় অত্যন্ত উন্নত ও জটিল হয়ে পড়ায় শিক্ষকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনেক বেড়ে গেছে। আমাদের জৈবিক অস্তিত্বে ধারণে প্রকৃতিগত শক্তিগুলির যথেষ্ট প্রভাব থাকলেও আমাদের কৃষ্টিমূলক ও সমাজজীবনমূলক অস্তিত্বে শিক্ষকের অবদান অত্যন্ত অধিক।

পাঠক্রম

শিক্ষার আর একটি উপাদান হল পাঠক্রম। পাঠক্রম বলতে কেবলমাত্র কতকগুলি পঠনীয় বিষয়ের তালিকা বোঝায় না, শিক্ষার্থীর সামগ্রিক ও সুসংহত অভিজ্ঞতার সমষ্টিকেই বোঝায়। শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে বিভিন্ন ও বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতাগুলি শিশু লাভ করে থাকে তাকেই প্রকৃতপক্ষে পাঠক্রম বলা চলে। শিশুর শিক্ষার সার্থকতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে এই পাঠক্রমের সুনির্বাচনের উপর। উপযুক্ত পাঠক্রম আবার নির্ভর করে শিক্ষার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের নির্ণয়ন, শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয়তা এবং শিক্ষকের বিচক্ষণতা ও অভিজ্ঞতার উপর।

অন্যান্য পারিবেশিক উপাদান

বিদ্যালয়, পাঠাগার, খেলার মাঠ, যৌথ প্রচেষ্টা, সভা সমিতি, সম্মেলন, প্রদর্শনী ইত্যাদি নানা পারিবেশিক শক্তিই শিক্ষার্থীর শিক্ষার উপাদানরূপে কাজ করে থাকে। এর মধ্যে সর্বপ্রথম আসে স্কুল, কলেজ, প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি।

বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানগুলি কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যাই দান করে না, জ্ঞানমূলক, কৃষ্টিমূলক, সমাজমূলক প্রভৃতি সর্ববিধ অভিজ্ঞতাই শিক্ষার্থীকে দান করে থাকে। খেলাধূলা, নাটক, অভিনয়, বিতর্ক, সভা, সমিতি, প্রদর্শনী প্রভৃতি বহুবিধ কার্যের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী নানাবিধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে থাকে। বিদ্যালয়ের কার্যাবলী ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পরের অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়া আধুনিক সভ্যজগতে আরও কতকগুলি নতুন নতুন শিক্ষার উপাদান সৃষ্ট হয়েছে। তার মধ্যে সর্বপ্রথমেই আসে সংবাদপত্র। শিক্ষার্থীর শিক্ষায় বর্তমানে সংবাদপত্রের প্রভাব যে অপরিসীম এ বিষয়ে সকলেই একমত। সংবাদপত্রের পরেই আসে বেতার, টেলিভিশন প্রভৃতি তথ্য-পরিবেশনের আধুনিক বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনগুলি। এগুলিও যে শিক্ষার্থীর বিকাশোন্মুখ মনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং তার মানসিক সংগঠনকে প্রচুর পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রশ্নাবলী

1. Describe the major factors of education and show in what measures they shape and regulate the education of the child.

Ans. (পৃঃ ১৮—পৃঃ ২১)

2. What are the environmental factors that influence the education of the child to-day?

Ans. (পৃঃ ১৮—পৃঃ ২১)

চার

শিক্ষার লক্ষ্য (Aims of Education)

শিক্ষা মানব অস্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রতি দেশে প্রতি যুগেই ব্যক্তির জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা সম্বন্ধে সমস্ত সমাজনায়ক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ একমত। শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে কিন্তু মতভেদের শেষ নেই। শিক্ষা দেওয়া উচিত এ সিদ্ধান্ত সর্বজনীন হলেও কেন দেওয়া হবে এ সম্বন্ধে বহু বিভিন্ন এমন কি পরস্পর-বিরোধী ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে মতের এই অনৈক্য খুবই স্বাভাবিক। কারণ শিক্ষার লক্ষ্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে জীবনের লক্ষ্যের উপর। আর জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনার অবকাশ চিরকালই আছে এবং চিরকালই থাকবে। ফলে যাঁরাই জীবন ও জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে অল্পবিস্তর চিন্তা করেছেন, তাঁরাই শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে একটা না একটা মতবাদ উপস্থাপিত করেছেন।

শিক্ষার লক্ষ্যের ক্রমবিবর্তন

শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে চিন্তা ও ভাবধারার বৈষম্যের জন্য শিক্ষার লক্ষ্য বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। শিক্ষার লক্ষ্যের এই ক্রমবিবর্তনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হল।

প্রাচীন ভারত

প্রাচীনকালে ভারতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য ছিল মোক্ষ বা মুক্তি। এই পার্থিব জীবনকে মনে করা হত বন্ধন, আর ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে জানতে পারলে হবে সেই

বন্ধন থেকে মুক্তি। এই ব্রহ্মজ্ঞানের নাম "পরা" বা শ্রেষ্ঠজ্ঞান। এ ছাড়া আর যে সব জ্ঞান তা "অপরা" বা নিকৃষ্ট। প্রাচীন ভারতের শিক্ষার এই লক্ষ্য যে অসম্পূর্ণ এ কথা বলা বাহুল্য। এ লক্ষ্যে পার্থিব জীবনের কোন প্রয়োজনীয়তা বা সার্থকতাকে স্বীকার করা হয় নি।

সোফিষ্ট

প্রাচীন গ্রীসে সোফিষ্ট নামে একদল গ্রীক শিক্ষক জন্মেছিলেন। তাঁরা ছিলেন চরম ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমর্থক। তাঁদের মতে ব্যক্তির নিজস্ব বিচার বিবেচনা ও অভিজ্ঞতাই হবে সব কিছুর মাপকাঠি। কোন সর্বজনীন মান বা অনুশাসন ব্যক্তির নিজস্বতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। শিক্ষাকে তাঁরা এই উগ্র ব্যক্তি-তান্ত্রিকতার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। তাঁদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে পূর্ণভাবে বিকশিত করা। শিক্ষার এ লক্ষ্যও অসম্পূর্ণ কেননা এ লক্ষ্যের মধ্যে সমাজের দাবী ও সর্বজনগ্রাহ্য জীবনযাপনের কোন মানকে স্বীকার করা হয় নি।

এথেন্স

সোফিষ্টদের পরে আসেন সক্রেটিস, প্লেটো, আরিষ্টটল্ প্রভৃতি যুগবিখ্যাত মনীষীরা। তাঁরা সোফিষ্টদের উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিবর্তে শিক্ষার এক সুষম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ লক্ষ্যের নির্দেশ দিয়ে যান। তাঁদেরই আদর্শে গ্রীসের প্রসিদ্ধ নগর-রাষ্ট্র এথেন্সের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এথেন্সের শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যক্তিসত্তার অবাধ বিকাশের উপর জোর দেওয়া হলেও সোফিষ্টদের মত উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সমর্থন সেখানে করা হয় নি। তবে সেখানেও ব্যক্তিজীবনকে সমাজজীবনের উপরে স্থান দেওয়া হয়েছিল। এথেন্সের শিক্ষার লক্ষ্য ছিল ব্যক্তির রুচি, প্রকৃতি ও শক্তি অনুযায়ী তার অভ্যন্তরস্থ সম্ভাবনাগুলির পূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা। এই শিক্ষার লক্ষ্য অনেক উন্নত হলেও ত্রুটিহীন ছিল না। কেননা এই লক্ষ্যে সুসংহত সমাজজীবনের প্রয়োজনীয়তাকে অবহেলা করা হয়েছিল এবং তারই ফলে পরবর্তীকালে অধিকতর সমাজবদ্ধ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আক্রমণে এথেন্সের পতন ঘটেছিল।

স্পার্টা

এথেন্সের পাশাপাশি আর একটি গ্রীকরাষ্ট্র স্পার্টায় একেবারে বিপরীত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। সেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কোন মূল্য দেওয়া হত না। শিক্ষার লক্ষ্য ছিল সুসংবদ্ধ ও সবল রাষ্ট্রজীবন গঠন করা। ব্যক্তির নিজস্ব চাহিদা বা অভিরুচির কোন স্বীকৃতি সেখানে দেওয়া হয় নি। ব্যক্তি ছিল রাষ্ট্রের কাছে উৎসর্গীকৃত। এমন কি যে সকল শিশু দুর্বল বা বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মাত তারা ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের যাতে বোঝা না হয়ে দাঁড়ায় সেইজন্য জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের সরিয়ে ফেলা হত। শিক্ষার এই লক্ষ্যের অসম্পূর্ণতা অতি সুস্পষ্ট। এই লক্ষ্যে ব্যক্তির নিজস্ব সত্তাকে স্বীকার করা হয়নি এবং তাকে রাষ্ট্রের চাহিদা মিটানোর নিছক যন্ত্র বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

খ্রীষ্টধর্ম

গ্রীক ও রোমান সভ্যতার ক্ষয়প্রাপ্তির পর ইউরোপে শিক্ষার তামস যুগ আসে। এই যুগে ইউরোপের শিক্ষাব্যবস্থা খ্রীষ্টধর্মের অনুশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। ফলে শিক্ষার উদার এবং ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী লোপ পায় এবং তার স্থানে নানারূপ সংকীর্ণ লক্ষ্য দেখা দেয়। এই সময়ের শিক্ষা একদল তথাকথিত পণ্ডিত এবং অতি গোড়া ধর্মোৎসাহীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। অহেতুক বিতর্ক, চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ, চিন্তাশক্তির অর্থহীন কসরৎ প্রভৃতি আড়ম্বরসর্বস্ব প্রতিক্রিয়াতেই শিক্ষা শেষ পর্যন্ত পর্যবসিত হয় এবং ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু ও সর্বাঙ্গীন বিকাশের আদর্শ থেকে শিক্ষার লক্ষ্য বহুদূরে অপসৃত হয়ে যায়।

এই কৃত্রিম শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ারূপে দেখা দেয় দুটি আন্দোলন,—একটি মানবতাবাদ (Humanism), অপরটি প্রকৃতিবাদ (Naturalism)। এই দুটি মতবাদের মধ্যে বিশেষ কোন মৌলিক পার্থক্য নেই, কিন্তু তাদের প্রতিপাদ্য বিষয় দুটি বিভিন্ন হওয়ায় এই আন্দোলন দুটি বিভিন্ন কর্মসূচী অবলম্বন করে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে এবং কালক্রমে সর্বদেশের শিক্ষার প্রকৃতি ও পদ্ধতি নির্ণয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করে।

মানবতাবাদ

মানবতাবাদের প্রধান বক্তব্য হল যে শিক্ষা-প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে থাকবে মানুষ নিজে, অন্য কিছু নয়। তারই আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন, অভিরুচি ও সম্ভাবনা-

গুলিই হবে শিক্ষার প্রধানতম উপাদান, ধর্মগত বা অতীন্দ্রিয় কোন বিষয়বস্তু নয়। মানবতাবাদীদের মতে মানসিক, অনুভূতিমূলক, সামাজিক প্রভৃতি মানবজীবনের বিভিন্ন দিকগুলি যাতে পূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করে তা দেখাই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য।

প্রকৃতিবাদ—রুশো

প্রকৃতিবাদীরাও শিক্ষায় কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক রুশো ছিলেন প্রকৃতিবাদী আন্দোলনের অধিনায়ক। তাঁর মতে শিক্ষা হবে শিশুর প্রকৃতি অনুযায়ী। সকল ব্যাপারে সকল দিক দিয়ে শিশুকে দেওয়া হবে অবাধ স্বাধীনতা। তার শিক্ষার উপর বাইরের কোন শক্তির হস্তক্ষেপ থাকবে না। তাঁর 'এমিল' নামক গ্রন্থে তিনি আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থার বর্ণনা করেন। তাঁর মানস-শিশু এমিলের শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ তার স্বাভাবিক রুচি এবং সামর্থ্য অনুযায়ী, তার আগ্রহ ও চাহিদার অনুগামী। মানুষের দেওয়া শিক্ষা কৃত্রিম, অতএব ক্ষতিকর। প্রকৃতি নিজে হাতে নেবে শিশুর শিক্ষার ভার। রুশোর মতে ৫ থেকে ১২ বৎসর পর্যন্ত শিশুকে কোন রূপ পুঁথিগত শিক্ষা দেওয়া হবে না। এ বয়স পর্যন্ত শিশুর শিক্ষা হবে প্রকৃতি পরিচালিত, যার নাম তিনি দিয়েছেন নেতিবাচক শিক্ষা বা স্বভাব-শিক্ষা (Negative Education)। এর পর অবশ্য রুশো পুস্তক ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি পুঁথিলব্ধ জ্ঞানের অসারতার উপর বার বার জোর দিয়েছেন। রুশোর মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল শিশুর বাধাহীন প্রকৃতিগত বিকাশ এবং তার জন্য শিশুকে দিতে হবে স্বাধীনতা, সক্রিয় অভিজ্ঞতার সুযোগ ও দেহমনের পূর্ণ বিকাশের উপযোগী পরিবেশ।

রুশো যে নতুন ভাবধারার প্রবাহকে পথ দেখিয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে এনে দিয়ে যান, পরবর্তী শিক্ষাবিদগণের হাতে সেই প্রবাহ বিপুল-কলেবরা স্রোতস্বতীর আকার ধারণ করে ও দু'কূল ছাপিয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাবসম্পদের বন্যা এনে দেয়। এই থেকে জন্ম নেয় শিশু-কেন্দ্রিক (child-centred) শিক্ষার আধুনিক আন্দোলন। শিক্ষার ক্ষেত্রে এতদিন শিশুই ছিল যবনিকার অন্তরালে। রুশো তাঁর কল্পনার শিশু এমিলকে তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার পুরোভাগে তুলে ধরলেন আর সেই সঙ্গে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ বিস্মৃত শিশুর সামনে থেকে অপসারিত করলেন যুগযুগান্তরের অবহেলার যবনিকা।

মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান

পরবর্তী যুগে শিক্ষার ক্ষেত্রে দুটি প্রধান ভাবধারা বহু মৌলিক পরিবর্তন আনতে সমর্থ হয়। তার একটি হল মনোবিজ্ঞানমূলক, অপরটি সমাজবিজ্ঞানমূলক। এই দ্বিবিধ ভাববৈচিত্র্যই যে শিক্ষার আধুনিক ও ব্যাপক সংজ্ঞার জনক একথা আমরা আগেই দেখেছি।

শিক্ষার লক্ষ্য—সঙ্গতিবিধান

মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তিকে পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু সঙ্গতিসাধন (adjustment) করতে সাহায্য করা। এমন কি মনোবিজ্ঞানে শিক্ষাকে সঙ্গতিবিধানের প্রক্রিয়ার সঙ্গে অভিন্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যে কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব নির্ভর করে তার চতুষ্পার্শের পারিবেশিক শক্তিগুলির সঙ্গে সার্থকভাবে মানিয়ে চলার উপর। এর জন্য প্রয়োজন তার আচরণের উপযুক্ত পরিবর্তন। পরিবেশের তাগাদা অনুযায়ী যদি আচরণের মধ্যে যথোচিত পরিবর্তন দেখা না দেয় তবে ব্যক্তির পক্ষে সেই পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া সম্ভব হয় না। ফলে তার সুস্থ জীবনযাপন ব্যাহত হয়, এমন কি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে তার অস্তিত্বও বিপদাপন্ন হয়ে ওঠে। পরিবেশের প্রয়োজন অনুযায়ী আচরণের এই অভীষ্ট পরিবর্তনকেই মনোবিজ্ঞানে শিক্ষা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যে শিক্ষা ব্যক্তিকে তার পরিবেশের সঙ্গে সাফল্যজনক ভাবে সঙ্গতি-সাধন করতে সমর্থ করে, তাকেই সার্থক শিক্ষা বলা হয়।

পরিবেশকে আবার মোটামুটি দু-ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম প্রাকৃতিক; দ্বিতীয় সামাজিক। অতএব সঙ্গতিবিধানের কাজও দু'প্রকারের। প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে বোঝায় আলো, বাতাস, উত্তাপ, জলবায়ু, ঋতুগত পরিবর্তন, মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি বহিঃপ্রকৃতির নানা শক্তি ও ঘটনা। প্রত্যেকটি প্রাণীকেই তার দেহগত অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য এই সকল শক্তির সঙ্গে প্রতিনিয়তই যুদ্ধ করে যেতে হচ্ছে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় প্রাকৃতিক সঙ্গতিবিধান এবং তার ফলে বজায় থাকে আমাদের দেহগত অস্তিত্ব (physical survival)। কিন্তু সভ্য ও সমাজবদ্ধ মানুষকে কেবলমাত্র দেহগত অস্তিত্বের কথা ভাবলেই চলে না। তার কাছে কম প্রয়োজনীয় নয় তার সামাজিক অস্তিত্ব (social survival)। সমাজে বাস করার ফলে ধীরে ধীরে তার কতকগুলি চাহিদা

(needs) জন্মায়। যেমন, সামাজিক নিরাপত্তার চাহিদা, নিজের স্বীকৃতির চাহিদা, মর্যাদা এবং প্রশংসার চাহিদা, অধিকারের চাহিদা ইত্যাদি। এগুলি সার্থকভাবে পূর্ণ করতে পারাটাই অভীষ্ট সঙ্গতিবিধানের লক্ষণ। যে তা পারে না, সে শান্তিপূর্ণ সমাজ-জীবন যাপনে বাধা পায় এবং তার সামাজিক অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে ওঠে। অতএব অভীষ্ট সমাজ জীবনের জন্য তার প্রয়োজন সামাজিক পরিবেশের চাহিদা অনুযায়ী তার আচরণের মধ্যে যথোচিত পরিবর্তন আনা। ব্যক্তির আচরণের এই অভীষ্ট পরিবর্তন সাধন করতে সমর্থ হয় একমাত্র শিক্ষাই। অতএব মনোবিজ্ঞানের মতে প্রাকৃতিক ও সামাজিক এই দ্বিবিধ পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিবিধান করতে সাহায্য করাই শিক্ষার লক্ষ্য।

মনোবিজ্ঞানের সংব্যাখ্যানে শিক্ষার এই লক্ষ্যের সঙ্গে কারও কোন বিবাদ থাকতে পারে না। তবে দুটি কথা এখানে মনে রাখতে হবে। প্রথমত মনোবিজ্ঞান একটি বস্তুমূলক (positive) বিজ্ঞান। তার মধ্যে ভালমন্দ, উচিত অনুচিত এ সব কথা আসে না। কিন্তু শিক্ষাবিজ্ঞান একটি মানমূলক (normative) বিজ্ঞান। অতএব সকলপ্রকার সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টাই শিক্ষাবিজ্ঞানের বিচারে শিক্ষার পর্যায়ে পড়ে না। সঙ্গতিবিধানের যে প্রচেষ্টাটি শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা বলে বিবেচিত হবে সে অভিজ্ঞতাটিকেই শিক্ষা বলে ধরা হবে। সেইজন্য পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিবিধান ঘটান যদিও শিক্ষার লক্ষ্য, তবুও এই সঙ্গতিবিধান যেন ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর: অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সম্পাদিত হয়। দ্বিতীয়ত সঙ্গতিবিধান প্রক্রিয়াটিকে পুরোপুরি যান্ত্রিক বলে ধরে নিলে ভুল হবে। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাবকে অন্ধভাবে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা যান্ত্রিক বা একমুখী নয়। মানুষের আচরণ যেমন পরিবেশের শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সেইরকম পরিবেশও মানুষের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়। মানুষের ক্ষেত্রে সঙ্গতিবিধান পূর্বপরিকল্পিত ও অভীষ্ট পথ ধরে এগোতে পারে এবং বহুক্ষেত্রে মানুষ পরিবেশকে সম্পূর্ণ নিজ আয়ত্তে আনতে পেরেছে। পরিবেশের হাতে সে সর্বদাই অসহায় ক্রীড়নক নয়, অনেকক্ষেত্রে সে পরিবেশের অধিকর্তা হয়েও দাঁড়ায়।

শিক্ষার লক্ষ্য—সমাজ-সংরক্ষণ

মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে যেমন ব্যক্তির ব্যক্তিগত অস্তিত্ব বজায় রাখা শিক্ষার উদ্দেশ্য, তেমনি সমাজবিজ্ঞানের দিক দিয়ে সমাজের অস্তিত্ব বজায় রাখাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে সমাজবিজ্ঞানে সমাজের সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকেই শিক্ষা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। একটি বিশেষ সময়ে একটি বিশেষ সমাজের টিঁকে থাকার পিছনে শিক্ষার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হস্তক্ষেপ আছে। কোন বিশেষ সমাজকে যদি ভবিষ্যতে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয় তবে সেই সমাজের বয়ঃপ্রাপ্তদের মধ্যে প্রচলিত ভাব, চিন্তা, জ্ঞান, আদর্শ, বিশ্বাস, সংস্কার, কৃষ্টি, আচার, রীতিনীতি প্রভৃতি তার অপরিণত নাগরিকদের হতে তুলে দিতে হবে। যদি তা না দেওয়া হয় তবে সেই বিশেষ সমাজটির অস্তিত্ব আর বজায় থাকে না। সমাজের বয়ঃপ্রাপ্ত নাগরিকদের নিকট হতে তার অপরিণত নাগরিকদের মধ্যে সঞ্চিত ভাবধারা, জ্ঞানরাশি ও ঐতিহ্যের সার্থক সঞ্চালনই হচ্ছে শিক্ষার উদ্দেশ্য।

শিক্ষার এই সমাজ-সংরক্ষণের উদ্দেশ্যের সঙ্গেও কারও দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না। তবে সমাজের অস্তিত্ব বজায় রাখাকেই যদি শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য বলে বর্ণনা করা হয় তবে শিক্ষাকে একটি অতি সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হল। প্রথমত সমাজবিজ্ঞানের দিক দিয়েও কেবলমাত্র সমাজকে বাঁচিয়ে রাখলেই শিক্ষার কাজ শেষ হয় না। পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত ভাবধারা ও ঐতিহ্যকে বংশধরদের হাতে তুলে দিলেই সমাজের অস্তিত্ব অব্যাহত থাকে না। প্রতি যুগেই নতুন জ্ঞান ও চিন্তার জন্ম দিতে হবে, নতুন তথ্য আবিষ্কার করতে হবে, সঙ্গতিবিধানের নতুন কৌশল আয়ত্ত করতে হবে। তবেই সমাজের প্রাণশক্তি বজায় থাকবে, তার গতিশীলতা অক্ষুণ্ণ থাকবে। সামাজিক উত্তরাধিকারের এই পরিবর্তনও শিক্ষার কাজ। অতএব শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র সমাজের সংরক্ষণ নয়, সমাজের অগ্রগতি-সাধনও। তা ছাড়া কেবলমাত্র সমাজকে বাঁচিয়ে রাখাই শিক্ষার কাজ নয়, ব্যক্তির নিজস্ব সম্ভাবনা ও শক্তিগুলিকে পূর্ণভাবে বিকশিত করে তার ব্যক্তিসত্তাকে সুষ্ঠু পরিণতি লাভ করতে সাহায্য করাও শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। অতএব সমাজ সংরক্ষণের কাজটি শিক্ষার লক্ষ্যের অন্তর্গত হলেও সেটিই একমাত্র লক্ষ্য নয়।

শিক্ষার যে লক্ষ্যগুলির আলোচনা উপরে করা হল সেগুলি ছাড়াও বহু বিভিন্ন লক্ষ্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। নীচে কতকগুলি বহুপ্রচলিত শিক্ষার লক্ষ্যের বর্ণনা দেওয়া হল।

চরিত্র-গঠন

অনেক শিক্ষাবিদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল চরিত্র-গঠন (formation of character)। তাঁদের মতে পৃথিবীর এই দুঃখ-দুর্যোগ-প্রলোভনময় জীবন-পথে সুদৃঢ় চরিত্রই একমাত্র অবলম্বন এবং শিক্ষার কাজ হচ্ছে শিক্ষার্থীকে চারিত্রিক দৃঢ়তা অর্জনে সাহায্য করা। বলা বাহুল্য শিক্ষার এই লক্ষ্যটি নিতান্তই অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। প্রথমত, চরিত্রের একটি পরিষ্কার সংজ্ঞা পাওয়া নিতান্তই শক্ত। দ্বিতীয়ত, চরিত্রগঠন যদি আচরণের নৈতিক মানের সচেতনতার উপর নির্ভর করে থাকে, তবে চরিত্রগঠনের কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্ধারণ করা যাবে না, কেননা নৈতিক মান দেশ, কাল ও ব্যক্তি ভেদে একেবারে বিভিন্ন। তবে চরিত্রের সুষ্ঠু সংগঠন যে শিক্ষার লক্ষ্যের অন্তর্গত একথা অনস্বীকার্য।

সু-নাগরিকতা

আবার কোন কোন শিক্ষাবিদ সুনাগরিকতার (good citizenship) যোগ্যতা অর্জন করাকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলে বর্ণনা করেছেন। শিক্ষার এই লক্ষ্যটি সমাজ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই প্রসূত। বিশেষ করে আধুনিক যুগে গণতন্ত্র ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলনের ফলে রাষ্ট্রের প্রত্যেক অধিবাসীকেই সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে হয় এবং তার জন্য বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করার প্রয়োজন হয়। আধুনিক নাগরিক যেমন একদিক দিয়ে কতকগুলি অধিকার ভোগ করে তেমনি আবার কতকগুলি কর্তব্যও তাকে পালন করতে হয়। এই কর্তব্য ও অধিকারের মধ্যে সমতা বজায় রাখাই সু-নাগরিকতার লক্ষণ এবং শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীকে এই যোগ্যতা অর্জন করতে সাহায্য করা। প্রত্যেকটি দেশবাসীকে সু-নাগরিক করে তৈরী করাটা যে শিক্ষার লক্ষ্যের অন্যতম এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, বিশেষ করে আধুনিক জীবন-যাত্রায় যখন সু-নাগরিকতার গুরুত্ব আগের চেয়েও অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু তবু এটিও যে শিক্ষার লক্ষ্যের সংকীর্ণ

ব্যাখ্যা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ব্যক্তির নিজস্ব দিকটিকে এ লক্ষ্যে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়াই হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানের দিক দিয়েও শিক্ষার লক্ষ্য কেবলমাত্র রাষ্ট্রের সুষ্ঠু পরিচালনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, রাষ্ট্রের পরিবর্ধন ও উন্নয়নও শিক্ষার লক্ষ্যের অন্তর্গত।

জীবিকা-নির্বাহ

আবার কোন্ কোন শিক্ষাবিদ জীবিকা-অর্জনের যোগ্যতা (vocational efficiency) অর্জন করাকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলে বর্ণনা করেন। শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে এটিও যে নিতান্তই সংকীর্ণ সে কথা বলা বাহুল্য। বাস্তব জীবনে জীবিকা অর্জন করতে পারাটা যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং শিক্ষার অন্যান্য কাজের মধ্যে এটিও একটি তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যেমন খাদ্য মানব-অস্তিত্বের একটা বড় উপাদান হলেও সব নয়, তেমনি জীবিকা-অর্জন শিক্ষার লক্ষ্যের একটি বড় অঙ্গ হলেও সম্পূর্ণ বা একমাত্র লক্ষ্য নয়।

সম্পূর্ণ জীবন

প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার "সম্পূর্ণ জীবন" যাপন (complete living) করতে সাহায্য করাকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলে বর্ণনা করেছেন। সম্পূর্ণ জীবনের সংব্যাখ্যান প্রসঙ্গে তিনি মাত্র পাঁচটি শিক্ষণীয় বিষয়ের কথা বলেছেন, যেমন, ১। শরীর তত্ত্ব ২। সন্তান-পালন ৩। জীবিকা অর্জন ৪। সু-নাগরিকতা ও ৫। সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি। সম্পূর্ণ জীবন যাপনকে শিক্ষার লক্ষ্য বলে গ্রহণ করতে আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু সম্পূর্ণ জীবনের পরিষ্কার সংজ্ঞাটি যে কি সেটা বলা দুষ্কর। তবে হার্বার্ট স্পেন্সারের দেওয়া সম্পূর্ণ জীবনের ব্যাখ্যাটি যে নিতান্তই অসম্পূর্ণ ও অপর্যাপ্ত এ সম্বন্ধে কেউ দ্বিমত হবেন না।

সামাজিক যোগ্যতা

আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী উইলিয়াম বাগ্‌লে "সামাজিক কর্তব্যপালনে সুদক্ষ ব্যক্তি" সৃষ্টি করাকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলে বর্ণনা করেছেন। সামাজিক

দক্ষতার বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন যেমন,— ১। আর্থিক যোগ্যতা ২। অপরের আর্থিক যোগ্যতার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন কোন ইচ্ছা পূর্ণ না করা এবং ৩। সমাজের উন্নতিতে সাহায্য করবে না এমন কোন ইচ্ছা পূর্ণ করা থেকে বিরত থাকা। শিক্ষার এই লক্ষ্যটিও যে নিতান্ত সংকীর্ণ তা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। ব্যক্তির নিজের দিকটিকে এতে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে এখানে কেবলমাত্র সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতেই শিক্ষার উদ্দেশ্যের বিচার করা হয়েছে।

শিক্ষার লক্ষ্য-নির্ণয়ে দর্শনশাস্ত্র

শিক্ষার লক্ষ্যের সঙ্গে দার্শনিক মতবাদের সম্পর্কও খুব ঘনিষ্ঠ। দর্শনের কাজ মানবজীবনের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা নিরূপণ এবং যেহেতু মানব-জীবনই শিক্ষার একমাত্র বিষয়বস্তু সেই হেতু জীবনের লক্ষ্যের সঙ্গে শিক্ষার লক্ষ্যের সম্পর্ক যে অতি নিগূঢ় হবে সে কথা বলা বাহুল্য। বস্তুত মানবজীবনের যে ভাষ্য দর্শন দেবে তার উপরই গড়ে উঠবে শিক্ষার লক্ষ্য।

এইজন্যই শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে দর্শনশাস্ত্রের অবদান খুব বেশী। বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শিক্ষার লক্ষ্য গড়ে উঠেছে। এমন কি আধুনিক কালে শিক্ষার লক্ষ্য, মূল তত্ত্ব, পঠনীয় বিষয় প্রভৃতির সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলিকে আশ্রয় করে এক নতুন দর্শনশাস্ত্র জন্মলাভ করেছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে শিক্ষাশ্রয়ী দর্শন (Educational Philosophy)।

দার্শনিক মতবাদও বিভিন্নতার দিক দিয়ে বহু। তাদের মধ্যে যেগুলি মুখ্য ও সুপ্রচলিত এবং যেগুলি প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার লক্ষ্যকে প্রভাবান্বিত করেছে সেগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা নীচে দেওয়া হল।

ভাববাদ

দার্শনিক মতবাদগুলির মধ্যে সব চেয়ে প্রাচীন ও সুপ্রতিষ্ঠিত মতবাদের নাম ভাববাদ (Idealism)। এই মতবাদ অনুযায়ী দৃশ্যমান জগতের মূলে আছে একটি ভাবমূলক (ideal or spiritual) সত্তা এবং সেই সত্তাই চিরসত্য,

চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর। আমাদের চারপাশের জড়বস্তুর জগৎটি আসলে অস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল এবং সেইজন্য প্রকৃত অস্তিত্বের দাবী করতে পারে না। অনেক ভাববাদীদের মতে এ দৃশ্যমান জগৎটি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং আমাদের ভ্রম থেকে প্রসূত। এই ভাবমূলক সত্তাকে ঈশ্বর, ব্রহ্ম; পরমাত্মা (Absolute) প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করা হয়।

এখন মানুষের মধ্যে যে প্রাণ বা আত্মার সন্ধান পাই তা হল এই ব্রহ্ম বা পরমাত্মারই অংশ। অতএব জীবনের লক্ষ্য হল সেই ব্রহ্ম বা পরমাত্মার সঙ্গে ব্যক্তির অভ্যন্তরস্থ আত্মা বা জীবাত্মার অভেদত্ব উপলব্ধি করা। এই নির্দেশকে ভারতীয় দর্শনে তৎ ত্বম্ অসি (সেইই তুমি) এই প্রসিদ্ধ বচনের দ্বারা বাঙ্‌ময় করে তোলা হয়েছে।

ব্রহ্ম ও আত্মার মধ্যে অভিন্নতাকে জানা যখন জীবনের লক্ষ্য তখন তা থেকে শিক্ষার লক্ষ্য কি হবে তা সহজেই অনুমেয়। শিক্ষার লক্ষ্য হল আত্মবিকাশ (self-development) ও আত্মোপলব্ধি (self-realisation)। শিশুর মধ্যে অঙ্কুর অবস্থায় যে আত্মা অ-বিকশিত আছে তাকে উপযুক্ত মাধ্যমে পূর্ণতার পথে নিয়ে যাওয়াই শিক্ষার কাজ। শিক্ষা সেই অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত করতে পারে না। তার একমাত্র কাজ হল যা শিশুর মধ্যে অবিকশিত অবস্থায় আছে তাকে বিকশিত করা। ভাববাদীদের মতে শিশুর ক্রমবিকাশে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা থাকলেও তার গুরুত্ব তত বেশী নয়। কেননা শিক্ষা শিশুকে নতুন কিছু দিতে পারে না, যেমন মালী হাজার চেষ্টা করলেও আমগাছের বীজ থেকে লিচু গাছ তৈরী করতে পারে না। যা অস্ফুটিত তাকে ফুটিয়ে তোলাই শিক্ষার পক্ষে একমাত্র সম্ভবপর।

ভাববাদীদের এই সংব্যাখ্যানকে ভিত্তি করেই শিশুর ক্রমবিকাশকে গাছের বৃদ্ধির সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। একটা ছোট বীজের মধ্যে যেমন বিরাট মহীরুহটি অ-প্রকাশিতরূপে লুকিয়ে থাকে তেমনি ছোট শিশুর মধ্যে পরমাত্মা অব্যক্তরূপে বিরাজ করে। শিক্ষার কাজ এই অবিকশিতকে বিকশিত করা। প্রসিদ্ধ ভাববাদী শিক্ষক ফ্রয়েবেলের (Froebel) প্রবর্তিত কিণ্ডারগার্টেন (Kindergarten) শিক্ষাব্যবস্থাতে এই ভাববাদী শিক্ষার লক্ষ্যটিকেই বাস্তবায়িত করা হয়েছে। কিণ্ডারগার্টেন কথাটির অর্থ শিশুদের বাগান—যেখানে গাছেদের মতই শিশুরা বিনা বাধায় স্বাভাবিক ও সহজ পথে তার নির্দিষ্ট পূর্ণতায় গিয়ে পৌছবে।

জড়বাদ

ভাববাদের পরে আসে জড়বাদ (Materialism)। এটি আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা থেকে প্রসূত। এই মতে কোন ভাবমূলক পরমসত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। দৃশ্যমান জড় বিশ্বকেই একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। বিশ্বজগৎ চলছে প্রকৃতির নিয়মে, তার পিছনে কোন অ-পার্থিব শক্তির হস্তক্ষেপ নেই। আমাদের ইহজীবনই একমাত্র জীবন। মৃত্যুর পর কোন আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব আছে বলে বিশ্বাস করা হয় না। অতএব এই মত অনুযায়ী আমাদের এই স্বল্পস্থায়ী জীবনকে যতটা সম্ভব সুন্দর ও কল্যাণকর করে তোলাই শিক্ষার কাজ। ব্যক্তির নিজের প্রয়োজন ও যে সমাজে সে বাস করে তার প্রয়োজন—এ দুইএর মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে সুস্থ ও সুতৃপ্ত জীবন যাপনে সহায়তা করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। ভাববাদীদের কাছে যেমন শিক্ষার গুরুত্ব অল্প তেমনি জড়বাদীদের কাছে শিক্ষার গুরুত্ব অসীম। তাঁদের মতে শিক্ষা মানুষের মধ্যে নানারূপ নতুন পরিবর্তন আনতে পারে, তার মানসিক শক্তি বাড়াতে পারে, তার চিন্তাশক্তিকে শাণিত করে তুলতে পারে, তার সামাজিক ও নৈতিক চেতনা জাগাতে পারে, তাকে উন্নত জীবন যাপনে সমর্থ করে তুলতে পারে। এককথায় শিক্ষা অঘটন ঘটাতে পারে। ভাববাদীদের কাছে শিক্ষা ব্যক্তির বিকাশে সাহায্যকারী একটি উপাদান মাত্র। জড়বাদীদের হাতে শিক্ষা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণে সমর্থ অতি-শক্তিশালী উপকরণ বিশেষ।

যদিও আজকাল স্বল্পচিন্তাশীল ব্যক্তি ছাড়া কেউ আর চরম জড়বাদের সমর্থক নন, তবুও আধুনিক সভ্যতায় বিজ্ঞান, শিল্প, অর্থনীতি প্রভৃতির সাম্প্রতিক অকল্পনীয় উন্নতির মূলে যে এই জড়বাদী চিন্তাধারা আছে একথা অনস্বীকার্য। কম্যুনিষ্ট মতবাদীরা পুরোপুরি জড়বাদী এবং শিক্ষাকে তাঁরা তাঁদের ব্যক্তির ও সামাজিক উন্নতির একটা প্রধান উপকরণ রূপে ব্যবহার করে থাকেন। বস্তুত বর্তমান শিক্ষা-বিজ্ঞানের অভাবনীয় অগ্রগতির পিছনে আছে এমন দুটি দার্শনিক মতবাদ যাদের আমরা জড়বাদীদের গোষ্ঠীভুক্ত করতে পারি।

প্রকৃতিবাদ

প্রথমটিকে প্রকৃতিবাদ (Naturalism) বলা হয়। প্রকৃতিবাদ একটি স্বতন্ত্র বা স্বয়ংসম্পূর্ণ দার্শনিক মতবাদ নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রেই একটি বিশেষ

আন্দোলন রূপে প্রকৃতিবাদের জন্ম হয়। এই মতবাদটিকে জড়বাদ বলা যেতে পারে এইজন্য যে এই মতে কোন অতি-পার্থিব বস্তুর অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয় না। একমাত্র প্রকৃতিকেই চরম ও মৌলিক সত্তা বলে মানা হয়। এই মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষা প্রকৃতির অনুগামী হবে। প্রকৃতি কথাটির আবার দুটি অর্থ হতে পারে। এক বাইরের প্রকৃতি, অপরটি শিক্ষার্থীর অন্তর্প্রকৃতি। প্রথম অর্থে, শিক্ষা প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী হবে। অর্থাৎ মানুষের তৈরী সমাজের কৃত্রিম বিধিনিষেধ ও যান্ত্রিক আচার-ব্যবহার শিক্ষাকে পঙ্গু ও নিষ্ফল করে তুলবে না। দ্বিতীয় অর্থে, শিক্ষা শিক্ষার্থীর প্রকৃতিকে অনুসরণ করবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর সহজাত শক্তি ও সম্ভাবনা, তার রুচি ও চাহিদা, তার ইচ্ছা ও আগ্রহ এইগুলিই হবে শিক্ষার নিয়ন্ত্রক ও নির্ধারক, অন্য কোন বহিস্থ শক্তি নয়। গতানুগতিক প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর স্বাভাবিক চাহিদা ও শক্তিকে উপেক্ষা করে যে শিক্ষাব্যবস্থা তার উপর বয়ঃপ্রাপ্তগণ চাপিয়েছেন সেই অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরই প্রতিবাদ হিসাবে এই মতবাদের জন্ম। এক কথায় প্রকৃতিবাদ অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য হল স্বাভাবিক পন্থায় শিশুর অন্তঃস্থ প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশসাধন করা। এই মতবাদে শিক্ষার সামাজিক দিকটাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করা হয়েছে।

যদিও দার্শনিক মতবাদ হিসাবে প্রকৃতিবাদ জড়বাদী তবুও প্রকৃতিবাদে যেহেতু বহিপ্রকৃতি ও ব্যক্তির অন্তপ্রকৃতিকে পুরোভাগে স্থান দেওয়া হয় সেই জন্য বহু ভাববাদী মনীষীও প্রকৃতিবাদের সমর্থক। এঁরা এঁদের দার্শনিক মতবাদ ও পরমসত্তার স্বরূপ নির্ণয়ে স্পষ্টই ভাববাদী অথচ ব্যক্তিসত্তার আচরণ-নিয়ন্ত্রণে, বিশেষ করে শিক্ষার প্রকৃতি নির্ধারণে এঁরা হলেন চরম প্রকৃতিবাদী। এই শ্রেণীভুক্ত মনীষীদের অন্তর্গত হলেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, রুশো, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি জগদ্‌বিখ্যাত ভাবনায়কগণ।

প্রয়োগবাদ

শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান যে দার্শনিক মতবাদটি থেকে পাওয়া গেছে তার নাম হল প্রয়োগবাদ (Pragmatism)। এই মতবাদটি বিংশ শতাব্দীর একান্ত নিজস্ব এবং আমেরিকার মাটিতে এর জন্ম। প্রকৃতিবাদের সঙ্গে নানা দিক দিয়ে এর প্রচুর মিল আছে। শিক্ষার্থীর শিক্ষা যে তার প্রকৃতি অনুযায়ী হবে প্রকৃতিবাদের এই নির্দেশটুকু পুরোপুরি প্রয়োগবাদ গ্রহণ করেছে।

তবে প্রকৃতিবাদে যেমন শিশুর ব্যক্তিগত চাহিদার উপরেই সম্পূর্ণ জোর দেওয়া হয়েছে এবং সমাজের চাহিদাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে, প্রয়োগবাদে কিন্তু তেমন কোন অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নি। বরং প্রয়োগবাদে এই দুটি দৃষ্টি-ভঙ্গীর মধ্যে একটা বাস্তব সংহতি আনার চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও সাধারণ জড়বাদের সঙ্গে প্রয়োগবাদের অনেক ক্ষেত্রে প্রচুর অমিল আছে তবুও পরম সত্তার প্রকৃতি নির্ণয়ে প্রয়োগবাদ জড়বাদেরই সমগোষ্ঠী। প্রয়োগবাদের প্রথম প্রচারক উইলিয়ম জেম্‌স্ ঈশ্বর বা ভাবমূলক পরমসত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করলেও জন ডিউই প্রভৃতি ঐ মতের আধুনিক পরিপোষকেরা স্পষ্টতই জড়বাদী। তাঁরা জড় জগতের অস্তিত্বকেই একমাত্র চরম সত্য বলে মেনে নিয়েছেন।

প্রয়োগবাদী জন ডিউইর মতে শিক্ষার কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই এবং থাকতে পারে না। কেননা শিক্ষা একটা প্রক্রিয়া বিশেষ। কোন বস্তুর লক্ষ্য বলতে এমন একটি কিছু বোঝায় যেটি ঐ বস্তুর বাইরে অবস্থিত এবং যেটিতে পৌছনই ঐ বস্তুর কাম্য। অতএব কোন বস্তুর লক্ষ্য সকল সময়েই সেই বস্তুর সীমার বাইরে থাকে। কিন্তু শিক্ষা হল এক ধরনের প্রক্রিয়া, কেননা শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে শিশুর বৃদ্ধি বা ক্রমবিকাশের সঙ্গে সমার্থক। কোন প্রক্রিয়ার বহিস্থ কোন লক্ষ্য থাকতে পারে না। যে কোন প্রক্রিয়ার লক্ষ্য ঐ প্রক্রিয়ারই অন্তর্গত। যেমন, "চলা"-রূপ প্রক্রিয়ার একমাত্র লক্ষ্য হল "আরও চলা", তার বাইরের কোন লক্ষ্য "চলা-রূপ" প্রক্রিয়ার থাকতে পারে না। সেইরূপ শিক্ষা প্রক্রিয়ার "আরও শিক্ষা" ছাড়া আর কোনও লক্ষ্য থাকতে পারে না। যাঁরা শিক্ষার নানারূপ ছোট বড় লক্ষ্যের কথা বলে থাকেন, আসলে তাঁরা শিক্ষক, পিতামাতা, সমাজ-নায়ক প্রভৃতিদের নির্ধারিত লক্ষ্যের কথাই বলেন। কিন্তু আসলে শিক্ষার অধিকতর শিক্ষা ছাড়া আর কোনও লক্ষ্য থাকতে পারে না।

যদিও ডিউই শিক্ষার কোন সুস্পষ্ট লক্ষ্য নির্ণয় করেন নি, তবুও তাঁর দেওয়া শিক্ষার সংজ্ঞা থেকে শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে আমরা একটা ধারণা করতে পারি। শিক্ষার কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য দেওয়া যায় না, কেননা তেমন কোন প্রচেষ্টা করতে গেলেই শিক্ষার কার্যকে সংকুচিত করে ফেলা হবে। শিক্ষা হচ্ছে জীবনের সঙ্গে সমব্যাপী। সেইজন্য জীবনের চেয়ে ছোট এমন কোন লক্ষ্যের কথা শিক্ষা সম্বন্ধে বলা চলে না।

এইজন্য অনেকের মতে শিক্ষার কোন সর্বজনীন লক্ষ্য থাকতে পারে না। সাধারণত প্রত্যেকেই শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করতে গিয়ে জীবন সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব

সংব্যাখ্যানের উপরে নির্ভর করেন এবং ফলে সেই লক্ষ্য অসম্পূর্ণ বা আংশিক হতে বাধ্য। পূর্বের আলোচনাগুলিতে আমরা এর প্রচুর উদাহরণ পেয়েছি।

কিন্তু যদি শিক্ষার ব্যাপকতম ব্যাখ্যা নেওয়া যায় তবে এ ভ্রমের অবকাশ থাকবে না এবং সেদিক দিয়ে আমরা শিক্ষার একটা সর্বজনীন লক্ষ্যও উপস্থাপিত করতে পারি।

শিক্ষার সর্বজনীন লক্ষ্য

শিক্ষার লক্ষ্য হল সুসংহত জীবনগঠন, শিশুর বহুমুখী ক্রমবিকাশকে পূর্ণতায় পৌছতে সাহায্য করা; একদিক দিয়ে তার অভ্যন্তরস্থ সম্ভাবনাগুলিকে পূর্ণভাবে বিকশিত করা, অন্যদিকে তার সামাজিক জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে তোলা; এক কথায় শিশুকে 'সম্পূর্ণ মানুষ' হতে সমর্থ করা।

প্রশ্নাবলী

1. Since the child is destined to live out his life, not as an abstract individual but as a member of a community, we may consistently define education as the making of good citizens.

Develop the idea of the aim of education keeping the above aspect in mind. (B.T. 1951, 1954)

Ans. (পৃঃ ২৬—পৃঃ ৩১)

2. The goal of education is sometimes said to be adjustment. Adjustment may be either to the nature or to the social environment. (B.T. 1952)

Ans. (পৃঃ ২৬—পৃঃ ২৭)

3. Education teaches social adjustment. Consider the definition and attempt a more comprehensive definition of education. (B. A. Educ. 1957)

Ans. (পৃঃ ২৬—পৃঃ ৩১)

4. Critically examine the different views regarding the aims of education. What in your opinion should be the ultimate aim of education ? (B. T. 1961)

Ans. (পৃঃ ৬৬—পৃঃ ৩১)

5. Give a critical estimate of some of the aims of education put forth by different educationists and say what seems to you to be the most satisfactory aim of education. (B. A. 1962)

Ans. (পৃ ২৬—পৃঃ ৩১)

পাঁচ

শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য

(Individualistic and Socialistic Aims of Education)

শিক্ষার সংজ্ঞা ও লক্ষ্য নির্ণয়ে বহু প্রাচীন কাল থেকেই দুটি বিভিন্নরূপী চিন্তাধারা বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। প্রথমটি হল ব্যক্তিতান্ত্রিক ভাবধারা, অপরটি সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা। আমরা শিক্ষার স্বরূপ ও লক্ষ্য আলোচনার সময় এই দুটি চিন্তাধারার সঙ্গে ইতিপূর্বেই পরিচিত হয়েছি। আমরা এও দেখেছি যে এ দুটি ভাবধারা দুটি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উৎপন্ন। শিক্ষাকে যখন মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে বিচার করা হয় তখন ব্যক্তিতান্ত্রিক ব্যাখ্যাটাই বড় হয়ে ওঠে, আবার যখন সেই শিক্ষাকেই সমাজবিজ্ঞানের দিক দিয়ে দেখা যায় তখন সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যাটাই পুরোভাগে আসে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যের ক্ষেত্রেও আমরা দুটি ভিন্নরূপী মতবাদের সাক্ষাৎ পাই।

প্রাচীনকালে মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান এই দুটি বিজ্ঞানই যথেষ্ট উন্নত স্তরে না পৌছনর ফলে ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক মতধারার মধ্যে বৈষম্য থাকলেও তাদের দ্বন্দ্বটা তেমন সুস্পষ্ট ছিল না। কিন্তু আধুনিককালে মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান এই দুইয়ের অভাবনীয় উন্নতির জন্য সাম্প্রতিক শিক্ষায় তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বটা বেশ তীব্র হয়ে উঠেছে এবং তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হয়ে উঠেছে। সেইজন্য আধুনিক শিক্ষাবিদগণের একটা বড় সমস্যা হচ্ছে এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটির একটা সুষ্ঠু সমাধান করা।

ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদ

ব্যক্তিতান্ত্রিক সংব্যাখ্যানে শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশসাধন। এ ছাড়া তার অন্য কোন লক্ষ্য নেই। প্রত্যেক ব্যক্তিই হচ্ছে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা-বিশেষ এবং সে তার দেহ-মন-অনুভূতি প্রভৃতি নিয়ে একটি

সুনির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে বাস করে। সমাজ, সংসার, প্রতিষ্ঠান যা কিছুই মানুষ গড়ুক না কেন তবু যে সে সকলের কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন এক সত্তার অধিকারী এ কথা অনস্বীকার্য। প্রত্যেকটি মানুষই যেন একটি দ্বীপ বিশেষ, তার নিকটতম মানুষ থেকেও সে পৃথক হয়ে বিরাজ করে, মাঝখানে থাকে পার্থিব স্থানের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান। প্রত্যেকটি মানুষই কতকগুলি সহজাত উপাদান নিয়ে জন্মায়, সেগুলি সম্পূর্ণ তার নিজস্ব। অপরের সঙ্গে অতুলনীয়। যেমন দেহগত বৈশিষ্ট্য, মানসিক শক্তি, আবেগজনিত বিশেষত্ব ইত্যাদি। এগুলির পূর্ণবিকাশের উপরই তাঁর অস্তিত্বের সার্থকতা নির্ভর করে। তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলির অবাধ ও অব্যাহত পরিণতি থেকে জন্ম নেবে তার সুষ্ঠু ও সুগঠিত ব্যক্তিসত্তা। যে কোনরূপ বাইরের বাধা, হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণ সেই সম্ভাবনাগুলির সহজ বিকাশের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে এবং তার ব্যক্তিসত্তার অভীষ্ট বিকাশে ব্যাঘাত ঘটাবে। অতএব ব্যক্তির মঙ্গল নির্ভর করছে ব্যক্তির অবাধিত ক্রমবিকাশের উপর এবং শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে যাতে ব্যক্তির প্রকৃতিদত্ত সম্ভাবনাগুলি পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয় তারই ব্যবস্থা করা।

এই ভাবধারার যাঁরা সমর্থক তাঁদের মতে সমাজের চাহিদা সর্বদাই ব্যক্তির চাহিদার কাছে গৌন। আগে ব্যক্তি, তারপর সমাজ। ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসেও তাই বলে। ব্যক্তিরই বিশেষ কতকগুলি চাহিদা মিটানোর জন্যই সমাজের সৃষ্টি। লক এবং রুশো উভয়েই তাঁদের "সামাজিক চুক্তি" মতবাদে দেখিয়েছেন যে জনসাধারণ তাদের কতকগুলি নিজস্ব চাহিদা মিটানোর জন্যই সমাজের সৃষ্টি করেছিল এবং সমাজ ব্যক্তির উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপকরণ বিশেষ। অতএব সমাজের চাহিদার জন্য ব্যক্তির চাহিদাকে কখনই ছোট করা যেতে পারে না। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি নিয়েই ত সমাজ। ব্যক্তির যদি মঙ্গল হয় তবে সমাজের মঙ্গল স্বাভাবিকভাবেই আসবে। তৃতীয়ত, সমাজের অগ্রগতির জন্যও ব্যক্তির চাহিদাকে প্রাধান্য দিতে হবে। সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় যে, কি সাহিত্যে, কি শিল্পে, কি দর্শনে, কি বিজ্ঞানে সর্বত্রই যা কিছু অভিনব, যা কিছু প্রগতিশীল, যা কিছু অসাধারণ তা হল ব্যক্তিগত প্রতিভার দান এবং এই ব্যক্তি-মনের অবদানের উপরই সমাজের উন্নতি ও গতিশীলতা দাঁড়িয়ে আছে। অতএব সমাজের অস্তিত্ব, মঙ্গল ও উন্নতি এই সবের জন্যই ব্যক্তির চাহিদা যাতে পূর্ণ হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে।

সংক্ষেপে এই হল ব্যক্তিতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে শিক্ষার লক্ষ্যের ব্যাখ্যা।

সমাজতান্ত্রিক মতবাদ

যাঁরা সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার পোষক তাঁরা ঠিক এর বিপরীতটি বলেন। তাঁদের মতে সমাজ ছাড়া ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকতে পারে না। পৃথিবীর জীবনযুদ্ধে একক মানুষের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম হলেই মানুষ সমাজবদ্ধ হয়। অতএব একক মানুষ বহুদিনই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এখনকার মানুষ সমাজভুক্ত মানুষ। অতএব তাকে বাঁচতে হলে সমাজকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, তাকে শক্তিশালী করতে হবে। প্রয়োজনে তাকে তার ব্যক্তিগত স্বার্থ পরিত্যাগ করতে হবে সমাজের স্বার্থের জন্য।

ব্যক্তির শিক্ষাও সেই উদ্দেশ্যেই নিয়ন্ত্রিত হবে অর্থাৎ ব্যক্তির শিক্ষা এমন হবে যে তার দ্বারা সমাজের চাহিদাই মিটানোর ব্যবস্থা হবে, ব্যক্তির চাহিদা নয়।

এই মতের পরিপোষকগণ বলেন সমাজের চাহিদা সমাজের অধিকাংশের চাহিদারই প্রতিচ্ছবি। অতএব বিশেষ কোন ব্যক্তির চাহিদা যদি সমাজের সেই চাহিদার পরিপন্থী হয় তবে সমাজের অধিকাংশের স্বার্থের জন্য ব্যক্তিকে সেই স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে। নইলে ব্যক্তির চাহিদা মেটাতে গিয়ে সমাজের অধিকাংশের ক্ষতি করা হবে। তা ছাড়া ব্যক্তি সমাজেরই একজন এবং সমাজের কল্যাণ হলে মূলত ব্যক্তিই সেই কল্যাণের অধিকারী হবে।

সমাজবদ্ধ জীবনযাপনের ফলে ব্যক্তি যে কত বিভিন্নভাবে উপকৃত হচ্ছে তার পরিসংখ্যান দেওয়া যায় না। নিরাপত্তা, শান্তি-শৃঙ্খলা, সুবিচার, শিক্ষা, ধর্মাচরণ, জীবিকা-অর্জন প্রভৃতি জীবনের গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাগুলি মিটানোর দায়িত্ব আজ সমাজ নিজের হাতেই নিয়েছে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনযাপনের পদ্ধতি জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে এবং ফলে আমরা দিন দিন সমাজের উপর অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে উঠছি। সমাজ বহির্ভূত হয়ে বাস করার কথা এখন কল্পনা করাই যায় না। অতএব সেই সমাজের ভিত্তি যাতে অধিকতর সুদৃঢ় হয় এবং যাতে তার কাজ সুশৃঙ্খলায় নির্বাহ হয় সেটা দেখা প্রত্যেক ব্যক্তিরই উচিত। সেইজন্য যদি ব্যক্তির নিজস্ব কোন চাহিদা অতৃপ্ত থেকে যায় তবে ব্যক্তির পক্ষে সে স্বার্থটুকু ত্যাগ করা তাঁর কর্তব্যেরই অন্তর্গত।

একদল সমাজতন্ত্রবাদী আবার সমাজের চাহিদার বাইরে ব্যক্তির কোনরূপ

চাহিদা থাকতে পারে বলেই বিশ্বাস করেন না। ব্রিটিশ দার্শনিক হব্‌সের প্রসিদ্ধ 'সামাজিক চুক্তি' মতবাদ অনুযায়ী প্রথম যখন সমাজ সৃষ্ট হয় তখন ব্যক্তি তার সমস্ত স্বাধীনতা একজন বিশেষ সমাজনায়কের হাতে স্বেচ্ছায় উঠিয়ে দিয়েছিল এবং সেই চুক্তির ফলেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। প্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক হিগেল সমাজকে বর্ণনা করেছেন একটি অতি-ব্যক্তিক সত্তারূপে এবং সাধারণ ব্যক্তিগত জীবনগুলি সেই সত্তার এক একটি ক্ষুদ্র অংশ বিশেষ। হিগেলের কাছে রাষ্ট্র একটি শাশ্বত আধ্যাত্মিক জীবন এবং ব্যক্তিগত জীবনের যতটুকু বাস্তবতা, তার সবটুকুই ঐ আধ্যাত্মিক সত্তার কাছ থেকেই ধার করা। হব্‌সের মতে সমাজবিরোধী কোন চাহিদা পোষণ করার অধিকারই ব্যক্তির নেই, কেননা ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সে অধিকার সমাজকে দিয়ে দিয়েছে। আর হিগেলের মতে সমাজবিরোধী চাহিদা ব্যক্তির পক্ষে পোষণ করাটাই অবাস্তব, আর যদি তেমন কিছু পোষণ করা হয়ে থাকে তবে সেটা ব্যক্তির পক্ষেই অমঙ্গলময়।

একদল উগ্র সমাজতন্ত্রবাদী আরও চরম মত পোষণ করে থাকেন। তাঁরা সমাজকে তুলনা করেন একটি জীবন্ত প্রাণীর সঙ্গে, আর ব্যক্তিরা হল তার দেহের এক একটি কোষ-স্বরূপ। দেহের একটি কোষকে যেমন দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করলে সেটি বাঁচতে পারে না, তেমনি ব্যক্তির পক্ষেও সমাজের বাইরে থেকে বাঁচা অসম্ভব। দেহের চাহিদার বিরোধী কোন চাহিদা যেমন কোন কোষের থাকতে পারে না তেমনি ব্যক্তিরও সমাজবিরোধী কোন চাহিদা থাকতে পারে না।

এক কথায় সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে ব্যক্তির সমাজবিরোধী কোন চাহিদা থাকা অনুচিত ও অমঙ্গলকর এবং থাকলেও সমাজের চাহিদার কাছে তার সে চাহিদাকে উৎসর্গ করে দিতে হবে বিনা দ্বিধায়। অতএব ব্যক্তির চাহিদা পূর্ণ করাটা শিক্ষার লক্ষ্য নয়, শিক্ষার লক্ষ্য হল সমাজের চাহিদা পূর্ণ করা।

ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত

শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা শিক্ষার এই দুটি ভিন্নরূপী লক্ষ্যের প্রয়োগ বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন শিক্ষা-ব্যবস্থায় দেখতে পাই।

প্রাচীন ভারতের আশ্রম-শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যক্তিতান্ত্রিকতার প্রভাবই ছিল

বেশী। আত্মোপলব্ধিকেই ব্যক্তির জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে মনে করা হত এবং সমাজ-জীবনের স্থান ছিল অনেক নীচে। ব্যক্তির নিজস্ব শক্তি ও সম্ভাবনার পূর্ণবিকাশই ছিল তখনকার শিক্ষার লক্ষ্য।

কিন্তু পরবর্তী যুগে বিশেষ করে বৌদ্ধধর্মের শিক্ষাব্যবস্থায় সমাজতান্ত্রিকতার প্রভাব দেখা যায়। নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি শিক্ষায়তনগুলির লক্ষ্য ছিল বৌদ্ধ সমাজের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা এবং শিক্ষাকে সেই উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত করা হত।

প্রাচীন গ্রীসের সোফিষ্ট শিক্ষাবিদেরা উগ্র ব্যক্তিতান্ত্রিকতার সমর্থক ছিলেন। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে নিরঙ্কুশভাবে বিকশিত হতে দেওয়াই ছিল তাঁদের শিক্ষার লক্ষ্য। তাঁদের সংব্যাখ্যানে সমাজের কোন দাবীর কোন মূল্যই ছিল না। পরবর্তী যুগে ব্যক্তিতান্ত্রিক ভাবধারার অগ্রদূত রূপে দেখা দিয়েছিলেন রুশো। তাঁর প্রখ্যাত এমিল নামক গ্রন্থে তিনি শিশু এমিলের জন্য একটি পুরোপুরি ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষার পরিকল্পনা দিয়েছেন। তাঁর মতে সমাজের সমস্ত প্রভাব থেকে পরিমুক্ত এক পরিবেশে এমিলের শিক্ষা সম্পাদিত হবে এবং একমাত্র এমিলের ব্যক্তিসত্তার নিজস্ব দিকগুলির অব্যাহত বিকাশ ছাড়া শিক্ষার অন্য কোন লক্ষ্য থাকবে না।

গ্রীকরাষ্ট্র এথেন্সে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাও ছিল ব্যক্তিতান্ত্রিক। ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলির পূর্ণ বিকাশই ছিল শিক্ষার লক্ষ্য। সমাজের দাবী ছিল ব্যক্তির চাহিদার কাছে গৌণ। কিন্তু তারই পাশাপাশি স্পার্টা নামে আর একটি গ্রীক রাষ্ট্রে শিক্ষা ছিল পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক। সেখানে সমাজের স্বার্থের যূপকাষ্ঠে ব্যক্তির দাবীকে সম্পূর্ণভাবে বলি দেওয়া হয়েছিল। আত্মরক্ষা ও রাজ্যবৃদ্ধি এই দুই কারণেই স্পার্টা রাষ্ট্রের তখন প্রয়োজন ছিল উন্নত সামরিক শক্তির। রাষ্ট্রের এই চাহিদা পূর্ণ করার জন্য প্রত্যেকটি নাগরিককে করে তোলা হল সমরকুশলী সৈনিক। নাগরিকদের ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষা পরিকল্পনা সমস্ত উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ জাতিটাকেই একটি বিরাট সশস্ত্র বাহিনীতে রূপান্তরিত করা হয়েছিল।

আধুনিক যুগেও আমরা স্পার্টার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখেছি হিটলারের নাজী জার্মানী ও মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ত ইটালীতে। এই দুই রাষ্ট্রেও উগ্র সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল। রাষ্ট্রের সমষ্টিগত চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য ব্যক্তিগত চাহিদাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছিল। হিটলার চেয়েছিলেন সমস্ত পৃথিবীকে একটি বিরাট জার্মান সাম্রাজ্যে পরিণত করতে এবং স্পার্টার সমর-

নায়কদের মত তিনিও প্রত্যেকটি জার্মানবাসীকেই বাধ্য করেছিলেন তাঁর উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপকরণরূপে আত্মবলি দিতে। মুসোলিনীর ইটালীতেও ব্যক্তিগত চাহিদাকে সমাজের স্বার্থে উৎসর্গ করা হয়েছিল।

রাশিয়া, চীন প্রভৃতি আধুনিক কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলিতেও যদিও শিক্ষার এই উগ্র সমাজতান্ত্রিক রূপ দেখা যায় না তবুও সমাজের চাহিদা পরিতৃপ্ত করাই হচ্ছে সেখানে শিক্ষার প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য। সমাজের পরিপন্থী কোন ব্যক্তিগত চাহিদার স্থান সেখানেও নেই এবং সমষ্টির জন্যই যে ব্যক্তির অস্তিত্ব, এই তত্ত্বের উপরই শিক্ষার লক্ষ্য ও পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত। যে সকল ব্যক্তিগত চাহিদা সমাজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে অনুকূল সেই সকল চাহিদা কেবলমাত্র এই শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিপুষ্টি ও পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারে।

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী

শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তিতান্ত্রিক হওয়া উচিত, না সমাজতান্ত্রিক হওয়া উচিত এক কথায় এর উত্তর দেওয়া কখনও সম্ভব নয়। যদিও উভয় দলেরই উগ্র ও চরম সমর্থক পাওয়া যায় তবুও কোন স্থিরচিত্ত ব্যক্তিই একের দাবী অগ্রাহ্য করে অপরটিকে বড় করে তুলতে পারেন না। ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের চাহিদা মিটানো যে প্রয়োজন এ সত্য আজ সকলেই স্বীকার করবেন। সেইজন্য অধিকাংশ শিক্ষাবিদই ব্যক্তির চাহিদা ও সমাজের চাহিদার মধ্যে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সংগতি আনারই নির্দেশ দিয়ে থাকেন। তাঁদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হবে সমাজ ও ব্যক্তি উভয়ের চাহিদাকে সুষম মাত্রায় পরিতৃপ্ত করা।

তাঁদের মতে ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলির বিকাশ করাও যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন তার সামাজিক কর্তব্যগুলি পালন করতে তাকে সাহায্য করা। মানুষ মাত্রেই সামাজিক জীব। অতএব তার সর্বাঙ্গীন উন্নতি নির্ভর করছে তার সামাজিক ও ব্যক্তিগত উভয় দিকের সুষম বিকাশের উপর। তার ব্যক্তিগত দিকটিকে অবহেলা করলে যেমন একদিকে তার অস্তিত্বেরই কোন সার্থকতা থাকে না তেমনই অপর দিকে সমাজও তার ব্যক্তিগত অবদান থেকে বঞ্চিত হয়। আবার সামাজিক দিকটিকে অবহেলা করলে তার সুষ্ঠু জীবনযাপনই বিপদাপন্ন হয়ে ওঠে। অতএব সামাজিক পরিস্থিতিতে যাতে তার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলি পূর্ণ বিকাশলাভ করে সেটা দেখাই শিক্ষার কাজ।

কিন্তু কাগজে কলমে একথা লেখা সহজ হলেও বাস্তবজীবনে এই সামঞ্জস্য আনা খুবই শক্ত, এমন কি অসম্ভব বললেও চলে। কেননা, শিক্ষা ব্যক্তিতান্ত্রিক হবে কি সমাজতান্ত্রিক হবে সেটি সম্পূর্ণ নির্ভর করছে সমাজের কাঠামোর উপর। এই দুই শ্রেণীর চাহিদার মধ্যে সমতা আনতে হলে সমাজের কাঠামোটি এমন হওয়া চাই যেখানে ব্যক্তির চাহিদা ও সমাজের চাহিদার মধ্যে একটা নিখুঁত বোঝাপড়া সম্ভব হতে পারে কিন্তু সে আদর্শ সমাজ ব্যবস্থাতত্ত্বের খাতিরে সম্ভব হলেও বাস্তবে দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে বাস্তবে দেখা যায় যে একদিকে না একদিকে পাল্লা বেশী ঝুলে যায় এবং হয় ব্যক্তির চাহিদার উপর, নয় সমাজের চাহিদার উপর বেশী জোর দেওয়া হয়।

জন ডিউই ও গণতন্ত্র

জন ডিউইর মতে এই অভীষ্ট আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা হচ্ছে গণতন্ত্র, যেখানে ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক এই দু'প্রকারের চাহিদার মধ্যে আপনা থেকেই একটি সুষম সামঞ্জস্য দেখা দেবে। তিনি বলতে চান যে বস্তুতান্ত্রিক ও সমাজ-তান্ত্রিক লক্ষ্যের মধ্যে কোনরূপ মৌলিক বিভেদ নেই এবং যে বিভেদ আমরা দেখতে পাই সেটা অস্বাভাবিক এবং ত্রুটিপূর্ণ সমাজব্যবস্থার ফল। তাঁর মতে গণতন্ত্রই হচ্ছে আদর্শ সমাজব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তির চাহিদা ও সমাজের চাহিদা পরস্পরের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাবে এবং যেখানে শিক্ষার লক্ষ্য হবে সমাজ ও ব্যক্তির মিলিত চাহিদার পরিতৃপ্তি আনা।

ডিউইর এই মতকে অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি যে ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার দিক দিয়ে শিক্ষার লক্ষ্যগুলির ক্রমবিন্যাস করলে আমরা এক সীমান্তে পাই চরম ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদ যেখানে বলা হচ্ছে ব্যক্তির চাহিদাই সব, সমাজের চাহিদার কোন দাবীই নেই, যেমন সোফিষ্টদের শিক্ষার আদর্শ বা প্রাচীন ভারত ও এথেন্সে প্রচলিত শিক্ষা—আর অপর সীমান্তে পড়ছে চরম সমাজতান্ত্রিক মতবাদ—যেখানে বলা হচ্ছে সমাজের চাহিদাই সব, ব্যক্তির চাহিদা কিছু নয়, যেমন প্রাচীন স্পার্টা, নাজী জার্মানী প্রভৃতিতে প্রচলিত শিক্ষা। আর এই দুই সীমান্তের ঠিক মাঝখানে পড়ছে গণতান্ত্রিক শিক্ষা যেখানে ব্যক্তির চাহিদা ও সমাজের চাহিদা অভিন্ন হয়ে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাচ্ছে।

জন ডিউই গণতন্ত্রকে শিক্ষার পক্ষে আদর্শ রাষ্ট্র বলে বর্ণনা করলেও তেমন

কোন ত্রুটিহীন গণতন্ত্র বাস্তবে আমাদের চোখে পড়ে না যেখানে এই দুই বিভিন্ন শিক্ষার লক্ষ্য এক হয়ে গেছে এবং তাদের মধ্যে কোনরূপ সংঘর্ষ নেই। আজকাল অধিকাংশ রাষ্ট্রেই সমাজতান্ত্রিক প্রবণতা নানা কারণে বৃদ্ধির পথে, ফলে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে ব্যক্তিগত চাহিদা নানা দিক দিয়ে ব্যাহত হয়। তবে একথা সত্য যে আধুনিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি অপেক্ষা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত চাহিদা মিটানোর স্বাধীনতা অনেক বেশী।

সিদ্ধান্ত

অতএব যদিও আমরা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম যে শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় ভাবধারার মধ্যে একটি সমতা রেখে চলবে তবু এ সিদ্ধান্ত বাস্তবে রূপায়িত করাটা কেবলমাত্র শিক্ষার প্রক্রিয়ার উপরে নির্ভর করছে না, শিক্ষার এই সমস্যার সমাধান নির্ভর করছে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যার সমাধানের উপরে, যথা, আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার সংগঠন। শিক্ষাকে আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি একটা সামাজিক প্রক্রিয়ারূপে এবং শিক্ষা সত্য সত্য তখনই নিখুঁত হবে যখন সমাজ-ব্যবস্থাও সবদিক দিয়ে ত্রুটিমুক্ত হয়ে উঠবে।

প্রশ্নাবলী

1. "The aim of education has been stated in terms of social efficiency or an adequate adjustment to social environment in which man is born." Explain (B.T. 1956)

Ans. (পৃঃ ৩৭—পৃঃ ৪৪)

2. "The general aim of education should be to offer the fullest possible scope to individuality, while keeping in view the claims and needs of society"—Discuss. (B.T. 1956)

Ans. (পৃঃ ৩৭—পৃঃ ৪৪)

3. What do you understand by the individualistic and socialistic aims of education? Which would you advocate and why? (B. A. Educ. 1959, 1961)

Ans. (পৃঃ ৩৭—পৃঃ ৪৪)

4. How can the demands of personal development and the needs of society be met by education in a democratic society? (B.T. 1955)

Ans. (পৃঃ ৩৭—পৃঃ ৪৪)

ছয়

শিক্ষার মাধ্য ম (Agencies of Education)

ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের স্বার্থের জন্যই শিক্ষা অপরিহার্য। ব্যক্তির জীবনকে সার্থক করে তুলতে হলে তার সহজাত সম্ভাবনাগুলির পূর্ণ বিকাশ প্রয়োজন এবং সে কাজ উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া সম্ভব নয়। আবার অপরদিকে সমাজের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন সমাজের বর্তমান নাগরিকদের সঞ্চিত ভাব ও কৃষ্টির ভাণ্ডারটি ভবিষ্যৎ নাগরিকদের হাতে তুলে দেওয়া এবং তাও সম্ভব একমাত্র শিক্ষার মধ্য দিয়ে। অতএব ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন এই উভয়েরই অস্তিত্ব নির্ভর করছে শিক্ষার উপর, এ সত্য প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ বুঝতে পেরেছিল এবং সেই জন্যই আদিমতম সমাজেও কোন-না-কোন প্রকারের শিক্ষাদানের প্রথার প্রচলন ছিল।

পরোক্ষ মাধ্যম

কিন্তু প্রথম প্রথম এই শিক্ষাদানের কাজ পরোক্ষভাবেই সম্পাদিত হত। তখন শিক্ষাদানের জন্য কোন বিশেষভাবে গঠিত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা ছিল না। পরিবার, ধর্মায়তন, সামাজিক উৎসব, মেলা, পর্ব প্রভৃতি নানা সামাজিক সংস্থার মাধ্যমে সমাজের অপরিণত নাগরিকদিগকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া হত। এই শিক্ষাকে বলা যায় পরোক্ষ (informal) শিক্ষা। কেননা, এই সংস্থাগুলি সৃষ্টি হয়েছিল প্রত্যক্ষভাবে কোন সামাজিক বা ধর্মসম্বন্ধীয় প্রয়োজন মিটানোর জন্য, যদিও পরোক্ষভাবে এগুলি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত হত।

আদিম মানুষের শিক্ষা ছিল স্বল্প ও জটিল। কেমন করে খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়, বা বংশরক্ষা করতে হয় বা দৈবশক্তির অনুগ্রহ লাভ করতে হয়—এই শ্রেণীর কতকগুলি প্রাথমিক আচরণ আয়ত্ত করার মধ্যেই শিক্ষা ছিল সীমাবদ্ধ। শিক্ষাদানের প্রথার মধ্যেও তেমন কোন জটিলতা ছিল না। পিতামাতা বা সমাজের অন্যান্য বয়ঃপ্রাপ্তদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েরা এই প্রয়োজনীয় কৌশল ও বিদ্যাগুলি আয়ত্ত করত। আধুনিককালে যাকে আমরা শিক্ষানবিশী (apprenticeship) পদ্ধতি বলি অনেকটা সেই পন্থায় আদিমকালে ছেলেমেয়েরা শিক্ষালাভ করত।

প্রত্যক্ষ মাধ্যম

কিন্তু এই পরোক্ষ শিক্ষাপদ্ধতি বেশী দিন শিক্ষার চাহিদা মেটাতে পারল না। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি আয়তন ও জটিলতায় ক্রমশ বেড়ে চলল। সামাজিক, রীতিনীতি, জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল ও বিদ্যা, চিন্তা-প্রসূত ভাব-বৈচিত্র্য, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, শিল্প, কলা প্রভৃতি দিন দিন এমনভাবে স্ফীত-কলেবর হয়ে চলল যে শিক্ষা-দানের জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল। পরোক্ষ শিক্ষাদানের মাধ্যমে এই জটিল ও বিপুল শিক্ষণীয় বিষয়গুলি শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ-ভাবে শেখান আর সম্ভব নয়, দেখা গেল। দ্বিতীয়ত, অনেক শিক্ষণীয় বিষয় এতই বিশেষধর্মী হয়ে উঠল যে বিশেষজ্ঞের সাহায্য ছাড়া সাধারণ লোকের পক্ষে সেগুলির সার্থক শিক্ষা দেওয়াও অসম্ভব হয়ে উঠল; যেমন ধর্মমূলক অনুষ্ঠান, যুদ্ধ-বিদ্যা প্রভৃতি। সবশেষে, এই সময় মানুষ লিখনপ্রক্রিয়া আবিষ্কার করল। যতদিন শিক্ষা কথিত ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন পরোক্ষ শিক্ষার দ্বারা চাহিদা মিটান সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু লিখিত ভাষার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ মাধ্যমের সৃষ্টি অপরিহার্য হয়ে উঠল।

এই সকল কারণেই দেখা দিল প্রত্যক্ষ (formal) শিক্ষাদানের পদ্ধতি এবং তৈরী হল, বিদ্যালয়, পাঠশালা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ শিক্ষার মাধ্যম। কবে কোন্ দেশে প্রথম বিদ্যালয় তৈরী হয় সেটা নির্ভুলভাবে বলা কঠিন তবে ভারত মিশর, গ্রীস প্রভৃতি প্রাচীন সভ্য দেশগুলিতেই যে প্রথম শিক্ষার্থীকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয় সেটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সবদেশেই প্রত্যক্ষ শিক্ষার প্রথম বিষয়বস্তু ছিল ধর্ম ও ধর্মঘটিত নানা অনুশাসন এবং প্রথম শিক্ষক ছিলেন পুরোহিত বা ধর্মনেতা। পরে ক্রমশ ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও অন্যান্য বিষয়ও শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হল। লিখন পদ্ধতির প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে হাতে লেখা পুঁথি, পরে ছাপা বই শিক্ষার একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বলে বিবেচিত হতে সুরু হল।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের কাজের গুরুত্ব ও আয়তন বেড়ে চলল। বিভিন্ন স্তরের উপযোগী বিভিন্ন বিদ্যায়তন সৃষ্টি হল। যেমন প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ইত্যাদি। শিক্ষার প্রকৃতি অনুযায়ীও

কারিগরি, কৃষি-ঘটিত, বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয়, আইন-ঘটিত, চিকিৎসামূলক বিভিন্নধর্মী বিদ্যায়তনও দেখা দিল। কালক্রমে প্রত্যেক সভ্যসমাজেই শিক্ষার বিপুল দায়িত্ব ধীরে ধীরে শিক্ষার প্রত্যক্ষ মাধ্যমগুলির দ্বারাই পালিত হতে সুরু হল।

পরিবার—পরোক্ষ মাধ্যম

পরোক্ষ শিক্ষার মাধ্যমগুলির মধ্যে পরিবার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও শক্তিশালী। বিদ্যালয় সৃষ্টি হবার পূর্বে শিক্ষার প্রায় সমস্ত দায়িত্বই ছিল পরিবারের উপর। শিশুর বর্ণপরিচয় থেকে সুরু করে নৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় এমন কি বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানও সংঘটিত হত পরিবারের মাধ্যমে। এমন কি বিদ্যালয় সৃষ্ট হবার পরও বহুদিন শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবার তার একাধিপত্য চালিয়ে এসেছে।

প্রাচীন পরিবারে পিতামাতা ও অন্যান্য বয়ঃপ্রাপ্তদের কাছেই শিশু তার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করত। সেখানেই সে তার জীবনযাত্রার উপযোগী লেখা, পড়া হিসাব রাখা ইত্যাদি, যোগ্যতা অর্জন করত। প্রত্যেক পরিবারেই নিজস্ব ধর্মমত বা আরাধ্য দেবদেবী থাকত। শিশু জন্মের মুহূর্ত হতেই সেই ধর্মীয় পরিবেশে মানুষ হত এবং ফলে যখন বড় হত তখন সে পরিবারের অন্যান্য লোকের মতই একপ্রকার বিনা প্রতিবাদে সেই ধর্মমত গ্রহণ করত। শিশুর নৈতিক শিক্ষাও অনেকটা এইভাবে সম্পন্ন হত। প্রত্যেক পরিবারেই কতকগুলি নীতিগত অনুশাসন প্রচলিত থাকত, যেগুলি পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিই মানতে বাধ্য হত। সেই নৈতিক অনুশাসনগুলি শিশুর উপরও চাপিয়ে দেওয়া হত। সামাজিক রীতিনীতি, আচার ব্যবহার ইত্যাদিও শিক্ষা দেওয়া হত পরিবারের মাধ্যমে। সেকালের সমাজের সংগঠন পরিবারের মতই ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অর্থাৎ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যেমন একটা ঘনিষ্ঠ ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকে, সেইরূপ সমাজেরও বিভিন্ন নাগরিকের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকত। এককথায় সমাজ ছিল পরিবারেরই একটি বৃহৎ সংস্করণ। ফলে সমাজের উপযোগী আচার-ব্যবহার শিশুকে নতুন করে শিখতে হত না। তার সামাজিক শিক্ষা পারিবারিক জীবনযাপনের মাধ্যমেই স্বাভাবিকভাবে সংঘটিত হত।

এমন কি শিশুর বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের দায়িত্বও ছিল পরিবারের। পূর্বে বৃত্তি ছিল বংশ-গত। অন্যান্য বস্তুর মত পিতার বৃত্তিও পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে পেত। পুরোহিতের ছেলে হত পুরোহিত, মুচির ছেলে হত মুচি। তাকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য অন্য কোথাও যেতে হত না। পিতার কাছে শিক্ষানবীশ রূপে থেকেই সে বৃত্তিঘটিত সকল কৌশল আয়ত্ত করত। এককথায় বলা যেতে পারে যে পূর্বে ব্যক্তির শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবার একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবে নিরঙ্কুশ ও বাধাহীন আধিপত্য চালিয়ে যেত।

বস্তুত এক শতাব্দী আগেও কেবল ব্যক্তির শিক্ষার উপর নয়, তার সমাজ-জীবনের সমস্ত দিকগুলির উপর পরিবার অকল্পনীয় প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই দেখা দেয় পরিবারের এই যুগযুগান্তরের বনিয়াদে ভাঙ্গন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-মূলক চিন্তার প্রভাব, নাগরিক জীবনের প্রতি আসক্তি, জীবিকা-অর্জনের ক্রমবর্ধমান দুরূহতা, জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন, স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি কারণে যৌথপরিবারের প্রথা ধীরে ধীরে লোপ পেতে সুরু করল। পরিবারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়ে মানুষের দৃষ্টি পড়ল বাইরের বিরাট জগতের উপর। তার ফলে সব দিক দিয়েই ব্যক্তির জীবনের উপরে পরিবারের প্রভাব ক্রমশ কমে আসতে লাগল।

পরিবার ও বিদ্যালয়

পারিবারিক ব্যবস্থায় এই ভাঙ্গনের জন্য আগে যে সকল শিক্ষার দায়িত্ব পরিবার বহন করত সেগুলি ধীরে ধীরে বিদ্যালয় ও অন্যান্য সামাজিক সংস্থার উপর অর্পিত হতে সুরু হল। শিক্ষণীয় বিষয়গুলিও ক্রমশ আয়তনে এত বিপুল ও প্রকৃতিতে এতই জটিল হয়ে উঠল যে সেগুলি শিক্ষা দেওয়া পরিবারের সীমাবদ্ধ সামর্থ্যে অসম্ভব হয়ে উঠল। ফলে শিশুর শিক্ষার অধিকাংশ দায়িত্বই এসে পড়ল বিদ্যালয়ের উপর। ধর্মগত ও নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও পরিবারের প্রভাব বেশ কমে এল। ধর্ম সম্বন্ধে গোঁড়ামির স্থানে দেখা দিল যুক্তিধর্মী উদার দৃষ্টিভঙ্গী। ফলে পরিবারের অনুসৃত ধর্ম-বিশ্বাস আধুনিক মানুষকে আর প্রভাবান্বিত করতে পারল না। নীতির ক্ষেত্রেও ঐ একই পরিবর্তন দেখা দিল। কোন কিছুরই প্রচলিত পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত মানকে আর ব্যক্তি বিনা বিচারে স্বীকার করতে রাজী হল না। সে নিজের যুক্তি, চিন্তা ও বিচার-পদ্ধতির সাহায্যে

সব কিছুর মান নির্ধারণ করা স্বরু করল। ফলে পরিবারের সনাতন ও অন্ধভাবে অনুসৃত মানের কাঠামোটি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। বৃত্তির শিক্ষার ক্ষেত্রেও পরিবারের আধিপত্য আর রইল না। ব্যক্তির নিজস্ব নির্বাচনের স্বাধীনতা ও স্বযোগ বেড়ে যাওয়াতে অনেক ক্ষেত্রেই পুত্র পিতার বৃত্তি আর গ্রহণ করল না। তাছাড়া বৃত্তির প্রস্তুতিও দিন দিন এতই জটিল হয়ে উঠল যে তার জন্য প্রয়োজন হল বিশেষজ্ঞ শিক্ষাদাতার। এই সকল কারণে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যালয় ধীরে ধীরে পরিবারের স্থান অধিকার করতে স্বরু করল এবং আধুনিক কালে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদানের সমস্ত ভারই পরিবার উঠিয়ে দিয়েছে বিদ্যালয়ের হাতে।

শিশু-মনোবিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির ফলে শিশুর শিক্ষার দায়িত্ব বিদ্যালয়ের হাতে তুলে দেবার স্বপক্ষে আর একটা মূল্যবান যুক্তি পাওয়া যায়। দেখা গেছে যে সার্থক শিক্ষা দিতে হলে শিশুর জটিল প্রতিক্রিয়াগুলির সঙ্গে পরিচিত থাকা, মানসিক প্রক্ষোভ ও প্রবৃত্তির কার্যপ্রণালীর পর্যবেক্ষণ করা এবং তার মনের বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত দরকার। ফ্রয়েডের মতে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের ব্যক্তিসত্তার কাঠামোটি তার অতি শৈশবেই পুরোপুরি নির্ধারিত হয়ে যায় এবং যদি এই সময়ে তার অভিজ্ঞতাগুলি স্বাস্থ্যকর ও স্বসংহত না হয় তবে তার ব্যক্তিসত্তার গঠনেই এমন বিরাট গলদ থেকে যায় যা তার সারা জীবনকে অবাঞ্ছিতভাবে প্রভাবিত করে থাকে। এই সকল শিশুকে সার্থক ও উপযোগী শিক্ষা দিতে হলে যে পরিমাণ অর্জিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের প্রয়োজন তা অধিকাংশ সাধারণ পিতামাতার নেই এবং থাকা সম্ভবও নয়। ভাল পিতামাতা হলেই যে ভাল শিক্ষক হবেন তার কোন অর্থ নেই। ফলে অধিকাংশক্ষেত্রেই পিতামাতারা ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করেন এবং শিশুর শিক্ষা ও ব্যক্তিসত্তার বিকাশের স্বাভাবিক পথে বাধার স্বষ্টি করেন। অবশ্য শিশুর প্রতি স্নেহ-ভালবাসা স্বশিক্ষাদানের অপরিহার্য উপাদান এবং এইজন্যই প্রকৃত স্বশিক্ষক যেমন একদিকে পিতামাতার মত স্নেহদানে সমর্থ হবেন তেমনই অপরদিকে বিশেষজ্ঞের দক্ষতা ও জ্ঞানের অধিকারী হবেন।

কিন্তু তা বলে শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবারের কোন প্রকার প্রভাব নেই এটা ভাবাও ভুল। পরোক্ষ শিক্ষার মাধ্যমদের মধ্যে পরিবারেরে স্থান সর্বাগ্রে। পরিবার হল সেই সামাজিক সংস্থা যেখানে শিশুর মৌলিক অনুভূতিগুলি

প্রথম পরিতৃপ্তি লাভ করে। এইখানেই তার প্রাথমিক এবং অতি-প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলি তৃপ্ত হতে পারে। ফলে শিশুর মনের উপর পরিবারের প্রত্যেকটি প্রভাব গভীর ও চিরস্থায়ী ছাপ রেখে যায়। পরিবারে সে যা শেখে তা তার সারা জীবনের সঙ্গে দুরপনেয়ভাবে মিশে যায় এবং তার ভবিষ্যৎ ব্যক্তিসত্তার প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করে।

বিদ্যালয়ের কার্যাবলী

মানব শিক্ষার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন মেটাবার জন্যই বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয় এবং শিক্ষার সুদীর্ঘ ইতিহাসে বিদ্যালয় তার সৃষ্টির সার্থকতা প্রচুরভাবে প্রমাণ করে এসেছে। আজকের দিনে বিদ্যালয়ের গুরুত্বও যেমন বেড়ে গেছে তেমনই অকল্পনীয়ভাবে বেড়েছে তার বহুবিধ দায়িত্ব। আধুনিক বিদ্যালয়ের বহুবিধ কাজের মধ্যে প্রধান কয়েকটির উল্লেখ করা হল।

প্রথমত—ব্যক্তির নিজস্ব চাহিদা ও শক্তি অনুযায়ী শিক্ষা দিয়ে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলিকে পূর্ণভাবে বিকশিত করা।

দ্বিতীয়ত—তার সমাজজীবনের বহুবিধ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাকে পরিচিত করে তাকে সমাজের উপযোগী করে তোলা।

তৃতীয়ত—তার সামর্থ্য ও রুচি অনুযায়ী তার ভবিষ্যৎ বৃত্তির প্রকৃতি নির্ণয় করা ও সেই বৃত্তির সঙ্গে তার প্রাথমিক পরিচিতি ঘটান।

চতুর্থত—শিশুর বিকাশোন্মুখ ভাব-বৈচিত্র্যকে কল্যাণকর ও উন্নত অভিজ্ঞতার সাহায্যে পুষ্ট করা ও উদার জীবনদর্শন গড়ে তুলতে সাহায্য করা।

পঞ্চমত—নানাবিধ বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার দৈহিক, মানসিক প্রক্ষোভমূলক বিকাশ প্রচেষ্টাগুলিকে স্বাস্থ্যকর পথে নিয়ে যাওয়া ও তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা।

ষষ্ঠত—আধুনিক গণতান্ত্রিক আদর্শে তাকে উদ্বুদ্ধ করা, বহুমুখী রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালন করতে এবং গণতন্ত্রের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারার মত যোগ্যতা অর্জনে তাকে সাহায্য করা। যে কোন সভ্যসমাজেরই নাগরিকরূপে বাস করতে হলে প্রত্যেককেই শিক্ষার একটা নিম্নতম মান অর্জন করতে হয়। পূর্বে এই নিম্নতম মান খুবই সহজ ছিল এবং সামান্য লিখতে পড়তে পারা এবং কিছুটা অঙ্ক করতে জানার মধ্যেই এই মান সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন এই নিম্নতম মানও

যথেষ্ট উন্নত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দায়িত্বশীল নাগরিকরূপে বাস করতে হলে যথেষ্ট উন্নত জ্ঞানের দরকার। আধুনিক বিদ্যালয়ের একটা বড় কাজ হল প্রত্যেক নাগরিককে শিক্ষার এই মান অর্জনে সাহায্য করা।

ধর্মায়তন :

শিক্ষার পরোক্ষ মাধ্যম হিসাবে পরিবারের পরেই আসে মন্দির, মসজিদ, গির্জা প্রভৃতি ধর্মায়তনগুলি। বহু প্রাচীনকাল হতেই সব দেশেই ধর্মীয় অনুশাসন ব্যক্তির জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। অতীতে ধর্মকে মানব-অস্তিত্বের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বলে মনে করা হত এবং ধর্ম-ঘটিত অনুষ্ঠান, দেবদেবীর তুষ্টিসাধনের কৌশল, ঈশ্বরোপলব্ধির পন্থা, পারলৌকিক কর্তব্য ইত্যাদি ব্যক্তিকে শিক্ষা দেবার জন্য নানারূপ ধর্মায়তন সব দেশেই গড়ে উঠেছে। ধর্মীয় শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে দেখা দিল নৈতিক শিক্ষা। ব্যক্তির নৈতিক ধারণা ও তার মাপকাঠি নিয়ন্ত্রিত করারও ভার নিল ধর্মায়তনগুলি এবং ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত এ সকলই ধর্মের সমর্থন বা অসমর্থনের উপর নির্ভর করতে সুরু করল। এক কথায় বলা যেতে পারে ব্যক্তির নৈতিক ও ধর্মীয় এই উভয় জীবনেরই নিয়ন্ত্রক ছিল ধর্ম। অনেক ক্ষেত্রে ধর্মায়তনেও সাধারণ শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতে শিক্ষায়তন ও দেবায়তন একপ্রকার অভিন্নই ছিল এবং ধর্মগুরুই ছিলেন শিক্ষক। বৌদ্ধ বিহারগুলিতেও ব্যক্তির সকল প্রকার শিক্ষা দেবার দায়িত্ব বহন করা হত। ইউরোপে মধ্যযুগে সাধারণ শিক্ষার সম্পূর্ণ ভার ছিল খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিহারগুলির উপর। এমন কি বর্তমানেও কথকতা, ধর্মগ্রন্থপাঠ, পূজা-পার্বণ ইত্যাদির মাধ্যমে ধর্মশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও সাধারণ' জ্ঞানের প্রচুর শিক্ষা জনসাধারণ লাভ করে থাকে।

কিন্তু আধুনিক যুগে মানবমনের উপর ধর্মের আধিপত্য আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে। যুক্তিমূলক চিন্তাধারার প্রাধান্য এবং জড়বাদী আদর্শের ব্যাপক প্রসারের ফলে ধর্মমূলক অনুশাসনের প্রতি নির্বিচার নিষ্ঠা আর নেই বললেই চলে। পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গেছে যে ধর্মায়তনে যোগদান-কারীর সংখ্যা প্রতি বৎসরেই বেশ কিছু করে কমে আসছে।

ধর্মের প্রাধান্য হ্রাসের ফলে দেবায়তনগুলির শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মূল্য এখন অত্যন্ত অল্প। নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। নীতির মাপকাঠি এখন

ধর্মের সমর্থন অসমর্থনের উপর বিশেষ নির্ভর করে না। ধর্মের স্থান নিয়েছে এখন সামাজিক আদর্শ এবং গণ-জীবনের ভালমন্দের বিচারের দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে থাকে নৈতিক মাপকাঠি।

কিন্তু তা সত্ত্বেও মানবসমাজে ধর্মের প্রভাব একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি এবং কখনও যাবে না। এখনও ভারতের লক্ষ লক্ষ নর নারীর জীবনে ধর্মের প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও স্থায়ী। সারা পৃথিবীময় এখনও বহু নিষ্ঠাবান খৃষ্টান এবং মুসলমান পাওয়া যায় যাঁরা এখনও গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে বাইবেল বা কোরাণের অনুশাসন মেনে চলেন। সুতরাং শিক্ষার পরোক্ষ মাধ্যমরূপে ধর্মের প্রভাব কমে গেলেও একেবারে লোপ পায়নি।

তবে মানব সমাজের অন্যান্য সংগঠনের মত ধর্মও দ্রুত পরিবর্তনের পথে। বর্তমানে ধর্মকে বিবর্তন-প্রক্রিয়ার মধ্যপথে বলা চলতে পারে। পুরাতন ধর্মের পরিকল্পনা আধুনিক সমাজের পক্ষে উপযোগী নয় বলেই ধীরে ধীরে মানব মনের উপর তার মুষ্টি শিথিল হয়ে আসছে। বর্তমান মানবের চাহিদা অনুযায়ী নতুন ধর্ম জন্ম নেবে অদূর ভবিষ্যতে। পুরাতন ধর্মের সবচেয়ে বড় ত্রুটি ছিল যে তাতে পারলৌকিক ভিত্তির উপরে ইহলৌকিক প্রাসাদ গড়ে তোলা হয়েছিল, ফলে যখন ইহলৌকিক জীবন মানুষের কাছে অর্থময় ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল তখন ধর্মের তৈরী সেই প্রাসাদ অবাস্তব ও অলীক বলে প্রমাণিত হল। আগামী দিনের নতুন ধর্ম পারলৌকিক ও ইহলৌকিক এই দুই জীবনের মধ্যে সুষম সংহতি আনবে এবং তখন ধর্ম আবার শিক্ষার একটি শক্তিশালী মাধ্যমরূপে পরিগণিত হবে।

সামাজিক সংগঠন

পরোক্ষ শিক্ষার মাধ্যমরূপে এর পর বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের উল্লেখ করতে হয়। সংগঠন বলতে বোঝায় সেই সকল প্রতিষ্ঠান বা সংঘ যেখানে একদল মানুষ তাদের সকলের কোন একটি সাধারণ চাহিদা মিটানোর জন্য মিলিত হয়। স্থায়ীত্ব, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে সংগঠন নানা শ্রেণীর হতে পারে। প্রথম আসে খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ, ভ্রমণ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে তৈরী অস্থায়ী সংগঠনগুলি। এগুলির আয়ুষ্কাল অতি স্বল্প এবং প্রয়োজন মিটে গেলে সংগঠনও ভেঙ্গে যায়। এর পর আসে সেই সকল প্রতিষ্ঠানগুলি যেগুলি অপেক্ষাকৃত সুসংগঠিত ও স্থায়ী। এগুলির উদ্দেশ্য নানা রকম হতে পারে। খেলাধূলা, সাহিত্য, শিল্পকলা, রাজনীতি,

সমাজনীতি প্রভৃতি মানবজীবনের যে কোন একটি বিশেষ দিকের চাহিদা মিটানোর জন্য এ ধরনের সংঘ গড়ে উঠতে পারে। তৃতীয় শ্রেণীর সংগঠন বলতে যুব-আন্দোলনের উল্লেখ করতে হয়। আধুনিক রাষ্ট্রগুলিতে যুব আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। বর্তমান শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে সমাজ-নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিরূপে যুব-আন্দোলনের সম্ভাবনা অতি প্রচুর। উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ও সুচিন্তিত পরিচালনার দ্বারা যুব-আন্দোলন যুব-সমাজ-গঠনের একটি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পারে। আজকাল সমস্ত প্রগতিশীল রাষ্ট্রেই যুব-আন্দোলনকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যুব-অধিবেশন, যুব-সম্মেলন, যুবাবাস স্থাপন, শিক্ষামূলক ভ্রমণ প্রভৃতির আয়োজনের মাধ্যমে যুব-আন্দোলনকে সুসংহত ও সুগঠিত করে তোলার চেষ্টা সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে।

পরোক্ষ মাধ্যমরূপে সামাজিক সংগঠনগুলির প্রভাব যথেষ্ট। বিভিন্ন মানুষ এই সকল সংগঠনগুলির মাধ্যমে মেলামেশার সুযোগ পায় এবং তার ফলে তাদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান সহজেই ঘটতে পারে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রতিক্রিয়াকেই আমরা শিক্ষা বলে বর্ণনা করেছি। অতএব এই সকল সংগঠনের মাধ্যমে যে প্রচুর ও বৈচিত্র্যময় শিক্ষা সংঘটিত হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষ করে যেগুলি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান সেগুলির শিক্ষামূলক প্রভাব ব্যক্তির আচরণকে স্থায়ীভাবে প্রভাবান্বিত করে থাকে।

রাষ্ট্র

রাষ্ট্রকেও শিক্ষার একই পরোক্ষ মাধ্যমরূপে গণনা করা যায়। অতীতে রাষ্ট্রের গুরুত্ব তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না এবং মানবজীবনে তার প্রভাবও ছিল নগণ্য। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র একটি অতি ক্ষমতাশালী সামাজিক সংগঠন এবং যতই দিন যাচ্ছে ততই রাষ্ট্র অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী হচ্ছে। রাষ্ট্র তার শাসনকার্য নির্বাহের জন্য তার নাগরিকদের উপর কতকগুলি বিধিনিষেধ আরোপ করে থাকে এবং এই বিধিনিষেধগুলি ধর্ম-শিক্ষা, ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন, রাজনীতি প্রভৃতি সকল দিকগুলিরই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। নাগরিকগণ এই বিধিনিষেধগুলিরই মাধ্যমে নানারূপ শিক্ষা লাভ করে থাকে। আধুনিক রাষ্ট্রকে বহু ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হয় এবং

সংবাদপত্র, রেডিও, বুলেটিন, বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদির মারফৎ নাগরিকদের কাছে রাষ্ট্র তার অনুশাসন প্রেরণ করে থাকে।

সমাজ

রাষ্ট্রের মত সমাজও শিক্ষার আর একটি পরোক্ষ মাধ্যম। ব্যক্তির শিক্ষার জন্য সমাজ নানারূপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মাধ্যমের জন্ম দিয়ে থাকে। বিদ্যালয়, পরিবার, ছোট বড় সংঘ, রাষ্ট্র এ সকলই সমাজের তৈরী। কিন্তু শিক্ষার মাধ্যম তৈরী করা ছাড়াও সমাজ নিজেই ব্যক্তির শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমরূপে কাজ করে থাকে। সমাজ-জীবনে বাস করে এবং সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের একজন হয়ে ব্যক্তি পরোক্ষভাবে অনেক কিছুই শেখে। বিশেষ করে ব্যক্তির সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও নৈতিক দিকগুলি সমাজের প্রভাবের দ্বারা স্থায়ীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এমন একদিন ছিল যেদিন অত্যাচারী স্বৈরাচারের মত সমাজ ব্যক্তির জীবন খেয়ালখুসীমত পরিচালিত করত। কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক চিন্তার প্রাধান্য এবং সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী এ দুইয়ে মিলে আধুনিক সমাজের সেই অবাঞ্ছিত একাধিপত্য খর্ব করে দিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের উপর সমাজের প্রভাব যে এখনও প্রচুর তা অনস্বীকার্য।

সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় মাধ্যম

শিক্ষার পরোক্ষ মাধ্যম হিসাবে এখন যেগুলির উল্লেখ করা হবে সেগুলিকে শিক্ষার নিষ্ক্রিয় (passive) মাধ্যম বলা হয়। নিষ্ক্রিয় মাধ্যম হল সেই সকল মাধ্যম যেগুলির প্রভাব একমুখী অর্থাৎ যেগুলি কেবলমাত্র অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, কিন্তু নিজে প্রভাবিত হয় না। যেমন সংবাদপত্র, রেডিও ইত্যাদি। এগুলি পাঠক বা শ্রোতার উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, কিন্তু নিজেরা তাদের কোন প্রভাবের পাত্র হয়ে দাঁড়ায় না। অপর পক্ষে বিদ্যালয়, পরিবার, সংগঠন প্রভৃতি হল সক্রিয় (active) মাধ্যম। এরা যেমন ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে ও তার মধ্যে পরিবর্তন আনে তেমনই নিজেরাও ব্যক্তির প্রভাবে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হয়ে যায়।

সংবাদপত্র, বেতার, চলচ্চিত্র টেলিভিসন প্রভৃতি :

পরোক্ষ এবং নিষ্ক্রিয় শিক্ষার মাধ্যম হলেও এগুলির গুরুত্ব দিন দিন বেড়ে চলেছে এবং সামাজিক, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক, ধর্মসম্বন্ধীয়, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি সকল প্রকার তথ্য ও চিন্তা পরিবেশন করাই এই মাধ্যমগুলির কাজ। পদ্ধতির অভিনবত্ব এবং পরিবেশনশৈলীর জন্য এগুলি মানুষের মনের মধ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। রাজনীতির ক্ষেত্রে এগুলি একপ্রকার শিক্ষার প্রত্যক্ষ মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হয় এবং ব্যক্তির সমাজ-জীবনের নানা বিভাগ সম্বন্ধে নিজস্ব মতামত সৃষ্টি করার পিছনে এরাই প্রধানতম শক্তিরূপে কাজ করে। আবার এই মাধ্যমগুলিকে যদি কোন অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় তবে তা যে সমাজের অতি গুরুতর ক্ষতি করতে পারে সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। আজকাল প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রেই সংবাদপত্রকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের বাহকরূপে ব্যবহৃত করা হয়ে থাকে এবং তার ফলে সুষ্ঠু সমাজ-জীবন গঠনে সংবাদপত্রের কাজ প্রচুর পরিমাণে ব্যাহত হয়েছে।

এদের মধ্যে বোধ করি চলচ্চিত্রেরই প্রভাবিত করার ক্ষমতা সর্বাধিক। চলচ্চিত্রের আবেদন গভীর ও স্থায়ী হয়। সুনিয়ন্ত্রিত হলে চলচ্চিত্র যে অতি কার্যকরী শিক্ষার মাধ্যমরূপে কাজ করতে পারে পাশ্চাত্য দেশে তার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আমাদের দেশে অনগ্রসর স্থানগুলিতে চলচ্চিত্র ও বেতারের মাধ্যমে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বেতারেরও শিক্ষামূলক সম্ভাবনা প্রচুর। আমেরিকার স্কুল-কলেজে প্রত্যক্ষ শিক্ষার অঙ্গরূপে বেতার ও টেলিভিসন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আগামী যুগের শিক্ষাব্যবস্থায় বেতার, চলচ্চিত্র ও টেলিভিসন যে অতি প্রয়োজনীয় স্থান অধিকার করে থাকবে এ ভবিষ্যৎবাণী বিনা দ্বিধায় করা যায়।

প্রশ্নাবলী

Q. 1. What are the different agencies of education? How do they influence the growth of a child's personality?

Ans. (পৃঃ ৪৫—পৃঃ ৫৫)

Q. 2. Distinguish between the formal and informal agencies of education. Discuss the role of school as an agency of education.

Ans. (পৃঃ ২৫—পৃঃ ৫১)

Q. 3. Evaluate the significance of press, radio, cinema and other passive agencies in the modern education of the child.

Ans. (পৃ: ৫৩—পৃ: ৫৫)

Q. 4. Discuss the importance of youth movement as an educational medium.

Ans. (পৃ: ৫২—পৃ: ৫৩)

Q. 5. Compare the roles of family and school as agencies of education and discuss why the importance of school as an educational medium is increasing daily.

Ans. (পৃ: ৪৮—পৃ: ৫০)

Q. 6. Discuss the importance of home as one of the most effective social agencies of education. How far can it be regarded as the first training ground of character?

(B. T. 1961).

Ans. (পৃ: ৪৮—পৃ: ৫০)

Q. 7. Write an essay on :—Home and School.

Ans. (পৃ: ৪৮—পৃ: ৫১) (B. A. 1961).

সাত

পাঠক্রম—শিক্ষার বিষয়বস্তু

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়ে যাবার পর প্রশ্ন ওঠে শিক্ষার বিষয়বস্তু কি হবে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ভর করছে শিক্ষার লক্ষ্যের উপর। 'কি শেখানো উচিত' পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল 'কেন শেখানো উচিত'এর উপর। আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি যে শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে অসংখ্য মতবাদ প্রচলিত হয়ে এসেছে। অতএব শিক্ষার বিষয়বস্তু যে শিক্ষার লক্ষ্যের বিভিন্নতা অনুযায়ী বিভিন্ন হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এইজন্যই আমরা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে শিক্ষার বিষয়বস্তুর বিভিন্ন রূপ দেখতে পাই।

পাঠক্রম নির্ণয়ে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে যে সকল দার্শনিক মতবাদ প্রভাব বিস্তার করে এসেছে তাদের বিচারে শিক্ষার বিষয়বস্তু বা পাঠক্রমের নানা বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা—

ভাববাদী

ভাববাদীদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য অপার্থিব পরমসত্তার উপলব্ধি এবং তার একমাত্র উপায় হল আমাদের পূর্বপুরুষেরা যুগযুগান্তর ধরে এবং বহু ও নিষ্ঠার সঙ্গে যে সকল সত্য ও গূঢ়তত্ত্বের সন্ধান দিয়ে গেছেন সেগুলিকে আয়ত্ত করা। অর্থাৎ পাঠক্রমে থাকবে আমাদের পূর্বগামীদের **সঞ্চিত** ভাব ও চিন্তারাশির একটি সুসংহত সামগ্রিক রূপ। অতএব এঁদের বিচারে আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সংস্কৃতি, জ্ঞান ও চিন্তার ভাণ্ডার থেকে প্রয়োজনীয় অংশগুলি নিয়ে শিশুর পাঠক্রম গড়ে তুলতে হবে।

জড়বাদী

জড়বাদীদের মতে বাস্তব পরিবেশ ও বর্তমান হবে শিশুর পাঠক্রমের চরম নির্ধারক। পূর্বপুরুষদের অর্জিত জ্ঞান বা কৃষ্টির দাম তাঁরাও অস্বীকার করেন না তবে তার কোন আধ্যাত্মিক গুরুত্ব দিতে তাঁরা রাজী নন। বিদ্যা, জ্ঞান ইত্যাদি তাঁদের কাছে পার্থিব জীবনের সুখ ও শান্তি বিধানের উপকরণ স্বরূপ। যে জ্ঞান ব্যক্তি এবং সমাজের মঙ্গল-সাধক সে জ্ঞানই তাঁরা পাঠক্রমে অন্তর্গত করার পক্ষপাতী, আর যে জ্ঞানের তেমন কোন সার্থকতা নেই সে জ্ঞানের যতই আধ্যাত্মিক মূল্য থাক না কেন, পাঠক্রমে অন্তর্গত হবার যোগ্যতা তার নেই। পার্থিব যোগ্যতা, ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ, ঐহিক জীবনের উৎকর্ষসাধন, বৈজ্ঞানিক উন্নতি ইত্যাদি যে সকল তথ্য ও জ্ঞান থেকে পাওয়া যায় সেগুলিই জড়বাদীদের মতে পাঠসূচীতে স্থান পাবার যোগ্য।

প্রকৃতিবাদী

প্রকৃতিবাদীদের মতে প্রকৃতি হবে একাধারে শিশুর শিক্ষক, শিক্ষালয় ও শিক্ষার বিষয়বস্তু। যা কিছু কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক তা শিশুকে শেখান হবে না। প্রসিদ্ধ প্রকৃতিবাদী রুশো ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত কোনরূপ পুঁথিগত বিদ্যা শিশুকে শেখানোর বিরোধিতা করে গেছেন। তাঁর মতে প্রকৃতিই হবে একমাত্র পুস্তক যা থেকে শিশু তার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয় করবে।

মানবতাবাদী

পূর্বেই বলেছি মধ্যযুগের শিক্ষার প্রকৃতি ও বিষয়বস্তুর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া রূপেই মানবতাবাদের প্রথম জন্ম। সেই হতেই এই ভাবধারা পৃথিবীর প্রায় সবদেশেরই পাঠক্রমের উপর প্রচুর প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। এই মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষার বিষয়বস্তু মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, অনুভূতি উপলব্ধিকে কেন্দ্র করেই তৈরী হবে। কৃত্রিম বা অবাস্তব কোন তত্ত্ব বা অর্থহীন বিতর্ক প্রভৃতির দ্বারা পাঠক্রমকে দুর্বহ করে তোলা চলবে না। এই মতবাদের আন্দোলনেই ইউরোপে মধ্যযুগের শেষে শিক্ষার নব-জাগরণ দেখা দেয়। তখনকার পাঠক্রমকে

কৃত্রিমতার হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য পাঠক্রমের মধ্যে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্য অন্তর্ভুক্ত করাটা মানবতাবাদের একটা উল্লেখযোগ্য কাজ।

বিংশ শতাব্দীতেও পাঠক্রমের উপর মানবতাবাদের প্রভাব উপেক্ষার নয়। কারিগরী শিক্ষার বহুমুখী ও অভাবনীয় উন্নতির ফলে বিংশশতাব্দীর শিক্ষা দিনের পর দিন বিশেষধর্মী হয়ে উঠছে। ফলে ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টিমূলক শিক্ষাগুলি শোচনীয়ভাবে অবহেলিত হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার সুষম বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। সেইজন্য আধুনিক মানবতাবাদের আন্দোলনের মূল বক্তব্য হচ্ছে সাধারণ ও কারিগরী এই দু-শ্রেণীর শিক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা এবং যাতে সুসংহত মানব-সত্তা গড়ে ওঠে তা দেখা।

প্রয়োগবাদী

প্রয়োগবাদীরা শিক্ষাকে সর্বজীবনব্যাপী ব্যক্তির অভিজ্ঞতা-বৈচিত্র্যের নামান্তর বলে বর্ণনা করেন। অতএব তাঁদের মতে পৃথিবীর সমস্ত সম্ভাব্য বস্তুই শিক্ষার বিষয়বস্তু। কোন নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ পাঠক্রম নির্ধারণ করা একান্তই অসম্ভব। সতত পরিবর্তনশীল পরিবেশের মাধ্যমে শিশু যে বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা লাভ করে, সেই অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু একমাত্র সেই বিরাট পরিবেশ ছাড়া আর কি হতে পারে? অতএব বইপড়া বা শিক্ষকের কাছ থেকে শোনা জ্ঞানের মধ্যে পাঠক্রম কখনই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। প্রয়োগবাদীরা সেইজন্য সদাপরিবর্তনশীল নিত্যনূতন শিশুর সক্রিয়তাকেই একমাত্র পাঠক্রম বলে নির্ধারিত করে থাকেন। বিখ্যাত প্রয়োগবাদী জন ডিউই ল্যাবরেটরী স্কুল নামে তাঁর প্রসিদ্ধ পরীক্ষণমূলক বিদ্যালয়ে কোনরূপ নির্দিষ্ট পাঠক্রম অনুসরণ করেন নি। সেখানে নানারূপ সক্রিয়তার মধ্যে দিয়ে শিশু যাতে সকল প্রকার জ্ঞান অর্জন করতে পারে তার বিস্তারিত আয়োজনই ছিল শিক্ষাব্যবস্থার মূল পরিকল্পনা।

অবশ্য আধুনিক প্রয়োগবাদীগণ জন ডিউইর মত একেবারে পাঠক্রমকে তুলে দেবার নির্দেশ দেন না। তাঁদের মূল বক্তব্য হল পাঠক্রম কখনই অপরিবর্তিত ও সুনির্দিষ্ট থাকতে পারে না। বিভিন্ন শিশুর রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী পাঠক্রম পরিবর্তনশীল ও বিভিন্ন হবে।

গতানুগতিক পাঠক্রমের ত্রুটি

পূর্বে শিক্ষার স্বরূপ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে যেমন ধারণা ছিল সঙ্কীর্ণ ও অসম্পূর্ণ তেমনই শিক্ষার বিষয়-বস্তুর নির্ধারণও ছিল অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। পাঠ্যবস্তুর এই অনুপযোগিতার জন্য শিক্ষার কার্যকারিতা বিশেষভাব ব্যাহত হত এবং শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবনে সে শিক্ষা কোন দিক দিয়েই সহায়ক হত না। পাঠক্রমের এই অসম্পূর্ণতার অনেকগুলি কারণ ছিল।

মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্ব

প্রথমত, এর জন্য দায়ী ছিল শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ ধারণা, ফলে পাঠ্যবস্তুর নির্বাচনও স্বভাবতই সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ত। শিক্ষাকে তার ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করাটা আধুনিক প্রগতিশীল চিন্তাধারার ফল। দ্বিতীয়ত, কতকগুলি ভুল তথাকথিত মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দ্বারা অতীতে পাঠক্রম নিয়ন্ত্রিত হত। তার মধ্যে প্রথমেই যে তত্ত্বটির উল্লেখ করা উচিত তার নাম হল মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্ব (Theory of Formal Discipline)। এই তত্ত্ব অনুযায়ী এমন কতকগুলি পাঠ্য-বিষয় আছে যেগুলির অনুশীলন আমাদের মনের বিশেষ বিশেষ শক্তিগুলিকে অধিকতর কর্মক্ষম করে তোলে। যেমন গণিতের চর্চা আমাদের বিশ্লেষণ শক্তিকে বাড়ায়, তর্কবিদ্যা বিচারক্ষমতাকে শাণিত করে তোলে, সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার চর্চা আমাদের মানসিক ধী-শক্তিকে বলশালী করে তোলে, সাহিত্য-কাব্যের চর্চা আমাদের মনের কোমল বৃত্তিগুলিকে পুষ্ট করে ইত্যাদি। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় এই ধারণাগুলি একেবারে ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। এমন কি প্রাচীন শক্তিবাদ (Faculty Psychology), যার উপরেই ভিত্তি করে এই মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্বের জন্ম, তাও আধুনিক মনোবিজ্ঞানে পরিত্যক্ত হয়েছে। এই শক্তিবাদ অনুযায়ী আমাদের মনে কতকগুলি শক্তি বা বৃত্তি আছে, যেমন স্মৃতি, মনোযোগ, কল্পনা ইত্যাদি। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানে এগুলিকে মনের কোন সুনির্দিষ্ট শক্তি বলে মনে করা হয় না। এই তত্ত্বের খাতিরে পাঠক্রমের মধ্যে এমন অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হত যেগুলির এই কল্পিত মানসিক শৃঙ্খলা দান ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। ইউরোপের স্কুলসমূহে বহু দিন গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষাগুলি অবশ্য পাঠ্য বলে

বিবেচিত হয়ে এসেছে। তার একমাত্র কারণ হল এ-গুলির মানসিক উৎকর্ষ সাধনের ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা হত। তৃতীয়ত, পাঠক্রমের স্বরূপ সম্বন্ধেই আগেকার ধারণা ছিল অসম্পূর্ণ। পাঠক্রম বলতে মনে করা হত কেবল কতকগুলি পঠনীয় বস্তু বা তথ্য যার সাহায্যে ছাত্র ঈপ্সিত জ্ঞান লাভ করবে। তার ফলে গতানুগতিক পাঠক্রম কতকগুলি বিশেষ বিশেষ তথ্য বা জ্ঞানের একটি সুনির্দিষ্ট তালিকা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। শিক্ষার্থীর রুচি, সামর্থ্য বা সত্যকারের চাহিদার সঙ্গে যেমন তার কোন যোগসূত্র ছিল না তেমনই শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গেও তার কোন সঙ্গতি ছিল না।

গতানুগতিক পাঠক্রমকে পরীক্ষা করলে তার যে মারাত্মক ত্রুটিগুলি আমাদের চোখে পড়ে তার কয়েকটি নীচে দেওয়া হল।

১। গতানুগতিক পাঠক্রম সম্পূর্ণ ভাষামূলক (verbal) এবং পুরোপুরি পুঁথিগত বিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। বই পড়া, শিক্ষকের বক্তৃতা শোনা, লেখা ইত্যাদির মধ্যেই পাঠক্রমের সমস্ত কাজ সীমাবদ্ধ। কিন্তু এইভাবে অর্জিত বিদ্যা শিশুকে বাস্তব জ্ঞান দিতে পারে না।

২। এতে সক্রিয়তার কোন স্থান নেই। শিক্ষা শিশুর অভিজ্ঞতার সমষ্টি এবং অভিজ্ঞতা কেবল বাচনিক প্রচেষ্টাতেই সীমাবদ্ধ নয়। সক্রিয়তার মাধ্যম ছাড়া কার্যকরী জ্ঞান আসে না। কেবল বই পড়ে বা শিক্ষকের বক্তৃতা শুনে যে জ্ঞান সে জ্ঞান নিষ্ক্রিয় ও বাস্তব ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য। তা ছাড়া কেবলমাত্র মনের উৎকর্ষসাধনই শিক্ষার লক্ষ্য নয়। শিশুর সত্তার পূর্ণবিকাশের জন্য দরকার সমভাবে দেহের উন্নতি। কিন্তু গতানুগতিক পাঠক্রমে দৈহিক উৎকর্ষসাধনকে একেবারে বাদ দেওয়া হয়েছে।

৩। এই পাঠক্রম রচনায় শিশুর চাহিদাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে। পাঠক্রমটি পিতামাতা, শিক্ষক, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতির চাহিদা মিটানোর উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট। বিভিন্ন শিশুর চাহিদা বিভিন্ন, কিন্তু গতানুগতিক পাঠক্রমে শিশুর চাহিদার বিভিন্নতার কোন স্থান নেই।

৪। এই পাঠক্রমে শিশুর আগ্রহ বা সামর্থ্যের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। শিক্ষার্থীর উপর এমন অনেক বিষয়বস্তু চাপিয়ে দেওয়া হয় যা শিক্ষার্থীর পক্ষে রুচিকর নয় বা তাকে আয়ত্ত করার সামর্থ্য তার নেই। সব শিশুর রুচি বা সামর্থ্য সমান নয়। অথচ প্রচলিত ব্যবস্থায় একই পাঠক্রম সকলকে অনুসরণ করতে বাধ্য করা হয়।

৫। গতানুগতিক পাঠক্রম অনাবশ্যক বিষয় ও তথ্যের ভারে ভারাক্রান্ত। এমন অনেক বিষয় তাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে যেগুলি শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতার সহায়ক নয়; অথচ শিক্ষার্থীর মানসিক পুষ্টি ও চিন্তার উন্নতি আনতে পারে এমন প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি পাঠক্রমে স্থান পায় নি।

৬। গতানুগতিক পাঠক্রমে বিষয়-বিভাজন নীতি (compartmentalisation) চরম মাত্রায় অনুসৃত হয়েছে। শিশুর অবিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা-বৈচিত্র্যের সামগ্রিক রূপের নামই শিক্ষা। বাহ্যিক আকার বা প্রকৃতি অনুযায়ী তার শ্রেণীবিভাগ করা যায় না। কিন্তু প্রাচীনকাল হতেই শিক্ষণের সুবিধার জন্য শিক্ষার বিষয়বস্তুকে নানা বিষয়ে (subject) ভাগ করা হয়ে থাকে। যেমন, ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি। কিন্তু এই ভাগগুলি তর্কবিদ্যাসঙ্গত (logical) হলেও মনোবিজ্ঞানসম্মত (psychological) নয়। ফলে শিশু বাস্তবে যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তার সঙ্গে সে বিদ্যালয়ে যা শেখে তার কোন সঙ্গতি খুঁজে পায় না এবং শিক্ষা অসঙ্গত, অর্থহীন ও অবাস্তব হয়ে দাঁড়ায়।

৭। গতানুগতিক পাঠক্রমের লক্ষ্য অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। সাধারণত বিদ্যালয়ে যে পাঠক্রম অনুসরণ করা হয় তার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করার যোগ্যতা-অর্জন। শিশুর পূর্ণ ব্যক্তিসত্তার গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে এই পাঠক্রম রচিত নয়।

৮। এই পাঠক্রম পুরোপুরি তত্ত্বমূলক এবং এতে ব্যবহারিক দিকটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে। তার ফলে একদিক দিয়ে শিশুর অভিজ্ঞতাগুলি যেমন অসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে তেমনই অপরদিকে তার ভবিষ্যৎ বৃত্তি সম্বন্ধে তার কোন পরিচিতি জন্মায় না। এই পাঠক্রমে বৃত্তিমুলক এবং কারিগরী কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত না থাকায় শিশুকে তার ভবিষ্যৎজীবনে বৃত্তি অর্জনে বিশেষ বেগ পেতে হয়।

৯। এই পাঠক্রমটি প্রচলিত পরীক্ষাগ্রহণ পদ্ধতির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত। এটি এমনভাবে পরিকল্পিত যে পরীক্ষার ফলাফলের উপর এর সাফল্য অসাফল্য নির্ভর করে। তার ফলে পরীক্ষায় কৃতকার্যতা লাভই হয়ে দাঁড়িয়েছে এই পাঠক্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য।

১০। সর্বশেষে, গতানুগতিক পাঠক্রমে শিশুকে তার ভবিষ্যৎ সমাজ-জীবনের উপযোগী করে তৈরী করার কোন ব্যবস্থা নেই। সমাজ-জীবনের যে সকল বহুবিধ

কর্মবৈচিত্র্য শিশুকে তার পরিণত জীবনে অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে সেগুলির সঙ্গে শিশুকে পরিচিত করার কোন আয়োজনই পাঠক্রমে নেই।

পাঠক্রম-সংস্কারের আন্দোলন

গতানুগতিক পাঠক্রমের এই বহুবিধ ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার জন্য যে শিক্ষা-ব্যবস্থার কার্য-কারিতা বিশেষভাবে ব্যাহত হচ্ছে এ সত্য আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ উপলব্ধি করেন এবং বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে পাঠক্রমের সংস্কার সাধনের জন্য নানা প্রকার আন্দোলন প্রায় সব দেশেই দেখা দেয়। যে সকল ভাবধারাকে অবলম্বন করে এই পাঠক্রম সংস্কারের আন্দোলন গড়ে ওঠে তার কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

কর্মকেন্দ্রিক বা কর্মভিত্তিক পাঠক্রম

পুঁথিসর্বস্ব এবং ভাষাভিত্তিক পাঠক্রমের প্রতিক্রিয়ারূপে দেখা দেয় পাঠক্রমকে কর্মকেন্দ্রিক (activity-centred) বা কর্মভিত্তিক (activity-based) করার আন্দোলন। এই আন্দোলনের মুখ্য বক্তব্য হল যে শিশুর শিক্ষা নিষ্ক্রিয়ভাবে বই পড়া বা শিক্ষকের বক্তৃতা শোনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, সক্রিয়তা বা কর্ম-সম্পাদনের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হবে। কেন শিশুর শিক্ষা-ব্যবস্থায় কর্ম বা সক্রিয়তা প্রধান স্থান পাবে তার স্বপক্ষে একাধিক যুক্তি দেওয়া হয়ে থাকে। তার কয়েকটি নীচে দেওয়া হল।

প্রথমত, শিশুর মনের উন্নতি যেমন দরকার, তেমনই দরকার তার দেহেরও সুষ্ঠু বিকাশ। কারণ মনের উন্নতি দেহের সুস্থতার উপর একান্ত নির্ভরশীল। অতএব শিশুর শিক্ষাব্যবস্থায় তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের সুযোগও যথেষ্ট থাকা দরকার।

দ্বিতীয়ত, শিশুর মধ্যে অঙ্কুর অবস্থায় নিহিত থাকে তার ভবিষ্যৎ পরিণতি। এই অঙ্কুর-রূপী সম্ভাবনাকে মহীরুহ-রূপী ব্যক্তিসত্তায় পরিণত করার একটা প্রধান এবং অপরিহার্য উপকরণ হচ্ছে সক্রিয়তা। সক্রিয়তাই হচ্ছে আত্ম-বিকাশের একমাত্র পদ্ধতি। খেলা এই ধরনের একটা স্বতঃ-প্রণোদিত সক্রিয়তা যার মধ্যে দিয়ে শিশুর সত্তা আত্মবিকাশের পথ খোঁজে। পাঠক্রমকে কর্মকেন্দ্রিক করার এ

যুক্তি ভাববাদীদের দেওয়া এবং ফ্রয়েবেলের কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির কর্ম-প্রাধান্য এই যুক্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

তৃতীয়ত, শিক্ষার ব্যাপারে শিশু যত অধিকসংখ্যক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করতে পারবে ততই শিশুর শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে। সেইজন্য কেবলমাত্র দেখা ও শোনার মধ্যে শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ না রেখে তার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির ব্যবহার করাতে পারলে শিক্ষার কার্যকারিতা অনেক বেড়ে যাবে। কর্ম-সম্পাদনে শিশুর সমস্ত ইন্দ্রিয়, দেহ মন, বলতে গেলে সমস্ত সত্তাই নিযুক্ত হয়। অতএব কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা ভাষাভিত্তিক শিক্ষার চেয়ে অনেক বেশী ফলপ্রদ। এ যুক্তি হল ইন্দ্রিয়-বাস্তববাদী (Sense-realist) শিক্ষাবিদ্‌দের দেওয়া।

চতুর্থত, আসে প্রয়োগবাদী জন ডিউইর দেওয়া সক্রিয়তার উপর দার্শনিক তত্ত্ব। তাঁর মতে শিক্ষা হল নতুন সত্য বা জ্ঞানের অনুসন্ধান। কিন্তু নতুন সত্য বা জ্ঞান বই পড়ে বা বক্তৃতা শুনে পাওয়া যায় না। তা পাওয়া যায় একমাত্র কোন সমস্যার বাস্তব সমাধানের মধ্যে দিয়ে, অর্থাৎ সক্রিয়তার মাধ্যম ছাড়া কোন সত্যকারের শিক্ষা লাভ হয় না। সমস্ত সার্থক শিক্ষাই সক্রিয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য। বিনা সক্রিয়তায় শিক্ষার বাস্তবজীবনে কোন সার্থকতা নেই।

অন্যান্য বিষয়ে মতভেদ থাকলেও শিক্ষায় সক্রিয়তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রায় সব শিক্ষাবিদই একমত, যার ফলে আজ পাঠক্রমে সক্রিয়তাকে অঙ্গীভূত করার প্রচেষ্টা একপ্রকার সর্বজনীন বললেও চলে। কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম বলতে বোঝায় যে পাঠ্যবিষয়গুলির কেন্দ্রে থাকে একটি বা একাধিক কর্ম এবং সেই কেন্দ্রস্থ কর্মের মাধ্যমেই অন্যান্য বিষয়গুলি শিশু শিখে থাকে। কখনও কখনও কেন্দ্রস্থ কর্ম একটি বিশেষ শিল্পের রূপ নেয় তখন তাকে বলা যায় শিল্পকেন্দ্রিক (craft-centred) পাঠক্রম। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত বুনিয়াদি শিক্ষা (Basic education) পরিকল্পনাটির পাঠক্রম এই ধরনের শিল্পকেন্দ্রিক। সেখানে বয়ন, কৃষি বা অন্য কোন একটি শিল্প পাঠক্রমের কেন্দ্রে থাকে এবং ঐ বিশেষ শিল্পটি নিয়ে কাজ করতে করতে শিশু অন্যান্য বিষয়গুলি শেখে। যেমন বয়নশিল্পে শিশুকে জমি তৈরী, তুলোর বীজ বপন থেকে সুরু করে তুলো কেটে সুতো তৈরী করা, কাপড় বোনা প্রভৃতি সবই করতে হয়। এখন এই কাজগুলি করার সময় শিশু প্রাসঙ্গিক ভাবে ইতিহাস, ভূগোল, ভূতত্ত্ব, সমাজ-ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে। এইভাবে শেখানর নাম হল অনুষঙ্গ (Correlation) পদ্ধতি। এ সম্বন্ধে আলোচনা ৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জন্ ডিউই তাঁর প্রসিদ্ধ ল্যাবরেটরী স্কুলে (Laboratory School) সম্পূর্ণ সক্রিয়তার উপর ভিত্তি করে এক অভিনব পাঠক্রমের প্রবর্তন করেন। তাঁর স্কুলে কোন নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয় ত ছিলই না, কোনরূপ বইও পড়ান হত না। ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক প্রকৃতিগত কর্মপ্রচেষ্টাই ছিল একমাত্র পাঠক্রম। এমন কি লিখন, পঠন, গণিতের জ্ঞান এ সমস্তই সক্রিয়তার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠত। খেলাধূলা, নতুন কিছু তৈরী করা, প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ, আত্ম-অভিব্যক্তি এই সকলের মাধ্যমে শিশুরা সর্বাঙ্গীন শিক্ষা লাভ করত।

আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ জন্ ডিউইর এই চরম দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করলেও, শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে যে তাকে কর্মকেন্দ্রিক করে তুলতে হবে ডিউইর এ তত্ত্ব সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন। ডিউইর শিষ্য ও সমর্থক আর একজন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্ কিল্‌প্যাট্রিক্ (Kilpatrick) ডিউইর শিক্ষাতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তাঁর প্রসিদ্ধ প্রজেক্ট (Project) পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। সামাজিক পরিবেশে উদ্দেশ্যমূলক কোন কর্মকে প্রজেক্ট বলা হয়। শিক্ষার্থী তার শিক্ষণীয় বিষয়টি এইরকম একটি সুনির্দিষ্ট সুপরিকল্পিত কর্ম-সূচীর মধ্যে দিয়ে শিক্ষা করে থাকে। সার্থক শিক্ষাদানে প্রজেক্ট পদ্ধতির কার্যকারিতা নিঃসংশয়ভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং আজকাল সমস্ত প্রগতিশীল বিদ্যালয়েই প্রজেক্ট পাঠক্রমের একটা বড় অঙ্গ রূপে বিবেচিত হয়ে থাকে। পাঠক্রমকে কর্মকেন্দ্রিক করার প্রয়োজনীয়তা আজ সর্বজন-স্বীকৃত। আদর্শ কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম কেমন করে তৈরী করা যায় সে সম্বন্ধে কয়েকটি নির্দেশ নীচে দেওয়া হল।

প্রথম, পাঠক্রমের মধ্যে শিল্পকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শিল্পের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী সক্রিয়তার সুযোগ পায় এবং তার সৃজনপ্রতিভাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারে। তাছাড়া শিল্পের মাধ্যমে তার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির চর্চা হয়, সে নানা কৌশল আয়ত্ত করে এবং তার ব্যবহারিক কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তবে পাঠক্রমকে একটি মাত্র শিল্পে সীমাবদ্ধ না রেখে, তার মধ্যে বিভিন্ন শিল্পের ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে শিক্ষার্থী নিজের রুচি মত শিল্প বেছে নিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, খেলাধূলার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে পাঠক্রমে। অবশ্য উদ্দেশ্যহীন খেলার সার্থকতা বিশেষ নেই। খেলাকে যত সু-পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যমূলক করা যেতে পারে ততই শিক্ষার কাজ ত্বরান্বিত হবে। খেলা শিশুর আত্মপ্রকাশের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। খেলাকে যথাযথ কাজে লাগালে এটি শিক্ষার শক্তিশালী

মাধ্যমে পরিণত হতে পারে। সুকল্পিত খেলার মধ্যে দিয়ে শিশুর সামাজিক চেতনা-বোধকেও যথেষ্ট বিকশিত করা যায়।

তৃতীয়ত, অভিনয়, বিতর্কসভা, নৃত্য-গীত, ভ্রমণ, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক সম্মেলন প্রভৃতি কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমে অপরিহার্য অঙ্গ রূপে স্থান পাবে। এগুলির মধ্যে দিয়ে শিশুর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলি প্রকাশ পাবে, তার আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা পরিতৃপ্ত হবে এবং তার ব্যক্তিসত্তা নিজের উপযোগী বিকাশের পথ খুঁজে পাবে।

চতুর্থত, নির্মাণ এবং সৃজনমূলক প্রচেষ্টাকে পাঠক্রমের একটা বড় অঙ্গ করে তুলতে হবে। এগুলির মধ্যে দিয়ে শিশুর সৃজন-প্রবৃত্তি বিকাশ লাভ করে এবং তার অহংসত্তা (ego) সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। ছোটদের ক্ষেত্রে মাটি বা বালি দিয়ে বাড়ী ঘর তৈরী করা, ছবি আঁকা, কার্ডবোর্ড বা কাঠের জিনিষ তৈরী করা, বড়দের ক্ষেত্রে শিল্পমূলক কিছু সৃষ্টি করা, সাহিত্য সৃষ্টি করা, প্রজেক্ট সম্পন্ন করা ইত্যাদি কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর নির্মাণ এবং সৃজনপ্রবণতাকে অভিব্যক্ত হবার সুযোগ দেওয়া উচিত।

পঞ্চমত, নানাবিধ সামাজিক কর্মপ্রচেষ্টা পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে। এগুলি যেমন একদিক দিয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সহযোগিতা, আত্মত্যাগ, দলগত সংহতি এনে দেবে তেমনই অপর দিক দিয়ে তাকে সামাজিক কার্যাবলীর সঙ্গে পরিচিত করে তুলবে।

ষষ্ঠত, প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য। প্রাকৃতিক সংস্পর্শ শিশুর মধ্যে কল্পনাশক্তি, সৌন্দর্যবোধ এবং মনন-ক্ষমতাকে বাড়ায়,তার ক্রমবিকাশকে সহজ ও সরল করে তোলে এবং তার দৃষ্টিভঙ্গীর উদারতা এনে দেয়। ভ্রমণ, চড়ুই-ভাতি, গ্রাম-পরিদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে প্রকৃতির সঙ্গে এই সংযোগ রাখতে সাহায্য করা যেতে পারে।

সপ্তমত, আসে প্রজেক্ট। কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমে প্রজেক্ট আজকাল বড় স্থান অধিকার করেছে। ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ-বিজ্ঞান, গণিত, প্রকৃতি-বীক্ষণ, রাষ্ট্র-নীতি প্রভৃতি বিষয়গুলি প্রজেক্টের মাধ্যমে শেখা যেমন সহজ তেমনই সুখকর।

সর্বশেষে আসে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়-পরিচালনার কার্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ। আজকাল গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুযায়ী বিদ্যালয় পরিচালনার নানা গুরুত্বপূর্ণ কার্য শিক্ষার্থীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং বিদ্যালয় পরিশাসনের (School

Government) মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা গণতান্ত্রিক কৌশল, আত্মনির্ভরতা, নায়কত্ব ও সুষ্ঠু সমাজজীবনের বৈশিষ্ট্যাদি প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা করে।

চাহিদা-কেন্দ্রিক পাঠক্রম

পাঠক্রমকে শিশুর চাহিদা-কেন্দ্রিক (need-centred) করাটাও পাঠক্রম সংস্কারের পরিকল্পনার একটা বড় অঙ্গ। চাহিদা-কেন্দ্রিক বলতে বোঝায় যে শিক্ষার্থীর চাহিদাকে ঘিরেই পাঠক্রম গড়ে উঠবে, অন্য কারও চাহিদা বা প্রয়োজনকে ঘিরে নয়। গতানুগতিক পাঠক্রম গঠিত হয়ে থাকে পিতা-মাতা, সমাজ শাসক প্রভৃতিদের চাহিদাকে ভিত্তি করে, এবং শিক্ষার্থীর নিজের চাহিদার সঙ্গে তার কোন সঙ্গতি থাকে না। তাছাড়া এতদিন মনে করা হত যে শিশু পরিণত মানুষেরই একটি ছোট সংস্করণ এবং বড়দের যা চাহিদা শিশুদেরও তাই চাহিদা। পার্থক্যের মধ্যে যেটুকু সেটুকু মাত্রার বা পরিমাণের। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় দেখা যায় যে শিশু বড়দের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি সত্তা এবং তার চাহিদাগুলিও একান্ত নিজস্ব। অতএব শিশুর পঠনীয় বিষয় হবে শিশুর নিজস্ব প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করা, বড়দের ছাঁচে ঢালা নয়।

দ্বিতীয়ত, মনোবিজ্ঞানের আধুনিক আবিষ্কার, ব্যক্তি-বৈষম্যের (Individual difference) নীতি অনুযায়ী প্রত্যেক শিশুরই মানসিক ক্ষমতা, রুচি, পছন্দ প্রভৃতি অন্য শিশু থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অতএব একটি সুনির্দিষ্ট পরিবর্তনবিহীন পাঠক্রম কখনই সকল শিশুর ক্ষেত্রে চলতে পারে না। প্রত্যেক শিশুর বিভিন্ন চাহিদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী পাঠক্রম বিভিন্ন হবে। তবেই শিক্ষাব্যবস্থা সত্যকারের কার্যকরী হয়ে উঠবে।

এই থেকে দেখা দিয়েছে পাঠক্রমকে বহুবিভক্ত (diversified) করার আধুনিক প্রবণতা, যার ফলে জন্ম নিয়েছে বহুমুখী (multilateral) বা বহু-সাধক (multipurpose) পাঠক্রম। গতানুগতিক পাঠক্রম ছিল একমুখী এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরোপুরি সাহিত্যধর্মী। তার মধ্যে না ছিল কারিগরী বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ, না ছিল কোনরূপ বৈচিত্র্যের স্থান। ফলে সামান্য কয়েকজন শিক্ষার্থী ছাড়া আর সকলেই থাকত অতৃপ্ত। কিন্তু আধুনিক পাঠ-ক্রমকে বহুমুখী করার ফলে এতে বিভিন্ন শিশুর ভিন্ন রুচি ও সামর্থ্য পরিতৃপ্তি লাভের সুযোগ পায়।

ভারতের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গতানুগতিক পাঠক্রমে শিশুর বিভিন্ন চাহিদার তৃপ্তির কোন ব্যবস্থাই ছিল না। কেবলমাত্র সাহিত্য ও ভাষার উপর নির্ভর করেই তা গঠিত হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি ভারতের বিদ্যালয়গুলিতে প্রবর্তিত বহু-সাধক (multpurpose) পাঠক্রমে বিভিন্নধর্মী নানা পাঠ্যবস্তু স্থান পেয়েছে এবং কেবলমাত্র সাহিত্যধর্মী পাঠ্যবিষয়ের বদলে সাতটি বিভিন্ন পাঠধারা প্রবর্তিত করা হয়েছে। সেগুলি হল—১। মানববিজ্ঞান ২। সাধারণ বিজ্ঞান ৩। কারিগরী ৪। কৃষি ৫। কলা ৬। গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান ৭। বাণিজ্য। শিক্ষার্থী তার চাহিদা ও রুচি অনুযায়ী ঐ সাতটি কর্মধারা থেকে একটি ধারা বেছে নিয়ে সেটি অনুসরণ করতে পারে।

বিষয়-বিভাজন-বিরোধী বা বিষয়-সমন্বয় আন্দোলন

পাঠক্রমের মধ্যে প্রচলিত বিষয় বিভাজন যে কৃত্রিম এবং সার্থক-শিক্ষার বিরোধী, একথা সব শিক্ষাবিদই স্বীকার করেন। শিশুর শিক্ষা একটি অবিভক্ত একক সত্তাবিশেষ, তার বিচিত্র অভিজ্ঞতা রাশির একটা সামগ্রিক রূপ। তাকে টুকরো টুকরো করে ভাগ করাটা শিক্ষণের দিক দিয়ে সুবিধাজনক হতে পারে কিন্তু মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে কৃত্রিম এবং অবাস্তব। অতএব শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে অন্তর্নিহিত মৌলিক সম্পর্ক সম্বন্ধে যাতে শিশু অবহিত হতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার।

অনুবন্ধ পদ্ধতি (Correlation Method)

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বহুদিন ধরেই শিক্ষাবিদেরা একটি বিশেষ শিক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণের ব্যবস্থা দিয়ে এসেছেন। এই পদ্ধতিটিকে অনুবন্ধ (correlation) পদ্ধতি বলা হয়।

এই পদ্ধতিতে শিক্ষণীয় বিষয়গুলির বিভাগকে অক্ষুণ্ণ রেখে তাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত মৌলিক সম্পর্কটি শিক্ষণের মাধ্যমে সুযোগমত শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরা হয়। যেমন, ইতিহাস পড়ানোর সময় বিচক্ষণ শিক্ষক সুযোগমত ভূগোল, রাষ্ট্রনীতি, ভূতত্ত্ব এমন কি সাহিত্যের উল্লেখ করে তাদের সঙ্গে ইতিহাসের মূলগত সম্পর্কটি শিক্ষার্থীর কাছে প্রকটিত করতে পারেন। তেমনই গণিতের ক্লাশে

ইতিহাস, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির প্রাসঙ্গিক অংশ উল্লেখ করে গণিতের সঙ্গে এদের যে অঙ্গগত সম্পর্ক আছে তা দেখিয়ে দিতে পারেন। এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলে বিভিন্ন বিষয়গুলি যে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র সত্তা নয় এবং তাদের মধ্যে যে মৌলিক যোগসূত্র আছে এই সত্যটি শিক্ষার্থীর কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। কিন্তু এই পদ্ধতিটি বহুদিন ধরে অনুসৃত হলেও এটিকে কার্যকরী করার পথে কতকগুলি ব্যবহারিক বাধা আছে, যেমন—

প্রথমত, বিষয়গুলির বিভাগ এতই সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত যে তাদের মধ্যেকার পাঁচিল ভেঙ্গে সহজে তাদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভবপর হয় না। তাছাড়া বিভিন্ন বিষয়ের পরিকল্পনাগুলিও তাদের নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মৌলিক নীতিগুলির মধ্যে মিল না থাকার ফলে তাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্পর্কটি কেবলমাত্র বাহ্যিক প্রচেষ্টার দ্বারা উন্মোচিত করা যায় না। যেমন ইতিহাসের পরিকল্পনা সময়গত ভাবে, ভূগোলের পরিকল্পনা দেশগত ভাবে, সাহিত্যের পরিকল্পনা মানবমনের চিন্তা ও কল্পনা নিয়ে, বিভিন্ন বিজ্ঞানের পরিকল্পনা প্রাকৃতিক ঘটনার বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে ইত্যাদি। বিষয়গুলির এই সুনির্দিষ্ট সীমারেখার জন্য তাদের মধ্যে অনুবন্ধ স্থাপন করা সহজ হয় না এবং যেটুকুও যায় সেটুকু সব সময়েই খুব গভীর বা গুরুত্বপূর্ণ হয় না।

দ্বিতীয়ত, সম্ভবপর অনুবন্ধও এতই বাহ্যিক এবং ভাসা ভাসা হয়ে থাকে যে তার ফলে অনুবন্ধেরপ্রকৃত উদ্দেশ্য যে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে সমন্বয় আনা সেটাই এর দ্বারা সিদ্ধ হয় না।

তৃতীয়ত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে অনুবন্ধের প্রচেষ্টা চেষ্টাকৃত এবং অস্বাভাবিক, তার ফলে যে শিক্ষার প্রক্রিয়াটিই যান্ত্রিক, নীরস এবং প্রায়ই অর্থহীন হয়ে ওঠে।

চতুর্থত, অনুবন্ধ পদ্ধতিকে সার্থক করে তুলতে হলে প্রয়োজন যথেষ্ট অভিজ্ঞ, শিক্ষাপ্রাপ্ত ও প্রতিভাবান শিক্ষকের। সাধারণ শিক্ষকের পক্ষে অনুবন্ধ পদ্ধতিকে কার্যকরী করে তোলা খুবই কঠিন। নানা কারণে যথেষ্ট সংখ্যায় যোগ্য শিক্ষক পাওয়া একটা কঠিন ব্যাপার।

কেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি

অনুবন্ধ পদ্ধতির আরও একটু উন্নত ধাপ হল কেন্দ্রীকরণ (Concentration) পদ্ধতি। এই পদ্ধতির সমর্থক হলেন জিলার (Ziller), হার্বার্ট (Herbart)

প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্গণ। এই পদ্ধতিতে পাঠক্রমের কেন্দ্রে থাকে একটি নির্দিষ্ট বিষয় এবং অন্যান্য বিষয়গুলি অনুবন্ধ পদ্ধতিতে পড়ান হয় সেই কেন্দ্রীয় বিষয়টিকে ঘিরে। জিলারের মতে ইতিহাসই একমাত্র বিষয় যাতে সকল প্রকার মানব অভিজ্ঞতা স্থান পেয়েছে, অতএব ইতিহাসকে কেন্দ্রীয় বিষয় করে অন্যান্য বিষয়গুলি তার মাধ্যমে পড়ান হবে। পরিকল্পনা হিসাবে কেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি যে প্রশংসনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু অনুবন্ধ পদ্ধতির যে সকল দোষ সে সব কটি এখানে অক্ষুণ্ণ থাকায় এর কার্যকারিতা সম্বন্ধেও সন্দেহের প্রচুর অবকাশ আছে। গান্ধিজী প্রবর্তিত আধুনিক বুনিয়াদি-শিক্ষা পরিকল্পনাটি অনুবন্ধ পদ্ধতির উপর, আরও নিখুঁতভাবে বলতে গেলে, জিলারের কেন্দ্রীকরণ পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পরিকল্পনায় একটা শিল্পকে কেন্দ্রীয় বিষয়রূপে নেওয়া হয়েছে এবং অন্যান্য বিষয়-গুলি ঐ কেন্দ্রীয় শিল্পের সঙ্গে অনুবন্ধ পদ্ধতিতে পড়ান হয়ে থাকে।

ব্যাপক-ভিত্তিক পাঠক্রম

অনুবন্ধ পদ্ধতির নানা অসুবিধা দেখে আধুনিক কালে শিক্ষাবিদ্গণ বিষয়-বিভাজনের ত্রুটি দূর করার জন্য আর একটি সমাধান উপস্থাপিত করেছেন। একে বিষয়-সমন্বয়ের পরিকল্পনা বলে বর্ণনা করা যায়। এই পরিকল্পনায় বিষয়গুলির মধ্যে কৃত্রিম পাঁচিলগুলো যতদূর সম্ভব ভেঙ্গে ফেলে পাঠক্রমের ভিত্তিটাকে ব্যাপক করে তোলার প্রস্তাব করা হয়েছে।

জন্ ডিউই তাঁর পরীক্ষণমূলক বিদ্যালয়ে বিষয়বিভাগকে একেবারে বাতিল করে সম্পূর্ণ একটি বিষয়বর্জিত অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক পাঠক্রম অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু এই ধরনের পাঠক্রমের কার্যকারিতা প্রচুর হলেও সাধারণ বিদ্যালয়ে তার প্রবর্তন করার ব্যবহারিক অসুবিধা অনেক।

সেইজন্য আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণ বিষয়বিভাজনকে একেবারে বাতিল না করে মানব অভিজ্ঞতার প্রকৃতি অনুযায়ী নতুন পদ্ধতিতে বিষয় বিভাগের নীতি গ্রহণ করেছেন। এই নীতিতে পূর্বের মত সঙ্কীর্ণ ভিত্তিতে বিভাজন করা হয় নি, তার পরিবর্তে বিভাজনের ভিত্তিরূপে অনেক ব্যাপক ক্ষেত্র নেওয়া হয়েছে। এইজন্য এই পাঠক্রমকে ব্যাপকভিত্তিক (Broad-field or Broad-based) পাঠক্রম বলা হয়।

মানব অভিজ্ঞতা যদিও অবিচ্ছিন্ন একটি একক তবুও প্রকৃতির দিক দিয়ে তাকে কয়েকটি ব্যাপকক্ষেত্রে ভাগ করা যায়।

প্রথম, মানব-বিজ্ঞান (Humanities)। এর প্রধান কেন্দ্রগত বস্তু হচ্ছে মানুষ নিজে তার চিন্তা, ভাবধারা, কল্পনা, আদর্শ, অনুভূতি ও আত্ম-অভিব্যক্তি সমস্ত নিয়ে। এই পর্যায়ে পড়ল সাহিত্য, কলা, দর্শন প্রভৃতি।

দ্বিতীয়, প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান (Natural Sciences)। বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা এই বিভাগের কেন্দ্রস্থলীয়। এই পর্যায়ে পড়ে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ইত্যাদি।

তৃতীয়, সমাজ-বিজ্ঞান (Social Studies)। এই পর্যায়ে পড়ে সেই সকল ঘটনা যা মানুষ ও প্রকৃতি এ দু'য়ের যৌথ প্রতিক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হয়। এ বিভাগের অন্তর্গত ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি।

ব্যাপকভিত্তিক পাঠক্রম সনাতন বিষয়মূলক পাঠক্রমের চেয়ে যে অনেক উন্নত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এতে শিশুর শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বিষয়-বিভাজন-জনিত কৃত্রিম বিভেদ অনেক দূর হয়ে যায় এবং তার অভিজ্ঞতা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সংহত ও সুসংবদ্ধ হতে পারে।

কিন্তু তবুও ব্যাপকভিত্তিক পাঠক্রম কখনই পাঠক্রম সংস্কারের শেষ কথা নয়। কেননা বিভাজনের ভিত্তিকে যতই ব্যাপক করা হক না কেন, তবু এই ব্যবস্থায় বিভাজনকে মৌলিক নীতিরূপে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবং যে পদ্ধতিতেই বিভাজন করা হক না কেন সব বিভাজনই যে কৃত্রিম সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ভারতের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রবর্তিত নতুন পরিকল্পনায় ব্যাপক-ভিত্তিক পাঠক্রমের নীতি গৃহীত হয়েছে।

অভিজ্ঞতা-কেন্দ্রিক পাঠক্রম

পাঠক্রম সংস্কারের শেষ কথা বোধ হয় বলে গেছেন জন ডিউই, এবং তাঁর প্রসিদ্ধ ল্যাবরেটরী স্কুলে পরীক্ষামূলকভাবে তার কার্যকারিতা প্রমাণ করে গিয়েছেন। তাঁর পরিকল্পনায় বিষয়গত বিভাজনকে একেবারে সম্পূর্ণ বাতিল করা হয়েছে। ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের পরিবর্তে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তাই হবে এই নতুন পাঠক্রমের মূল উপাদান। ডিউইর মতে শিক্ষা হল শিশুর আচরণের বাঞ্ছিত পরিবর্তন এবং তা কেবলমাত্র বই পড়ে বা বক্তৃতা শুনে অর্জিত জ্ঞান থেকে আসে না, তার আসার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে শিশুর বাস্তব অভিজ্ঞতা।

অতএব শিক্ষার একমাত্র উপকরণ হচ্ছে সক্রিয়তা এবং পাঠক্রমের একমাত্র উপাদান হচ্ছে বাস্তব অভিজ্ঞতা।

এই জন্যই তাঁর ল্যাবরেটরী স্কুলে তিনি বিষয়গত পাঠক্রমের পরিবর্তে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক (experience-based) পাঠক্রমের প্রবর্তন করেছিলেন এবং সেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের বহুমুখী অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সকল রকম শিক্ষালাভ করত।

এই ধরনের পাঠক্রম অবশ্য যথেষ্ট পরিমাণে সুপরিকল্পিত ও সুচিন্তিত না হলে পাঠক্রমের প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা আছে। কেননা উদ্দেশ্যবিহীন সক্রিয়তার বিশেষ কোন মূল্য নেই। সুচিন্তিত পরিকল্পনার সাহায্যে শিশুদের জীবনের বাস্তব পরিস্থিতিগুলি বিদ্যালয়ে সৃষ্টি করা যায় এবং সেইগুলিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার ব্যক্তিগত ও সমাজগত উভয় জীবনের সার্থক বিকাশের পথ খুঁজে পেতে পারে। এই পাঠক্রমের মূল উপকরণ হল প্রজেক্ট এবং বিভিন্ন প্রজেক্টের মধ্যে দিয়ে শিশু নানাবিধ বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে।

আমরা ইতিহাসের কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমের যে বর্ণনা পেয়েছি তার সঙ্গে এই অভিজ্ঞতা-কেন্দ্রিক পাঠক্রমের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। একটিতে শিক্ষার সক্রিয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে আর একটিতে শিশুর অভিজ্ঞতাকে শিক্ষার একমাত্র বিষয়বস্তু করে তোলা হয়েছে। যেহেতু অভিজ্ঞতামাত্রেই সক্রিয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই হেতু এ দুটি পাঠক্রমের উদ্দেশ্য, গঠন ও পরিকল্পনা মূলত একই।

কিন্তু পাঠক্রমকে কর্মকেন্দ্রিক বা অভিজ্ঞতা-কেন্দ্রিক যাই করা হক না কেন একেবারে বিষয় বিভাজনকে বাদ দিয়ে শিক্ষার সমস্ত প্রয়োজন মেটাতে পারে এমন পাঠক্রম তৈরী করা শক্ত। যদিও ডিউই তাঁর ল্যাবরেটরী স্কুলে একেবারে বিষয়কে বাদ দিয়েছিলেন কিন্তু সাধারণ বিদ্যালয়ে বা সাধারণ শিক্ষকের পক্ষে একেবারে বিষয়-বিভাগকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ পাঠক্রম তৈরী করা সম্ভব হয় না। সেই-জন্য আধুনিক বিদ্যালয়গুলিতে শিশুর অভিজ্ঞতা বা সক্রিয়তাকে পাঠক্রমের কেন্দ্রে রেখে প্রজেক্টের মাধ্যমে বিষয়গুলির প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আহরণ করতে শিশুকে সাহায্য করা হয়।

পাঠক্রম রচনার মৌলিক নীতি

শিক্ষার্থীদের সত্যকারের উপযোগী এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ এমন একটি সার্থক পাঠক্রম রচনা করতে হলে যে মৌলিক নীতিগুলি আমাদের মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন সেগুলির নীচে উল্লেখ করা হল।

১ পাঠক্রমের ব্যাপক সংজ্ঞা

পাঠক্রম রচনা করতে গিয়ে প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে পাঠক্রম শিক্ষকের শিক্ষণের সুবিধার জন্য কতকগুলি পাঠ্যবিষয়ের তালিকা-মাত্র নয়। পাঠক্রম হল বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীর সুনিয়ন্ত্রিত অভিজ্ঞতার সমষ্টি। ক্লাসে, খেলার মাঠে, লাইব্রেরীতে, গবেষণাগারে, যাদুঘরে ছাত্রছাত্রীরা পরস্পরের মধ্যে সংযোগের মাধ্যমে যে বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা আহরণ করে তাই হল পাঠক্রমের উপাদান। পাঠক্রমের এই ব্যাপক সংজ্ঞাটি সম্বন্ধে পাঠক্রম রচনার সময় সম্পূর্ণ অবহিত থাকতে হবে।

২ শিক্ষাশ্রয়ী দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে

পাঠক্রমের ভিত্তি শিক্ষাশ্রয়ী দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। শিক্ষার বিষয়-বস্তু নির্ভর করে শিক্ষার লক্ষ্য এবং সার্থকতার উপর। শিক্ষার লক্ষ্য এবং সার্থকতা আবার নির্ভরকরে দর্শনের সংব্যাখ্যানের উপর। অতএব পাঠক্রমের মৌলিক নীতিগুলি যেন দর্শনসম্মত হয় নইলে পাঠক্রমের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হতে বাধ্য।

৩ ব্যক্তি-চাহিদা ও সমাজ-চাহিদার সমন্বয়

পাঠক্রমে এমন সব অভিজ্ঞতা স্থান পাবে যাতে শিশুর ব্যক্তিগত চাহিদা এবং তার সমাজ-জীবনের চাহিদা উভয়ের মধ্যে যথাসম্ভব সামঞ্জস্য বজায় থাকে। আদর্শ পাঠক্রম হবে সেটি যাতে এ দ্বিবিধ চাহিদার প্রতিই সুবিচার করা সম্ভব হবে।

৪ ব্যক্তি-বৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে

ব্যক্তি-চাহিদার প্রতি সুবিচার করার অর্থ হল শিশুর অন্তর্নিহিত সম্ভবনা, তার প্রকৃতিদত্ত সামর্থ্য, তার রুচি ও আগ্রহ প্রভৃতি পাঠক্রমের মধ্যে দিয়ে বিনা বাধায় নিজেদের পূর্ণ অভিব্যক্তির পথ খুঁজে পাবে। এর জন্য পাঠক্রম রচনায় যে নীতিটি সর্বাগ্রে মনে রাখতে হবে সেটি হল ব্যক্তি-বৈষম্যের (Individual Difference) নীতি। মনে রাখতে হবে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী একটি স্বতন্ত্র একক সত্তা, নিজস্ব বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে সে অপরের সঙ্গে অতুলনীয়। অতএব সামর্থ্য, বুদ্ধি, রুচি ও বয়সের দিক দিয়ে শিশুতে শিশুতে এই যে পার্থক্য তার উপরই ভিত্তি করে রচনা করতে হবে পাঠক্রম। বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার দিক দিয়ে পাঠক্রম যেন সর্বশ্রেণীর শিক্ষার্থীকে পূর্ণবিকাশের সুযোগ দেবার উপযোগী হয়।

৫ বহুমুখী হবে

পাঠক্রমের বিষয়বস্তুগুলিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে সেগুলি শিক্ষার্থীর আগ্রহ এবং সামর্থ্যের বিরোধী না হয় এবং তাতে এমন কোন পঠনীয় বিষয় থাকবে না যেটা শিক্ষার্থীর উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এক কথায় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন রুচি-সামর্থ্য অনুযায়ী পাঠক্রমও বিভিন্নধর্মী ও বহুমুখী হবে।

৬ সমাজ-জীবনের প্রস্তুতি দেবে

সমাজ-চাহিদার প্রতি সু-বিচার করার অর্থ হল, শিশু যে সমাজে বাস করে সেই সমাজের যোগ্য নাগরিকরূপে সে যেন বেড়ে ওঠে। প্রত্যেক সমাজেই সার্থক সমাজ-জীবন যাপনের যোগ্যতার একটি সর্বনিম্ন মান আছে। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নিশ্চিন্ত সমাজ-জীবন যাপনের জন্য এই সর্বনিম্ন যোগ্যতার অধিকারী হতে হয়। পাঠক্রমের অন্তর্গত অভিজ্ঞতাগুলি এমনভাবে পরিকল্পিত হওয়া উচিত যাতে শিশু তার ভবিষ্যৎ সমাজ-জীবনের জন্য অপরিহার্য অভিজ্ঞতাগুলির সঙ্গে বাস্তব পরিচয় লাভ করতে পারে। তাছাড়া বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার সংস্কার সাধন

এবং আদর্শ সমাজ-জীবন গঠনের নির্দেশও পাঠক্রমের সু-পরিকল্পিত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দেওয়া যায়। এর অর্থ হল সংগঠিত ও সম্মিলিত কার্যাবলীর স্থান পাঠক্রমে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকবে।

৭ শিশুর জীবন-কেন্দ্রিক হবে

শিক্ষার্থীর জীবনকে কেন্দ্র করে পাঠক্রম গড়ে উঠবে। শিক্ষার্থীর জীবন বলতে বোঝায় তার পূর্বপুরুষদের অতীত জীবন, তার বর্তমান এবং তার ভবিষ্যৎ জীবন, এ তিনের সমষ্টি। পাঠক্রমের অন্তর্গত অভিজ্ঞতাগুলি এই তিন জীবনকে বিষয়বস্তু করে গড়ে উঠবে। এক কথায় তার সমস্ত অভিজ্ঞতাই মূর্ত হয়ে উঠবে বাস্তবকে নিয়ে, তাতে একদিকে থাকবে তার পূর্বগামীদের সযত্ন সঞ্চিত কৃষ্টি ও চিন্তাধারার অতি প্রয়োজনীয় প্রভাব, আর একদিকে থাকবে তার স্বাস্থ্যময় ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুতির আয়োজন। পূর্বপুরুষদের অতীতকে ভাল করে জানার জন্য, তার বর্তমান ক্রমবিকাশমান সত্তার পূর্ণতা-প্রাপ্তির জন্য এবং ভবিষ্যৎ জীবনে যোগ্যতা অর্জনের জন্য যে সকল আচরণ অপরিহার্য সেগুলি অতি অবশ্যই পাঠক্রমে সন্নিবেশিত করতে হবে।

৮ কর্মকেন্দ্রিক হবে

পাঠক্রমে পর্যাপ্ত পরিমাণে সক্রিয়তার স্থান থাকবে। কিন্তু লিখন-পঠন-সর্বস্ব পাঠক্রম যে অবাস্তব এ কথা এখন সর্বজন-স্বীকৃত। শিক্ষাকে সার্থক করতে হলে সক্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সব কিছু শিখতে হবে। পাঠক্রমকে সত্যকারের জীবনকেন্দ্রিক করতে হলে সক্রিয়তাকেই পাঠক্রমের মূল উপাদান করে তুলতে হবে।

৯ বৃত্তি-পরিচিতি দেবে

বৃত্তি-শিক্ষার ব্যবস্থা ও তার পাঠক্রম যদিও স্বতন্ত্র, তবু সাধারণ পাঠক্রমে শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন বৃত্তি সম্বন্ধে পরিচয় দেবার আয়োজন থাকবে। অর্থাৎ পাঠক্রমে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিল্পে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের ব্যবস্থা থাকবে,

যাতে শিক্ষার্থী নিজের রুচি ও সামর্থ্য সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট ধারণা পেতে পারে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে সার্থক বৃত্তি নির্বাচন করতে পারে।

১০ যথেষ্ট পরিবর্তনশীল হবে

পাঠক্রম কখনই অপরিবর্তনীয় বা চির-স্থির হবে না। শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুযায়ী যাতে পাঠক্রমকে পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করা যায় তার যথোচিত ব্যবস্থা থাকবে। বস্তুত বিদ্যালয়ের নিজস্ব ও স্থানীয় পরিবেশ, সাংস্কৃতিক ও অর্থ নৈতিক বিভিন্নতা প্রভৃতি কারণে অনেক সময় পাঠক্রমকে পরিবর্তিত করতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই বাধ্য হন।

১১ অবিভাজ্য হবে

পাঠক্রম শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা-বৈচিত্র্যের সমষ্টি। যদিও সুবিধার জন্য পাঠক্রমকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে তবু প্রকৃতপক্ষে পাঠক্রম অবিভাজ্য একটি একক অভিজ্ঞতা-প্রবাহ। সেইজন্য যখনই কোন বিশেষ শিক্ষাস্তরের জন্য পাঠক্রম তৈরী করা হবে তখনই দেখতে হবে যে তা তার ঠিক নীচের এবং উপরের স্তরের পাঠক্রমের সঙ্গে পাঠক্রমটি সু-সমন্বিত ও সু-সংবদ্ধ আছে কিনা।

১২ সার্থক অবসর-যাপনের শিক্ষা দেবে

পাঠক্রম কেবলমাত্র শিক্ষার্থীকে তার কর্মময় জীবনের জন্য প্রস্তুত করবে না, তার অবসরের মুহূর্তগুলির জন্যও প্রস্তুত করবে। অবসরের মুহূর্তগুলি অর্থহীন বা ক্ষতিকর কাজের মধ্য দিয়ে নষ্ট না করে কেমন করে সেগুলিকে গঠনমূলক এবং আনন্দদায়ক কাজে সার্থক করে তোলা যায় সে শিক্ষাও পাঠক্রমের অঙ্গীভূত হবে।

১৩ সুপরিচালনার ব্যবস্থা থাকবে

কেবলমাত্র জীবনের অতি-প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিশুকে

পরিচিত করেই পাঠক্রমের কাজ শেষ হবে না। শিশুর জীবন-বিকাশ যাতে বাঞ্ছিত ও কল্যাণকর পথে এগোতে পারে তার জন্য উপযোগী পরিচালনার ব্যবস্থাও পাঠক্রমে থাকবে। যে স্তরের জন্য পাঠক্রমটি নির্দিষ্ট সেই স্তরের পরবর্তী যে জীবনে শিক্ষার্থী প্রবেশ করবে তার সম্বন্ধে যথোচিত নির্দেশদান ও পরিচালনা পাঠক্রমের অন্তর্গত হবে।

প্রশ্নাবলী

1. What principles should be followed in drawing up curricula of studies for a recognised secondary school system of India ? (B. T. 1950, 1954).

Ans. (পৃঃ ৭৩—পৃঃ ৭৭)

2. Is mental discipline the real condition as regards the choice of studies in schools ? If not what principles should govern the framing of a curriculum of studies for secondary schools ? (B. T. 1951).

Ans. (পৃঃ ৬০/৭৩—পৃঃ ৭৭)

3. The prime and direct aim of instruction is to enable a man to know himself and the world. Keeping this view in mind discuss what principles should govern the choice of studies in secondary schools. (B. T. 1953).

Ans. (পৃঃ ৭৩—পৃঃ ৭৭)

4. What are the basic principles which should guide us in curriculum construction. (B. T. 1955, 1958. B.A. Hons. 1959).

Ans. (পৃঃ ৬৮—পৃঃ ৭২)

5. What principles should you follow in framing curriculum of any stage of education ? Examine the present secondary curriculum in West Bengal in the light of these principles. (B. T. 1956).

Ans. (পৃঃ ৭৩—পৃঃ ৭৭)

6, What is curriculum ? Supposing as Headmaster of a High School you are given absolute freedom to frame the curriculum of your school, how would you modify the existing curriculum ? (B. T. 1957).

Ans. (পৃঃ ৭৩—পৃঃ ৭৭)

7. Why are craft and creative activities forming part of school curricula ? Indicate the educational value of knowledge correlated to natural activities of children. (B. A. 1957)

Ans. (পৃঃ ৭৩—পৃঃ ৭৭)

8. "A rationally conceived curriculum must be the resultant of these two forces : the nature of the child and the requirements of the community." Give an outline of such a curriculum. (B. T. 1958).

Ans. (পৃঃ ৭৩—পৃঃ ৭৭)

9. Enumerate the main principles on which the curriculum should be based. What would be your suggestions for the reforms of the existing curriculum of our ten-class schools ? (B. T. 1959).

Ans. (পৃঃ ৭৩—পৃঃ ৭৭)

10. What do you understand by activity-based curriculum ? Describe a few methods that you will employ in framing such a curriculum.

Ans. (পৃঃ ৬৩—পৃ ৬৭)

11. Discuss the major trends that have found expression in the modern reformation of curriculum.

Ans. (পৃঃ ৬৩—পৃঃ ৭৩)

12. Describe critically the principles that should operate in the choice of school studies. (B. A. 1960)

Ans. (পৃঃ ৭৩—৭৭)

13. In the early stages the curriculum should be thought of in terms of activities rather than subjects. Do you agree ? Give reasons for your answer (B. A. 1961).

Ans. (পৃঃ ৬৩—পৃঃ ৬৭)

চার

বিদ্যালয় ও সমাজ (School & Society)

বিদ্যালয় সমাজেরই সৃষ্টি। সমাজের অপরিণত নাগরিকগণকে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগুলি দেওয়ার জন্য সমাজ বিদ্যালয়ের জন্ম দেয়। প্রথম প্রথম এই শিক্ষা পরোক্ষভাবে দেওয়া হত পরিবার, দেবায়তন প্রভৃতি সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কিন্তু শিক্ষার জটিলতা ও আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই শিক্ষা প্রত্যক্ষভাবে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল এবং তার ফলে জন্ম নিল বিদ্যালয়। এক কথায় সমাজের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই সমাজ সৃষ্টি করেছে বিদ্যালয়। অতএব একথা বলা বাহুল্য যে সমাজ এবং বিদ্যালয়ের মধ্যে সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ এবং দুয়ের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ বা ব্যবধান থাকাটা সম্ভব নয়। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে সাধারণত শিক্ষক বা সমাজনায়কগণ উভয়েই বহুপ্রাচীন কাল থেকেই সমাজ ও বিদ্যালয়ের এই মূলগত যোগসূত্রটা ভুলে গিয়ে তাদের মধ্যে একটা কৃত্রিম ব্যবধান সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে সমাজ অনাচার, দুর্নীতি, অসত্য ও দুঃখের আবাস। শিশুর শিক্ষাকে এই সকলের প্রভাব থেকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এবং সেইজন্য দেখতে হবে যেন শিক্ষার পরিবেশ কোন মতেই সমাজের মালিন্যের স্পর্শে কলুষিত না হয়ে যায়। অতএব বিদ্যালয়ের চার দিকে তুলতে হবে দুর্ভেদ্য প্রাচীর এবং সমাজের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে তার সেই নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে শিশুর শিক্ষা।

এইভাবে পরিকল্পিত শিক্ষা যতই উচ্চস্তরের হক না কেন, তা যে একেবারে কৃত্রিম তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে সমাজের চাহিদা মিটানর জন্য বিদ্যালয়ের সৃষ্টি, সেই সমাজেরই সামনে দেয়াল তুলে দিলে বিদ্যালয়ে আর যে কাজই হক না কেন প্রকৃত শিক্ষা যে হবে না সে বিষয়ে মতান্তর থাকতে পারে না।

কিন্তু বিদ্যালয় এবং সমাজের এই মিথ্যা বিরোধ এবং ব্যবধান বহুদিন ধরেই শিক্ষাবিদেরা বজায় রেখে এসেছেন। সমাজের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ পরিমুক্ত অবস্থায় বিদ্যালয়ের পরিবেশ রচনা করার নীতিই গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার একটা বড় বৈশিষ্ট্য ছিল। বিদ্যালয়গুলি পরিকল্পিত হত সমাজের অভ্যন্তরস্থ দুর্ভেদ্য পাঁচিল দিয়ে ঘেরা কতকগুলি দুর্গের মত।

তাদের পরিবেশ সৃজন করা হত সম্পূর্ণ কল্পনার উপর ভিত্তি করে। ফলে সে পরিবেশ বাহ্যত আকর্ষণীয় হলেও তা হয়ে উঠত সম্পূর্ণ অবাস্তব ও কৃত্রিম এবং সেই পরিবেশে মানুষ হয়ে যে সকল শিক্ষার্থী সমাজজীবনে প্রবেশ করত তারা নিজেদের শোচনীয় ভাবে সেই সমাজের পক্ষে অযোগ্য বলে অনুভব করত। তা ছাড়া বিদ্যালয়ের পরিবেশ সমাজধর্মী না হওয়ায় স্বাভাবিক পন্থায় শিক্ষণদানও সম্ভব হত না। ফলে কৃত্রিম শিক্ষণপদ্ধতি গ্রহণ করতে হত এবং কড়া শাসনের সাহায্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হত।

সমাজ বিদ্যালয়-নির্ভর

বিদ্যালয় এবং সমাজ—এ দুইই নানা দিক দিয়ে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। সমাজ যে যে দিক দিয়ে বিদ্যালয়ের উপর নির্ভরশীল নীচে তার কয়েকটা ক্ষেত্রের উল্লেখ করা হল।

প্রথম, সমাজ তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যই বিদ্যালয়ের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। আমরা জানি যে সমাজের সংরক্ষণ নির্ভর করছে তার জ্ঞান, কৃষ্টি ও চিন্তাধারার সঞ্চিত ভাণ্ডারটি আগামী নাগরিকদের হাতে তুলে দেওয়ার উপর। এই শিক্ষার সঞ্চালনের জন্য প্রতি সমাজেই বহু প্রতিষ্ঠান আছে, এবং বিদ্যালয় হল তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ও কার্যকরী প্রত্যক্ষ মাধ্যম। যতই দিন যাচ্ছে ততই বিদ্যালয়ের এই কাজ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং বর্তমানে সভ্যদেশগুলিতে সমাজ সংরক্ষণের মাধ্যমরূপে বিদ্যালয় অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সমাজ একটি স্থিতিশীল সত্তা নয়। সমাজ চির গতিময়, এমনকি সমাজের অস্তিত্বই নির্ভর করছে এই গতিশীলতার উপর। অতএব কেবলমাত্র পূর্বপুরুষদের অর্জিত জ্ঞান, শিক্ষা ও ভাবধারাকে নিয়ে তৃপ্ত থাকলেই সমাজ বাঁচতে পারে না। তার জীবনীশক্তিকে অব্যাহত রাখতে হলে দরকার নূতন জ্ঞান ও চিন্তাধারার। যে সমাজ তার সঞ্চিত জ্ঞান ও চিন্তার ভাণ্ডারটিকে নিত্য নূতন আহরণ দিয়ে সমৃদ্ধ করতে পারে, পরিবর্তনশীল পরিপার্শ্বের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের নতুন পন্থা আবিষ্কার করতে পারে, নতুন কৌশল আয়ত্ত করে জীবনের সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারে সেই সমাজই কালের প্রতিযোগিতায় বেঁচে থাকতে পারে। আর এই নতুন জ্ঞান, চিন্তা ও কৌশলের সৃষ্টির একটা প্রধান ক্ষেত্র হল বিদ্যালয়। সেখানে সক্রিয় অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের মধ্যে দিয়েই শিক্ষার্থীর নতুন তথ্য

আবিষ্কার করবে, নতুন কৌশল আয়ত্ত করবে এবং নতুন ভাবধারার জন্ম দেবে।

তৃতীয়, সমাজ সংস্কারের দায়িত্বও বর্তমানে অনেকখানি বিদ্যালয়ের হাতে। আধুনিক বিদ্যালয় বৃহত্তর সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। অতএব সেই বিদ্যালয়-সমাজে অংশ গ্রহণ করার সময় শিক্ষার্থী যেমন সমাজ-জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে পরিচিত হয় তেমনই সমাজের দোষ-ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা ও কু-রীতিগুলির সম্বন্ধেও যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করে। উপযুক্ত পরিচালনা ও সহায়তায় শিক্ষার্থীরা মিলিত আলোচনার মাধ্যমে সমাজের এই সকল দোষত্রুটি অসম্পূর্ণতা দূর করার পন্থা উদ্ভাবন করতে পারে। ফলে আজ যারা জ্ঞান-সন্ধানী শিক্ষার্থী কাল তারা সমাজ-সংস্কারক ও সমাজ-নায়ক হয়ে ওঠে।

চতুর্থ, সমাজের জীবনে মাঝে মাঝে এমন সব জটিল সমস্যা দেখা দেয়, যেগুলি একমাত্র বিদ্যায়তনের মাধ্যমেই সুষ্ঠুভাবে সমাধান করা যায়।

সমাজের মৌলিক সংগঠন নিয়েই সময় সময় এমন কতকগুলি সমস্যামূলক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যার ফলে সমাজ-জীবনে গুরুতর বিপর্যয় দেখা দেবার সম্ভাবনা থাকে। এই বিপর্যয় থেকে সমাজকে রক্ষা করতে হলে দরকার জনসাধারণকে সেই সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন করা, তার সমাধান সম্বন্ধে অবহিত করা এবং সুপরিকল্পিত পন্থায় সেই সমাধান অনুসরণ করতে প্রবুদ্ধ করা। এই ব্যাপক জনশিক্ষার পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার একটা শক্তিশালী মাধ্যম হল বিদ্যালয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কোন বিশেষ কারণে বৈষম্য বা বিরোধ দেখা দিলে অপরিহার্য পরিণতি হিসাবে দেখা দেয় শ্রেণীযুদ্ধ বা বিপ্লব। কিন্তু সেই ক্ষতিকর বিপ্লবকে রোধ করতে পারে একমাত্র শিক্ষা এবং বিদ্যালয়ই তার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমরূপে কাজ করতে পারে। সমাজনায়কগণ উপযুক্ত শিক্ষার সাহায্যে সমাজের ভবিষ্যৎ নাগরিকগণকে এমনভাবে তৈরী করতে পারেন যে তারা যখন সমাজের ভার নেবে তখন আপনা হতেই এই শ্রেণীবিরোধ দূর হয়ে যাবে। অতএব জনশিক্ষার একটা বড় ক্ষেত্র হল বিদ্যালয়।

সবশেষে, বিদ্যালয় এখন সমাজের মৌলিক নীতি ও তত্ত্বাদি নির্ধারণের প্রধান মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। সভ্য মানুষের সমাজ আজ ক্রমবিকাশের এমন একটা উন্নত ও জটিল অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে তার সুষ্ঠু সংগঠন ও পরিচালনার জন্য সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত নীতি ও তত্ত্বের প্রয়োজন। মনোবিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র,

সমাজ-বিজ্ঞান—এ সকলের মিলিত অবদানের উপর নির্ভর করে গড়ে তুলতে হবে কার্যকরী নীতি ও তত্ত্ব যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে সামাজিক প্রক্রিয়াগুলি।

এই অতি-প্রয়োজনীয় মৌলিক সামাজিক নীতিগুলি নির্ধারণের ভার নিয়েছে আধুনিক বিদ্যালয়। বস্তুত বিদ্যালয় এখন মানব-জীবনের সংশ্লিষ্ট সকলপ্রকার তত্ত্ব ও মানের গবেষণাগার হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আমাদের ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন—এ দুয়ের ক্ষেত্রেই কোন্ তত্ত্বটি প্রযোজ্য এবং কোন্ মানটি গ্রহণীয় এ সিদ্ধান্ত করে দেয় বিদ্যালয়। তার জন্য প্রয়োজন পুরাতন প্রচলিত তত্ত্ব ও মানগুলির পর্যবেক্ষণ, বর্তমান প্রয়োজনীয়তার বিচারে তাদের মূল্য-নিরূপণ, নূতন তত্ত্ব ও মানের উদ্ভাবন এবং অবশেষে সেগুলির ব্যবহারিক পরীক্ষণ। সুপরিকল্পিত ও সম্মিলিত গবেষণার মাধ্যমে আধুনিক বিদ্যালয় সমাজের এই অতি প্রয়োজনীয় তত্ত্ব ও মানগুলি নির্ধারিত করে দেয়।

বিদ্যালয়ও সমাজ-নির্ভর

বিদ্যালয় যে সমাজ-নির্ভর একথা বিশেষ করে বলার দরকার নেই। সমাজ-সংরক্ষণের প্রয়োজন মেটাবার জন্যই বিদ্যালয় তৈরী হয়েছিল, যদিও আজ সমাজের সেই একমাত্র প্রয়োজন সাধনেই বিদ্যালয়ের কাজ সীমাবদ্ধ নয়। বিদ্যালয়ের কাজ সমাজ-জীবন, ব্যক্তিজীবন, এমন কি সমগ্রভাবে মানব সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে। কিন্তু সমাজের সংরক্ষণ যে বিদ্যালয়ের প্রধানতম কাজ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেইজন্যেই বিদ্যালয় সম্পূর্ণ সমাজের উপর নির্ভরশীল এবং তার শিক্ষার স্বরূপ, পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য—এ সমস্তই যে সমাজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কিন্তু এ ছাড়াও আর একটা বড় কথা হল যে বিদ্যালয়ে শিক্ষার স্বরূপ ও পরিকল্পনা সামাজিক কাঠামোর উপর অনেকখানি নির্ভর করবে। শিক্ষার লক্ষ্য কি হবে, কতটা তা ব্যক্তির প্রয়োজন মিটাতে পারবে, কেমন করে ব্যক্তির স্বার্থ ও সমাজের স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় আনতে পারবে, এ সকলই নির্ভর করে সমাজের কাঠামোর উপর। মনে রাখতে হবে শিক্ষা পুরোপুরি একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। অতএব শিক্ষার স্বরূপ যে সমাজব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হবে তাতে আশ্চর্য কি? অতি ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজ হলে বিদ্যালয়গুলি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিকাশের লীলাভূমি হয়ে দাঁড়াবে, আর যদি সমাজ অতি-সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার পোষক হয় তবে

বিদ্যালয়গুলি সমাজের প্রয়োজন পূরণের মুখ্য মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। আর যদি এ দুই ভাবধারার মধ্যে সমতা বজায় রেখে চলতে পারে এমন সমাজ হয়, তবে সে সমাজের বিদ্যালয়ও ব্যক্তি ও সমাজ এ দু'য়েরই প্রয়োজনের প্রতি সুবিচার করতে পারে। ডিউই প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্গণের মতে একমাত্র গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাতেই এই উভয়ধারার মধ্যে সমতা থাকে, অতএব সেই মত অনুযায়ী একমাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিদ্যালয়েই শিক্ষাব্যবস্থা আদর্শ স্তরে গিয়ে পেঁছিতে পারে।

বিদ্যালয় সমাজেরই প্রতিচ্ছবি

সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে গত কয়েক শতাব্দী ধরে যে অস্বাভাবিক এবং অবাঞ্ছিত ব্যবধান গড়ে উঠেছে তার ফলে শিক্ষা অবাস্তব, অস্বাভাবিক এবং নিষ্ফল হয়ে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘ শিক্ষাগ্রহণের সময়টাও যেমন একদিক দিয়ে ব্যর্থ হয়ে দাঁড়ায় তেমনই আর একদিক দিয়ে অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান ও তথ্যের রাশি জীবনে বোঝাস্বরূপ হয়ে ওঠে এবং নির্বিঘ্ন চলার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

এই কারণেই সমাজ এবং বিদ্যালয়ের মধ্যে কৃত্রিম ব্যবধান দূর করে দুটির মধ্যে স্বাভাবিক যোগসূত্র স্থাপন করাটা সাম্প্রতিক শিক্ষা-সংস্কারের একটা বড় অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়েছে। আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণের মতে বিদ্যালয় হবে বৃহত্তর সমাজের প্রতিচ্ছবি বা তারই একটি ক্ষুদ্রসংস্করণ। এই প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা নীচের বৈশিষ্ট্যগুলির সন্ধান পাই।

প্রথম, বিদ্যালয়ের পরিবেশ সমাজ-ধর্মী হবে। গতানুগতিক বিদ্যালয়-গুলিতে যে পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে তা কৃত্রিম এবং অবাস্তব। সেখানে শিক্ষার্থীরা সত্যকারের সমাজ–জীবনের সন্ধান পায় না। শিক্ষার্থীরা সংখ্যায় বহু হলেও, তারা কৃত্রিম পরিবেশের জন্য সামাজিক কোন দল গঠন করতে পারে না। ফলে তাদের শিক্ষাও স্বাভাবিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয় না। বিদ্যালয়ের পরিবেশ যদি সমাজধর্মী না হয় তবে শিক্ষা দেবার জন্য শাস্তিদান, শৃঙ্খলার আরোপ, কঠোর বিধিনিষেধ প্রভৃতি অস্বাভাবিক পন্থার সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু বিদ্যালয়ের পরিবেশকে যদি সমাজধর্মী করে তোলা যায় তবে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই তাদের কর্তব্য এবং গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হবে এবং নিজেদের প্রচেষ্টাতেই শিক্ষাগ্রহণ করবে।

দ্বিতীয়, শিক্ষা হল শিশুর বাস্তব অভিজ্ঞতার সমন্বয়। বিদ্যালয়ের

অ-সামাজিক পরিবেশে শিশু যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তা কখনই বাস্তব হতে পারে না। জীবন-অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিবিড় যোগসূত্র থাকবে বিদ্যালয়ের কার্যাবলীর এবং সত্যকারের জীবনের পরিপ্রেক্ষিতেই শিশু শিখবে তার রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, কলাকৌশল সবই। অতএব বিদ্যালয়ের পরিবেশকে বাস্তব করে তুলতে হবে, করে তুলতে হবে সমাজ-ধর্মী যাতে সত্যকারের জীবনের পরিস্থিতিগুলির নিখুঁত ছবি সেখানে প্রতিফলিত হয়।

তৃতীয়, শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুতিও সত্যকারের শিক্ষার অঙ্গীভূত। কিন্তু এই জীবনের জন্য প্রস্তুতি বই পড়ে বা বক্তৃতা শুনে অর্জন করা যায় না—তা পাওয়া যায় জীবন-যাপনের মধ্য দিয়ে, প্রকৃত অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে। অতএব শিশুকে সত্যকারের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত করতে হলে তাকে জীবনের প্রয়োজনীয় কার্যগুলির সঙ্গে বাস্তব পরিচয়ের সুযোগ দিতে হবে। যে সকল জটিল সমস্যা তাকে পরিণত জীবনে সমাধান করতে হবে, যে সকল শিল্প দিয়ে তাকে ভবিষ্যতে কাজ করতে হবে, যে সকল মূল্যবান কৌশলের সাহায্যে সে তার ভবিষ্যতের জটিল পরিবেশগুলির সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করবে, বিদ্যালয়ে থাকাকালীন সে সবগুলির সঙ্গেই যাতে সে মোটামুটি পরিচিত হতে পারে তার ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

চতুর্থ, আধুনিক মানব জীবন নানা দিক দিয়ে সমাজের উপর নির্ভরশীল। তার ক্রমবিকাশ, পরিণতি, সার্থকতাবোধ সমস্তই সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে অচ্ছেদ্যরূপে জড়িয়ে গেছে। অতএব সত্যকারের সমাজধর্মী নয় এমন পরিবেশে জীবনযাপন ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। শিশুর ব্যক্তিসত্তার সমস্ত দিকগুলির বাঞ্ছিত বিকাশ পেতে হলে তার চারপাশের পরিবেশকে সামাজিক করে তুলতে হবে।

পঞ্চম, প্রত্যেকটি সক্ষম পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির সক্রিয়ভাবে শাসনব্যবস্থায় অংশ-গ্রহণ হল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর জন্য প্রয়োজন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চেতনাবোধ, দলবদ্ধভাবে কাজ করার অভ্যাস, প্রতিবেশী ও অন্যান্য নাগরিকদের প্রতি সহানুভূতি, ত্যাগস্বীকারের মনোভাব এবং সবশেষে বিধিনিষেধ মেনে চলার অভ্যাস। এই অতি প্রয়োজনীয় গুণগুলি শিক্ষার্থীর মধ্যে গড়ে তুলতে হলে তাকে এমন বাস্তব পরিবেশের মধ্যে স্থাপনা করতে হবে যাতে সে সক্রিয় অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে এগুলি শিখতে পারে। আধুনিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের দ্বারা পরিচালিত শাসনতন্ত্রের মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে

বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে থাকে। বিদ্যালয়-পরিবেশকে বৃহত্তর সমাজের একটি প্রতিচ্ছবি করে তোলাই রাষ্ট্রের সুযোগ্য নাগরিক গড়ে তোলার অপরিহার্য সোপান।

বিদ্যালয়-সমাজ—আংশিক স্বাভাবিক, আংশিক কৃত্রিম

এখন প্রশ্ন ওঠে, বিদ্যালয়-পরিবেশকে সমাজের প্রতিচ্ছবি করে তোলার একটা সীমারেখা আছে কিনা। অর্থাৎ সমাজের যেটুকু ভাল ও প্রশংসনীয় সেটুকুই বিদ্যালয়ে স্থান পাবে, না সমাজের মন্দটুকুও বিদ্যালয়-পরিবেশে প্রতিফলিত হবে। একদল শিক্ষাবিদ্ বলেন বিদ্যালয়কে সমাজের প্রতিচ্ছবি বলার মানে হল যে সমাজের যেটুকু ভাল, মহৎ ও প্রশংসনীয় সেটুকুই বিদ্যালয়ের পরিবেশে স্থান পাবে, আর যা মন্দ ও নিন্দার্হ তা সযত্নে বাদ দিতে হবে। এঁদের মতে বিদ্যালয়-সমাজ একদিক দিয়ে কিছুটা স্বাভাবিক আবার কিছুটা কৃত্রিম। সমাজের ভালটুকু বিদ্যালয়-সমাজে থাকার জন্য এই সমাজ আংশিকভাবে স্বাভাবিক; আবার সমাজের মন্দটুকু বাদ দেওয়ার জন্য বিদ্যালয়-সমাজ আংশিক-ভাবে কৃত্রিম।

অবশ্য কখনই একথা কেউ বলবেন না যে সমাজের দুর্নীতি, অনাচার এবং নিন্দার্হ প্রথাগুলি সরাসরি বিদ্যালয়ের সমাজে স্থান পাক এবং সেগুলি শিক্ষার্থীরা বাস্তবে অনুসরণ করুক। কিন্তু একথাও সত্য যে সেগুলি যদি পুরোপুরি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ঢেকে রাখা হয় তবে সমাজজীবন সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ অবাস্তব একটি ধারণা গড়ে উঠবে। অতএব যদি ভবিষ্যৎ সমাজের জন্য শিক্ষার্থীকে উপযুক্তভাবে গড়ে তুলতে হয় তবে যাতে সে সমাজের ভালটুকুর সঙ্গে সঙ্গে মন্দটুকুর সঙ্গেও পরিচিত হয় তা দেখা দরকার। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষকদের দেখা উচিত যে সে যেন মন্দকে মন্দ বলেই চিনতে শেখে এবং আলোচনা ও পরীক্ষণের মাধ্যমে সেগুলি দূর করার উপায় উদ্ভাবন করতে সচেষ্ট হয়।

বিদ্যালয়কে সমাজ-প্রতিচ্ছবি করার পন্থা

বিদ্যালয়ের পরিবেশকে যে যে উপায়ে বৃহত্তর সমাজের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণরূপে গড়ে তোলা যেতে পারে তার কতকগুলি নির্দেশ নীচে দেওয়া হল।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা সহজ সমাজ জীবন গড়ে তোলার প্রথম উপকরণ হ'ল সহানুভূতি। প্রত্যেকটি ছাত্র যেন অপরকে তার সমগোষ্ঠীভুক্ত বলে মনে করে এবং একে অপরের অনুভূতির সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। এর জন্য বিদ্যালয়ের জীবনযাত্রায় এমন কতকগুলি বস্তু প্রবর্তিত করতে হবে যা তাদের মধ্যে এই একাত্মবোধ জাগিয়ে তুলতে পারে। ছাত্রগণের সামনে বিদ্যালয়কে এমন একটি সাধারণ আদর্শ এবং কর্মপন্থার ছবি তুলে ধরতে হবে যা প্রত্যেকটি ছাত্রকে অনুপ্রাণিত করে তুলবে এবং তাদের একতার স্বত্রে বেঁধে ফেলবে। তখন তারা প্রত্যেকেই নিজেকে বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত একজন বলে গর্ব বোধ করবে এবং বিদ্যালয়-সমাজের প্রতি সাগ্রহ আনুগত্য দেখাবে। তাছাড়া বিদ্যালয়ের ঐতিহ্য, যশ, সাধারণ পরিচ্ছদ, প্রতীক, সঙ্গীত প্রভৃতিও শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই আত্মীয়তাবোধ গড়ে তুলতে প্রচুর সাহায্য করে।

বিদ্যালয়ের সমাজ জীবন গঠনের আর একটি বড় উপকরণ হল যৌথ কর্মপ্রচেষ্টা। সম্মিলিত পন্থায় কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীরা সামাজিক জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি শিখতে পারে এবং তাদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতাও স্থপরিণত হয়ে উঠে। যৌথ কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থী সহযোগিতা, স্বার্থত্যাগ, সহানুভূতি, শৃঙ্খলাবোধ, আনুগত্য প্রভৃতি স্থষ্ঠ সমাজ-জীবনের পক্ষে অপরিহার্য গুণগুলি আহরণ করতে পারে। খেলা-ধূলা, অভিনয়, বিতর্কসভা, সাহিত্যিক অধিবেশন, ভ্রমণ প্রভৃতি সহ-পাঠক্রমিক (Co-curricular) কার্যাবলী যৌথ প্রচেষ্টার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। আধুনিক বিদ্যালয়গুলিতে অনুসৃত প্রজেক্টও সমাজ-জীবন গঠনের বিশেষ সহায়ক।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে সত্যকারের সমাজ-চেতনা জাগাতে হলে বিদ্যালয়ের পরিবেশটিকে গণতান্ত্রিক করে তুলতে হবে। আধুনিক সমাজবিদ্গণের মতে গণতন্ত্রই সমাজব্যবস্থার সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। জন ডিউইর মতে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাতেই ব্যক্তি এবং সমাজ, এ দুয়ের চাহিদার মধ্যে স্থষ্ঠ সমন্বয় ঘটানো সম্ভবপর। অতএব শিক্ষার্থীদের মধ্যে যদি সত্যকারের একটা স্বাস্থ্যকর সমাজজীবন গড়ে তুলতে হয় তবে বিদ্যালয় পরিচালনায় গণতান্ত্রিক নীতিগুলির বাস্তব প্রয়োগ করতে হবে।

এর জন্য বিদ্যালয় শাসনতন্ত্রের (School Government) প্রবর্তন করতে হবে। বিদ্যালয়ের শাসনব্যবস্থা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিকল্পিত হবে এবং পরিচালনার ভার থাকবে শিক্ষার্থীদের উপর। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অনুকরণে

আধুনিক প্রগতিশীল বিদ্যালয়গুলিতে লোকসভা, আইনপরিষদ, বিচারসভা প্রভৃতি গঠন করা হয়ে থাকে এবং পুরোপুরি গণতান্ত্রিক আদর্শে ভোটদান পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিরা এই সকল পরিষদে নির্বাচিত হয়। এইভাবে নির্বাচিত ছাত্রপ্রতিনিধিরা বিভিন্ন পরিষদের মাধ্যমে বিদ্যালয় পরিচালনার বিভিন্ন কার্যগুলি যৌথপ্রচেষ্টায় সম্পন্ন করে। অনেক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অনুকরণে ছাত্রপরিচালকদের মধ্যে থেকে মুখ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী, ক্রীড়ামন্ত্রী, প্রভৃতির পদও সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলিই যে শিক্ষার্থীরা সম্পন্ন করে তা নয়, কোন ছাত্রের অপরাধের বিচার ও শাস্তিদানও তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন করে থাকে।

বিদ্যালয়ে ছাত্রপরিচালিত শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রজীবনে দীক্ষালাভ করে এবং আধুনিক সমাজ-জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে। ফলে বিদ্যালয়-পরিবেশ সত্যকারের সমাজধর্মী এবং বৃহত্তর সমাজের প্রতিচ্ছবি হয়ে দাঁড়াতে পারে।

বিদ্যালয়ে সত্যকারের সমাজজীবন গড়ে তুলতে হলে শিক্ষার্থী-শিক্ষক সম্পর্কটিকে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ ও সহানুভূতি-ভিত্তিক করে তুলতে হবে। দেখা গেছে যে চিরাচরিত শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব ও বিচ্ছিন্ন সত্তা নিয়ে শিক্ষকেরা যে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মেলামেশা করেন তা সুসংহত বিদ্যালয়-সমাজ গঠনের পথে বিরাট একটা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে থাকে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক সহজ ও স্বাভাবিক হবে এবং শিক্ষার্থীদের যৌথপ্রচেষ্টায় সহানুভূতিপূর্ণ সহায়ক রূপে শিক্ষক দেখা দেবেন, তাদের নিয়ন্ত্রক বা শাসক রূপে নয়।

বিদ্যালয়কে বৃহত্তর সমাজের সত্যকারের প্রতিরূপ করতে হলে যে সকল কার্যাবলী সমাজজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ সেগুলিকে বিদ্যালয় পরিবেশেরও অঙ্গীভূত করতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে মিলে মিশে থাকা, অতিথির প্রতি সৌজন্য দেখান, আকস্মিক বিপদ বা দুর্ঘটনায় সাধ্যমত সাহায্য করা, জনস্বাস্থ্যের নিয়ম-কানুন মেনে চলা, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করা, বৃত্তি অর্জন, সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া ইত্যাদি সুষ্ঠু সমাজজীবনের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় কাজগুলি আজকাল বিদ্যালয়েই বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে শেখান হয়ে থাকে। পাশ্চাত্যের অনেক আধুনিক স্কুলে ছেলেমেয়েদের সমাজজীবনের বিভিন্ন দিকগুলির সঙ্গে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে স্কুলের নিজস্ব পোষ্ট অফিস, ব্যাঙ্ক, খবরের কাগজ,

সমবায়-ভাণ্ডার প্রভৃতি সংগঠিত করা হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য এগুলি চালানোর সম্পূর্ণ দায়িত্ব শিক্ষার্থীরাই বহন করে থাকে।

প্রশ্নাবলী

1. We must do everything we can, to make pupils feel at home in this world, without encouraging a marked distinction between the school world and out of school world. Show that this is one of the modern trends in educational theory (B. T. 1951).

Ans. (পৃঃ ৭৯—পৃঃ ৮৭)

2. Edward Thring once wrote—"A mob of boys cannot be educated". Hence schools are needed. Discuss how a school should be organised for teaching. (B. T. 1953)

Ans. (পৃঃ ৭৯—পৃঃ ৮৭)

3. "There has been too great a tendency to regard the school as an isolated unit and education as something apart ftom the main stream of life." Discuss and suggest steps by which the big gulf between the school and the society can be bridged and education can be made real and living to the child. (B. T. 1956)

Ana. (পৃঃ ৭৯—পৃঃ ৮৭)

4. Write an essay on—"School is a Society".
(B. A. Educ. 1957, 58, 60, B. T. 1961).

Ans. (পৃঃ ৮৩—পৃঃ ৮৭)

5. Show how the functions of the schools are both conservative and progressive. (B. T. 1959)

Ans. (পৃঃ ১১—পৃঃ ১৭)

নয়

বিদ্যালয় ও ব্যক্তি (School & Individual)

ব্যক্তি নিয়েই বিদ্যালয়। তার সমস্ত পরিকল্পনা ও কর্মপ্রচেষ্টা ব্যক্তিকে ঘিরেই গড়ে ওঠে এবং তার অস্তিত্বের সার্থকতা ব্যক্তির অভীষ্ট ক্রমবিকাশের উপরই নির্ভর করে। বিদ্যালয়-রূপ কারুশালায় ব্যক্তিই হল প্রথম এবং শেষ উপাদান।

মানবশিশু যখন প্রথম পৃথিবীতে আসে তখন সে জীবনযুদ্ধের জন্য মোটেই প্রস্তুত থাকে না। সে সময় সঙ্গতিবিধানের কতকগুলি প্রাথমিক কৌশল ছাড়া তার কিছুই জানা থাকে না। অতএব তাকে যদি এই সমস্যাসঙ্কুল পৃথিবীতে অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয় তবে তাকে অনেক কিছু শিখতে হবে, অনেক কৌশল আয়ত্ত করতে হবে। আদিম যুগে শিশুকে এই প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও কৌশলগুলি শেখাবার দায়িত্ব নিয়েছিল পরিবার, ধর্মায়তন প্রভৃতি শিক্ষার মাধ্যমগুলি। কিন্তু পরিবেশের জটিলতা ও জ্ঞানের ক্রমবর্ধমান আয়তন ও বৈচিত্র্যের জন্য পরোক্ষ মাধ্যমের সাহায্যে এই প্রয়োজনীয় শিক্ষাগুলি সন্তোষজনক ভাবে শিশুকে দেওয়া আর সম্ভব হল না। ফলে সৃষ্টি হল বিদ্যালয়ের।

মানব-সমাজের যতই উন্নতি হচ্ছে, ব্যক্তির জীবনে বিদ্যালয়ের গুরুত্ব দিন দিন ততই বেড়ে যাচ্ছে। পূর্বে কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যাদানেই বিদ্যালয়ের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল। সাহিত্য, ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থ-নীতি, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্যই শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে যেত। তার জীবনের অন্যান্য দিকগুলির প্রতি বিদ্যালয় কোনরূপ গুরুত্ব বা মনোযোগ দিত না। কিন্তু শিক্ষার ব্যাপক সংজ্ঞা গ্রহণের পর থেকে বিদ্যালয়ের কর্মপরিধি বৃহত্তর হতে সুরু করল এবং বর্তমানে শিক্ষার্থীর সমগ্র জীবন-প্রচেষ্টাই শিক্ষার গণ্ডীভুক্ত হয়ে গেছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা এখন সর্বতোমুখী, শিক্ষার্থীর জীবনসত্তার অতি ক্ষুদ্রাংশকে পর্যন্ত বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে থাকে।

ব্যক্তির দিক দিয়ে বর্তমান বিদ্যালয় যে সকল বহুমুখী কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করে থাকে তার কয়েকটির উল্লেখ নীচে করা হল।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের গঠন

বিদ্যালয়ই সভ্যজীবনের জন্য অপরিহার্য সাধারণ শিক্ষার নিম্নতম মানটুকু আহরণ করতে ব্যক্তিকে সমর্থ করে। লিখন-পঠনের ক্ষমতা, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করার সর্বজনীন মাধ্যম-রূপে বিদ্যালয় সব দেশেই কাজ করে থাকে।

ব্যক্তির নিজস্ব ক্ষমতা ও আগ্রহ অনুযায়ী তার বিশেষ বিকাশ-প্রবণতাকে পূর্ণতা অর্জনে সাহায্য করাই বিদ্যালয়ের একটা বড় কাজ। প্রত্যেক ব্যক্তিই জন্মেছে একান্ত নিজস্ব কতকগুলি সম্ভাবনা নিয়ে এবং সেগুলির পূর্ণবিকাশের মাধ্যমে ব্যক্তির স্বতন্ত্রতা জন্ম নেয় এবং তার উপরেই নির্ভর করে ব্যক্তির অস্তিত্বের সার্থকতা। ব্যক্তির এই স্বতন্ত্রতাকে (individuality) বাধাহীন বিকাশের পথে পরিচালিত করে তাকে পূর্ণতা লাভে সমর্থ করাই বিদ্যালয়ের প্রধান কার্যসূচী। এর জন্যে প্রয়োজন প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত চাহিদা ও অন্তর্নিহিত সামর্থ্যের সযত্ন পর্যবেক্ষণ করা এবং তার সেই স্বাভাবিক বিকাশ-প্রবণতা অনুযায়ী অগ্রসর হবার উপযোগী সুযোগ ও পরিবেশ সৃষ্টি করা।

সামাজিকী-করণ

একদিকে যেমন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে পূর্ণতা লাভে সাহায্য করা বিদ্যালয়ের কাজ তেমনই আবার ব্যক্তিকে তার সমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলাও আধুনিক বিদ্যালয়ের কর্মসূচীর অন্তর্গত। শিশু যখন প্রথম জন্মায় তখন তার সামাজিক সচেতনতা বলে কোন বস্তু থাকে না। সে সামাজিকও নয় আবার অসামাজিকও নয়। কিন্তু পৃথিবীতে বাস করতে হলে তাকে সামাজিক হয়ে উঠতে হবে। অন্যান্য সকলের সঙ্গে মিলে মিশে এবং পরিবার, প্রতিবেশী, সমাজ ও রাষ্ট্র প্রভৃতির প্রতি কর্তব্য পালন করে তাকে জীবন কাটাতে হবে। তবেই সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি তাকে বাঁচবার সুযোগ-সুবিধাগুলি দেবে। আর তা না করলে তাকে সমাজ বহির্ভূত হয়ে বাস করতে হবে এবং সেটা প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব। শিশুকে সমাজের জন্য এই প্রস্তুত করারই নাম দেওয়া হয়েছে সামাজিকী-করণ (socialisation)।

সামাজিকী-করণের প্রাথমিক কাজগুলি অবশ্য সম্পন্ন করার দায়িত্ব পরিবারের। সেখানেই শিশু প্রথম নিজের বাইরে অপর কাউকে ভালবাসতে শেখে। এই

হল শিশুর সামাজিক হবার প্রথম ধাপ। মাকে দিয়ে এই প্রক্রিয়াটির হয় সুরু এবং ক্রমশ বাবা, ভাই, বোন এবং পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তির উপর সেই আসক্তি ছড়িয়ে পড়ে।

তারপর শিশু যত বড় হতে থাকে সকলের সঙ্গে দৈনন্দিন আদানপ্রদানের মাধ্যমে সে সামাজিকতার পাঠ গ্রহণ করে এবং ধীরে ধীরে নিজেকে সমাজের যোগ্য করে তোলে। উৎসব, মেলা, পূজা-পার্বণ প্রভৃতিও সামাজিকী-করণের অতি গুরুত্বপূর্ণ সহায়করূপে কাজ করে থাকে।

কিন্তু আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থা এতই জটিল ও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে এই সামাজিকীরণের কাজটি সুষ্ঠুভাবে প্রায়ই সম্পন্ন হয় না। পরিবার, উৎসব, অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে শিশু সামাজিকতার পূর্ণ শিক্ষা লাভ করতে পারে না। সর্বতোমুখী এবং পূর্ণাঙ্গ সামাজিক শিক্ষা শিশুকে দিতে হলে বিদ্যালয়ের মত প্রত্যক্ষ মাধ্যমের দরকার, আর দরকার অভিজ্ঞ দক্ষ শিক্ষকের। তাছাড়া ব্যক্তিজীবনের নানাপ্রকার বিচিত্র পরিবেশের সঙ্গে শিশুকে পরিচিত করা পরিবার বা অন্য কোন সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ মাধ্যমের পক্ষে সম্ভব হয় না। তার জন্য বিদ্যালয়ের মত একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজ-ব্যবস্থার প্রয়োজন যেখানে শিশু বাস্তবের সকল প্রকার পরিবেশের অভিজ্ঞতা পেতে পারে। বিদ্যালয়ের সামাজিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত যৌথকর্ম-প্রচেষ্টা, নানারকম খেলাধূলা, সম্মিলিত পরিকল্পনা, প্রজেক্ট প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে শিশু সামাজিকতার মূল্যবান শিক্ষাগুলি লাভ করে থাকে।

এ দু'য়ের মধ্যে সমন্বয়ন

অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিশুর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে পূর্ণভাবে বিকশিত করা এবং সেই সঙ্গে তার মধ্যে সামাজিকতাকে জাগিয়ে তোলা এ দুই-ই বিদ্যালয়ের কাজের অন্তর্গত। বাহ্যত এই দুটি কাজই কিন্তু পরস্পরবিরোধী বলে মনে হয় এবং কেমন করে বিদ্যালয়ের পক্ষে একই সময়ে এ দুটি কাজ করা সম্ভব হয় সে সম্বন্ধে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করলে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এ ধরনের সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক। সামাজিকতা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে যে বিরোধটা আমাদের চোখে পড়ে সেটা সম্পূর্ণ আপাত অর্থাৎ প্রকৃত নয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সুষ্ঠু ও সুষম বিকাশ একমাত্র সম্ভবপর যথার্থ সামাজিক পরিবেশেই। যে পরিবেশ প্রকৃতপক্ষে সমাজ-ধর্মী নয় সে পরিবেশে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ভারসাম্যহীন,

অস্বাস্থ্যকর ও বিপথগামী হয়ে ওঠে। ব্যক্তিসত্তার যে কোন ধরনের অসংযত ও অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধিই প্রকৃত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্ম দিতে পারে না। ব্যক্তি-সম্ভাবনার অসম স্ফীতি ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এক কথা নয়।

একমাত্র প্রকৃত সমাজ-ধর্মী পরিবেশেই ব্যক্তি-সম্ভাবনাগুলি তাদের বাঞ্ছিত পথ ধরে এগোতে পারে এবং সমাজের নির্দেশ ও সহযোগিতায় অভীষ্ট পূর্ণতায় গিয়ে পৌছতে পারে। প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক অ্যারিষ্টট্‌ল্ মানুষকে সামাজিক প্রাণী বলে বর্ণনা করেছেন। কথাটি খুব সহজ ও সাধারণ শোনালেও এর মধ্যে একটা অতি গভীর সত্য নিহিত আছে। অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের সব চেয়ে বড় পার্থক্য হল যে মানুষ সমাজে থেকেই মানুষ হতে পেরেছে। মানুষের মানুষ হিসাবে অস্তিত্ব সমাজের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত। অতএব মানুষের ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ ও কাম্য বিকাশ সমাজের বাইরে হতে পারে না, একমাত্র সমাজের মধ্যে থেকেই তা ঘটতে পারে।

তার উপায়

অতএব শিশুর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও সামাজিকতা এই দুইই একসঙ্গে গড়ে তোলা বিদ্যালয়ের পক্ষে সত্যকারের সমস্যা নয়। বরং উপযুক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষাকার্যকে নিয়ন্ত্রিত করলে এ দুটি বৈশিষ্ট্যই স্বাভাবিকভাবে শিশুর মধ্যে গড়ে উঠতে পারে।

প্রথমত বিদ্যালয়ের পরিবেশকে প্রকৃত সমাজধর্মী করে তুলতে হবে যাতে শিক্ষার্থী সেই সমাজের একজন হয়ে বাস করে প্রয়োজনীয় সামাজিক গুণগুলি অর্জন করতে পারে এবং সেই সঙ্গে তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলির পূর্ণ ও সুষম বিকাশের পথ খুঁজে পেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, পর্যাপ্ত যৌথ কর্মপ্রচেষ্টা পাঠক্রমের অঙ্গীভূত হবে। খেলাধূলা, দলগত উদ্যোগ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সমাজ-কল্যাণকর কাজকর্ম, ভ্রমণ, প্রজেক্ট ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বিকাশ-প্রচেষ্টা যেমন পরিণতি লাভ করে তেমনই তার মধ্যে সহযোগিতা, সহানুভূতি, ভ্রাতৃত্ববোধ, স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি মূল্যবান সামাজিক গুণগুলি গড়ে ওঠে।

তৃতীয়ত, বিদ্যালয়-শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে রাষ্ট্রীয় সচেতনতা জাগিয়ে তুলতে হবে ও গণতান্ত্রিক আদর্শে তাকে অনুপ্রাণিত করতে হবে। একমাত্র

গণতান্ত্রিক চিন্তাধারাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ এবং সামাজিক চেতনার মধ্যে প্রকৃত সমন্বয় সাধন করতে পারে এবং শিক্ষার্থীকে গণতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে স্বাভাবিকভাবেই তার ব্যক্তির চাহিদা ও সামাজিক চাহিদা ঐক্য ও সহযোগিতার পথ খুঁজে নেবে।

চতুর্থত, সমগ্র মানব জাতির বহু যুগের ঐতিহ্য ও মানব-সভ্যতার অকল্পনীয় অগ্রগতি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর মধ্যে গৌরববোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। সত্যকারের সামাজিক চেতনা নিজের দল, গোষ্ঠী বা জাতির সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিশ্বের সমস্ত মানবের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধই প্রকৃত সামাজিকতার ভিত্তি। অতএব শিক্ষার্থীর মধ্যে আন্তর্জাতিক ঐক্যবোধ ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব জাগিয়ে তোলা সুষম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য গঠনের অপরিহার্য উপাদান।

আধুনিক বিদ্যালয় আজ কেবলমাত্র জ্ঞান পরিবেশনের বিপণি নয়, শিক্ষার্থীর সর্বতোমুখী বিকাশের প্রধান মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিশুর দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভঘটিত—সমস্ত দিকগুলির সুষম বিকাশের সহায়ক ও উপযোগী পরিবেশ তৈরী করা বিদ্যালয়ের প্রধান কাজ। শিক্ষার্থীর দৈহিক বৃদ্ধি, সামাজিক বিচারবুদ্ধির বিকাশ, প্রক্ষোভের সুসমন্বয়ন, নৈতিক মানের সংগঠন, মানসিক উৎকর্ষ সাধন, সৌন্দর্যবোধের পুষ্টিসাধন, সৃজনপ্রবণতার ক্রমবিকাশ এ সকল দায়িত্বই আজ বিদ্যালয়ের উপর। এমন কি শিক্ষার্থীর মনন-ক্ষমতার সুসংযত উন্নতি, তার কল্পনা-শক্তির পূর্ণ বিকাশ এবং তার নিজস্ব জীবন-দর্শন গঠনে সাহায্য করাটাও আধুনিক বিদ্যালয়ের কাজের অন্তর্গত।

সুপরিচালন ও সুমন্ত্রণ

ব্যক্তির জীবনে বিদ্যালয়ের আর একটি বড় কাজ হচ্ছে যে সুপরিচালনা ও সুমন্ত্রণের (Guidance and Counselling) সাহায্যে তাকে তার অভীষ্ট পূর্ণ-বিকাশের পথে নিয়ে যাওয়া। এই সুপরিচালনাকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায়, শিক্ষাগত (educational) এবং বৃত্তিগত (vocational)। শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে শিক্ষার কোন্ পথ অনুসরণ করবে, কি ভাবে তার শিক্ষা-পরিকল্পনাকে নিয়ন্ত্রিত করবে, কোন্ ধরনের শিক্ষা তার রুচি ও সামর্থ্যের দিক দিয়ে যোগ্য হবে, এই সকল মূল্যবান নির্দেশ আজকাল বিদ্যালয়ই দিয়ে থাকে। বৃত্তিমূলক সুপরিচালনাও বিদ্যালয়ের কাজের অন্তর্গত। শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও

সামর্থ্য অনুযায়ী কোন্ বৃত্তি তার ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে উপযোগী এ সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া এবং সম্ভব হলে সেই বৃত্তির সঙ্গে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমেই শিক্ষার্থীর সঙ্গে পরিচয় ঘটানও আধুনিক বিদ্যালয়ের কর্মধারার অন্তর্গত।

বর্তমানে অবশ্য শিশু পরিচালনার কাজ (Child Guidance) কেবলমাত্র শিক্ষা এবং বৃত্তি সম্বন্ধে নির্দেশদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সুপরিচালনা এখন শিশুর অস্তিত্বের প্রত্যেকটি অংশকেই স্পর্শ করে এবং তার সমগ্র বিকাশ-প্রচেষ্টাকে বাঞ্ছিত পথে পরিচালিত করে অভীষ্ট পূর্ণতায় পৌছতে তাকে সাহায্য করে।

প্রশ্নাবলী

1. "The idea that a main function of the school is to socialise its pupils in no wise contradicts the view that its true aim is to cultivate individualtiy". Do you agree? Give reasons for your answer. (B.A. 1955, B. T. 1958)

Ans. (পৃঃ ৮৯—পৃঃ ৯৪)

2. Show how can a modern school foster individuality in the child and develop at the same time the essential social virtues in him.

Ans. (পৃঃ ৮৯—পৃঃ ৯৪)

দশ

শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা (Freedom & Discipline)

শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করতে গিয়ে শিক্ষককে প্রায়ই নানা পরস্পরবিরোধী ভাবধারার সম্মুখীন হতে হয়। এই ভাবঘটিত দ্বন্দ্বের মীমাংসা করতে না পারলে শিক্ষাকার্যের সুষ্ঠু নির্বাহই সম্ভব হয়ে ওঠে না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং সমাজতন্ত্র-বাদের বিরোধিতার মধ্যে আমরা এই রকম একটি দ্বন্দ্বের সন্ধান পেয়েছি। বিদ্যালয় এবং সমাজের ব্যবধানও এই ধরনের ভাবমূলক আর একটি দ্বন্দ্বের দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছে। আমরা এও দেখেছি যে এ দুটি ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব নিছক বাহ্যিক, কল্পিত এবং ভ্রান্তি-প্রসূত। মূলত এদের মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এই রকম আর একটি ভাবমূলক দ্বন্দ্বের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতার প্রচলিত ধারণারি মধ্যে। এই দ্বন্দ্ব এতই পরিস্ফুট ও গুরুত্বপূর্ণ যে এদের যথাযথ মীমাংসা করতে না পারলে শিক্ষাকার্যের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। অতএব শিক্ষাকার্য স্বুরু করার আগেই প্রয়োজন এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটির সন্তোষজনক সমাধান।

শিক্ষায় শৃঙ্খলার স্থান

একথা অনেকটা নিঃসন্দেহে বলা চলতে পারে যে পৃথিবীর প্রথম শিক্ষক যেদিন প্রথম শিক্ষা দিতে স্বুরু করেন ঠিক সেদিনই তিনি শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন। শিক্ষাকে আমরা আচরণের পরিবর্তন বলে বর্ণনা করেছি। পুরোনো আচরণের জায়গায় নতুন আচরণ আয়ত্ত করাই শিক্ষা। এর জন্য যেমন একদিকে দরকার শিক্ষকের যথাযথ অধ্যাপনা, তেমনই শিক্ষার্থীর তরফ থেকেও দরকার অনেকগুলি সর্তের পূরণ। একাগ্রতা, অভিনিবেশ, আনুগত্য, নিয়মানু-বর্তিতা প্রভৃতি গুণগুলি যদি শিক্ষার্থী না দেখাতে পারে তবে তার পক্ষে পাঠগ্রহণ করা সম্ভব হয় না। যে শিক্ষার্থী মনোযোগ দিয়ে পাঠ শোনে না, বা শিক্ষকের

নির্দেশ মেনে চলে না বা নিয়ম অনুযায়ী পাঠ অভ্যাস করে না তার পক্ষে শিক্ষালাভ সম্ভব হয় না। অতএব শিক্ষাকে কার্যকরী করে তুলতে হলে শিক্ষার্থীর যাতে এই গুণগুলি থাকে তা দেখাই সর্বপ্রথমে দরকার। একেই এক কথায় শৃঙ্খলা বলা হয় এবং শিক্ষাকার্যকে সার্থক করে তুলতে হলে যে শৃঙ্খলা অপরিহার্য এ কথা সকল শিক্ষাবিদই স্বীকার করে এসেছেন এবং করবেনও।

কিন্তু প্রশ্ন হল কেমন করে সে শৃঙ্খলার সৃষ্টি করা যায় এবং কেমন করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আনুগত্য, মনোযোগ, শ্রমশীলতা প্রভৃতি আনা যায়?

'প্রথম পাপের মতবাদ

প্রথমেই এই প্রসঙ্গে যে মতবাদটির উল্লেখ করতে হয় তাকে আমরা 'প্রথম পাপের' মতবাদ বলে বর্ণনা করতে পারি। বাইবেলে গল্প আছে যে মানুষের আদিমতম পূর্বপুরুষ আদাম এবং ইভ ঈশ্বরের নিষেধ না শুনে জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খেয়ে স্বর্গ থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন এবং তাদের সেই 'প্রথম পাপের' (original sin) এর জন্য আজও মানুষকে দুর্দশাগ্রস্ত জীবন কাটাতে হচ্ছে। আদাম ইভের সেই পাপের প্রবৃত্তি প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই নিহিত আছে। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা হল যে প্রত্যেক শিশুই জন্মায় অসদ্ মনোবৃত্তি নিয়ে। অতএব তাকে সুপথে আনার জন্য প্রয়োজন কঠোর শাসন ও নির্মম নিয়ন্ত্রণ। শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণে কোন স্বাভাবিক প্রবণতা নেই। তাকে শিক্ষা দিতে হলে তার মধ্যে কঠোর শৃঙ্খলা আনতে হবে এবং তার জন্য শাসন, শাস্তিদান, সতর্ক পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি অত্যাবশ্যক।

ভারতেরও প্রাচীন শিক্ষাবিদগণও যদিও ঐ ধরনের কোন কাহিনীতে বিশ্বাসী ছিলেন না তবুও তাঁদের মত অনেকটা একই প্রকৃতির। মানুষের প্রবৃত্তি বহির্মুখী। তার মন সমেত পাঁচটি ইন্দ্রিয় হল তার ছয়টি কঠিন রিপু। এরা সর্বদাই তাকে বিপথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কঠোর আত্মসংযম, ইন্দ্রিয়-দমন, নিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতির সাহায্যেই সে অভীষ্ট পথে চলতে পারে। ভারতীয় দর্শনে কামনার বিসর্জন, ইন্দ্রিয়-জয় প্রভৃতিকে মুক্তিলাভের পন্থা বলে বর্ণনা করা হয়েছে অতএব শিশুকে শিক্ষা দিতে গেলে কঠোর শাসনে রাখতে হবে এবং কঠিন হাতে তার কুপ্রবৃত্তিগুলিকে দমন করতে হবে। এইজন্য শিক্ষা গ্রহণের সময় প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ব্রহ্মচর্য অভ্যাস করতে হত।

অতএব দেখা যাচ্ছে কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে উভয় দেশেই শৃঙ্খলার সঙ্গে কঠোর শাসন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে। সর্বত্রই মনে করা হত যে শিক্ষায় যদি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হয় তবে শিক্ষার্থীর আচরণকে কঠিন হাতে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। তাকে যদি কোনরূপ প্রশ্রয় দেওয়া হয় বা শাসনের মুষ্টি যদি একটু শিথিল করা হয় তবে সে তৎক্ষণাৎ পাঠে অমনোযোগী হবে এবং তার অনুশীলন ব্যাহত হবে।

এইজন্য তৈরী হল অসংখ্য বিধিনিষেধ, রাশি রাশি আইন-কানুন। কঠোর অনুশাসনের নাগপাশে শিক্ষার্থীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা হল। বিশেষ করে বিদ্যালয় জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে অসংখ্য বিধি-নিষেধের দ্বারা কঠিনভাবে নিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থা করা হল। বিদ্যালয়ে কখন আসতে হবে, কখন কি পড়তে হবে, কখন ছুটি হবে, বিদ্যালয়ে কি ভাবে আচরণ করতে হবে, এমন কি, কি পোষাক পরে বিদ্যালয়ে আসতে হবে ইত্যাদি শিক্ষার্থীর সকল রকম আচরণই আইনকানুনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে সুরু হল। ক্লাসে শান্ত হয়ে বসে থাকতে হবে, গোলমাল করা চলবে না, শিক্ষকের অনুগত হতে হবে, তিনি যা নির্দেশ দেবেন তা পালন করতে হবে এই রকম হাজার অনুশাসন শিক্ষার্থীর উপর চাপিয়ে দেওয়া হল। এক কথায় শিক্ষার্থীর চারপাশে কঠিন বিধি-নিষেধের অভেদ্য পাঁচিল তুলে দেওয়া হল, যাতে শিক্ষার্থীর অবাধ্য মন অসতর্ক মুহূর্তে ছুটে বিপথে চলে না যেতে পারে। এইভাবে বিদ্যালয়ের কার্য চালানর জন্য অপরিহার্য যে শৃঙ্খলা তা রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হল।

কৃত্রিম শৃঙ্খলার বাঁধনটিকে আরও দৃঢ় করার জন্য প্রবর্তিত করা হল শাস্তি-পুরস্কার দানের প্রথা। যারা শৃঙ্খলার নিয়মকানুন ভাঙত তারা কঠোর শাস্তি পেত, আর যারা নিষ্ঠার সঙ্গে সেগুলি পালন করত তারা পেত পুরস্কার। দেখতে দেখতে শৃঙ্খলারক্ষার সঙ্গে শাস্তিদানের প্রথা অতি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে গেল এবং এমন একদিন এল যেদিন শিশুপালন এবং শিশুর শিক্ষাদানে শাস্তি দেওয়াটা একটা বড় অঙ্গ হয়ে উঠল। চাণক্যের নীতিতে ১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুকে তাড়না করার নির্দেশ দেওয়া আছে। ইংরেজীতে একটা কথাই চলতি আছে যে যদি শাস্তি না দাও তবে শিশু নষ্ট হয়ে যাবে (Spare the rod and spoil the child)। শিক্ষায় শাস্তির ব্যবহার এতই বেড়ে উঠল যে নানা বিভিন্নরূপ শাস্তি উদ্ভাবিত হতে সুরু হল, যেগুলি নিষ্ঠুরতা ও বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে সত্যই চমকপ্রদ। নিন্দা, উপহাস, ভ্রূকুটি থেকে সুরু করে নির্মমভাবে দৈহিক নির্যাতন

শিক্ষার ক্ষেত্রে শাস্তির পর্যায়ে বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। তেমনই আবার শিক্ষকের প্রশংসা থেকে সুরু করে আর্থিক সাহায্যদানও বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষায় পুরস্কার রূপে সব দেশেই প্রচলিত আছে। 'শাস্তি ও পুরস্কার' পর্যায়ে এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা পাওয়া যাবে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে সার্থক করে তুলতে হলে দরকার শৃঙ্খলারক্ষার এবং সেই শৃঙ্খলারক্ষার জন্য প্রায় আদিমকাল থেকেই সব দেশের বিদ্যালয়েই কঠোর শাস্তি ও শাসনের সাহায্য নেওয়া হয়ে এসেছে।

শিক্ষায় স্বাধীনতার স্থান

শিক্ষাপদ্ধতির সাফল্যের জন্য যেমন শৃঙ্খলা অপরিহার্য তেমনই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করতে হলে প্রয়োজন স্বাধীনতার।

সার্থক শিক্ষার জন্য যে শিক্ষার্থীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া একান্ত আবশ্যক এ সত্য বহুদিন হতেই বহু শিক্ষাবিদই বলে এসেছেন। কিন্তু বস্তুত বিংশ শতাব্দীর আগে এ কথাটির প্রকৃত গুরুত্ব কোন শিক্ষকই ভাল করে উপলব্ধি করেন নি এবং বাস্তবে এর কোন প্রয়োগও সেইজন্য দেখা যায়নি। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিষ্টটল, রোমান শিক্ষক কুইন্টিলিয়ান, ব্রিটিশ দার্শনিক কমেনিয়াস প্রভৃতি শিশু-স্বাধীনতার পোষকতা করে গেছেন। কিন্তু প্রথম যিনি পরিষ্কার ভাষায় দ্বিধাহীন কণ্ঠে শিশুকে স্বাধীনতা দেবার প্রস্তাব করে গেছেন তিনি হলেন ফরাসী দার্শনিক রুশো। তাঁর ভাষায় শিশুকে ছেড়ে দাও, সে তার যা খুসী করুক। রুশো বহুকালের প্রচলিত 'প্রথম পাপে'র মতবাদটির তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং বলেন যে শিশু যখন জন্মায় তখন, কোন রকম কু-প্রবৃত্তি বা মন্দ প্রবণতা নিয়ে জন্মায় না। তার মন তখন নির্মলই থাকে বরং সমাজের দুর্নীতির সংস্পর্শে এসেই শিশুর মন কলুষিত হয়ে যায়। তাঁর এমিল বইতে এমিলের জন্য পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থায় সবচেয়ে বড় কথা হল এমিলের সর্ববিষয়ে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা। বিংশ-শতাব্দীর প্রগতিশীল শিক্ষানায়কগণ রুশোর প্রচারিত এই শিশু-স্বাধীনতার আদর্শটি মনে প্রাণে গ্রহণ করেন এবং তাঁদের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় যতটা সম্ভব তাকে রূপ দেবার চেষ্টা করেন। রুশোকে সেইজন্য আমরা শিশু-স্বাধীনতার জনক বলতে পারি, যেমন বিংশশতাব্দীকে শিশু আবিষ্কারের যুগ বলা চলতে পারে। বস্তুত বিংশশতাব্দীর আগে শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর স্থান ছিল নগণ্যতম এবং শিশুর

ব্যক্তিসত্তার নিজস্বতাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করা হয়েছিল। বিংশ-শতাব্দীতেই শিশুর ব্যক্তিত্বের দাবী প্রথম স্বীকার করা হয়। আধুনিক শিক্ষা-সংস্কার আন্দোলনের প্রথম ও প্রধানতম অঙ্গ হল শিশুকে স্বাধীনতা দেবার প্রস্তাব। এইজন্যই নতুন শিক্ষাব্যবস্থার নাম দেওয়া হয়েছে শিশুকেন্দ্রিক।

শিক্ষায় কেন শিক্ষার্থীকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে তার সমর্থনে দ্বিবিধ যুক্তি দেওয়া যেতে পারে, দর্শনশাস্ত্রমূলক ও মনোবিজ্ঞানমূলক।

দর্শনের দিক দিয়ে শিশুকে তার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দেবার জন্য দিতে হবে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। শিশুর মধ্যে সুপ্ত ও অপ্রকাশিত হয়ে রয়েছে তার আত্মার পূর্ণ পরিণতি। এই অপ্রকাশিত আত্মাকে ব্যক্ত করতে হলে তাকে দিতে হবে সর্ববিধ আচরণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। এই স্বাধীন সক্রিয়তার নাম দেওয়া হয়েছে আত্ম-সক্রিয়তা। খেলাকে এই ধরনের একটা আত্ম-সক্রিয়তার রূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং খেলার মাধ্যমে শিশুর আত্মা যে স্বাভাবিক বিকাশের পথে এগিয়ে যায় একথা সকল শিক্ষাবিদই আজ স্বীকার করেন। এ যুক্তিতেই ফ্রয়েবেলের প্রবর্তিত কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে খেলার এত প্রাধান্য এবং আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে খেলাকে একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিশুর পূর্ণ বিকাশ নির্ভর করছে তার স্বাধীনতার উপর। তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার অর্থ হল তার সুষ্ঠু বিকাশকে ক্ষুণ্ণ করা। এই থেকেই জন্মলাভ করেছে শিশুর বিকাশকে গাছের বৃদ্ধির সঙ্গে তুলনা করার প্রথা। একটা গাছের পূর্ণ বৃদ্ধির জন্য যেমন তাকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে হবে তেমনই একটি শিশুর পূর্ণ বিকাশের জন্য তাকে দিতে হবে অবাধিত স্বাধীনতা। ফ্রয়েবেলের কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির মূল কথা এইটিই।

স্বাধীনতার স্বপক্ষে দর্শন-ভিত্তিক এই যুক্তিটি ভাববাদী শিক্ষাবিদগণের দেওয়া। কমেনিয়াস, ফ্রয়েবেল, পেষ্টালৎসি, মণ্টেসরী, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী প্রভৃতি ভাববাদী শিক্ষকেরা তাঁদের উদ্ভাবিত শিক্ষাব্যবস্থায় এই যুক্তির বলেই শিশু-স্বাধীনতার প্রবর্তন করে গেছেন।

মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে শিশু স্বাধীনতার স্বপক্ষে যুক্তি আরও জোরালো। শিক্ষার প্রধানতম লক্ষ্য শিশুর বিকাশপ্রচেষ্টার পূর্ণ পরিণতি ঘটান। শিশু কতক-গুলি সহজাত সম্ভাবনা নিয়ে জন্মায়, যেগুলির পূর্ণ বিকাশেই তার অস্তিত্বের সার্থকতা, তার জীবন-প্রয়াসের অভীষ্ট পরিণতি। যদি কোন কারণে এই প্রকৃতি-দত্ত গুণগুলির অভীষ্ট বিকাশ না ঘটে তবে শিশুর ব্যক্তিসত্তা হয়ে উঠবে অসম্পূর্ণ

ও অসুস্থ। তার নিজের দিক দিয়ে যেমন সে তার স্বাভাবিক বিকাশ প্রচেষ্টার পূর্ণ পরিণতিতে পৌঁছতে পারবে না তেমনই সমাজের দিক দিয়েও সে যৌথ জীবনযাপনের অনুপযোগী বলে প্রমাণিত হবে। অতএব একটা কথা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধিপ্রচেষ্টায় কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করার অর্থই হল শিশুর পূর্ণ বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ান।

শিশুর ইচ্ছা, আগ্রহ, সমস্তই তার অন্তর্নিহিত বৃদ্ধি প্রচেষ্টার সঙ্গে সুসংহতভাবে সঙ্গতিবদ্ধ। অর্থাৎ এগুলি জন্মলাভ করে তার বৃদ্ধিপ্রচেষ্টাকে তার ঈপ্সীত লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার জন্য। অতএব শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে যদি সুষ্ঠু ও সার্থক করে তুলতে হয় তবে শিক্ষাপ্রক্রিয়া নিশ্চয়ই শিশুর আগ্রহ, ইচ্ছা ও আত্মসক্রিয়তার গতিপথকেই অনুসরণ করবে। এক কথায় বলা যেতে পারে যে শিক্ষার ব্যাপারে শিশুকে দিতে হবে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। কোনরূপ বাইরের হস্তক্ষেপ তার বিকাশ-প্রয়াসের মধ্যে এসে অনধিকার চর্চা করবে না। আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাবিদেরা এই মনোবৈজ্ঞানিক যুক্তির জন্যই শিশুকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেবার পক্ষপাতী। কর্ণেল পার্কার, জন ডিউই, কিল্‌প্যাট্রিক, পার্কহার্ষ্ট (ডাল্টন প্ল্যান) প্রভৃতি আধুনিক শিক্ষাবিদগণ তাঁদের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় এই মনোবৈজ্ঞানিক কারণেই শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে কি দর্শনের দিক দিয়ে কি মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ-প্রচেষ্টাকে পূর্ণতায় পৌঁছতে সাহায্য করার জন্যই দরকার স্বাধীনতার।

শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতার দ্বন্দ্ব

তাহলে দেখা যাচ্ছে শিক্ষার পদ্ধতিকে সার্থক করে তুলতে যেমন দরকার শৃঙ্খলার, তেমনই শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তুলতে দরকার স্বাধীনতার। অথচ এ দুইয়ের মধ্যে একটা পরিষ্কার দ্বন্দ্ব আমাদের চোখে পড়ে। শৃঙ্খলার অর্থই হল কোন-না-কোনরূপ স্বাধীনতার সঙ্কোচন। ব্যক্তির স্বাধীন আচরণকে কোনরূপ খর্ব বা নিয়ন্ত্রিত করার নামই শৃঙ্খলা। এইজন্যই শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতার মধ্যে একটা আপাতবিরোধ স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যায়। আবার এটাও আমরা দেখলাম যে শিক্ষার সার্থক অনুষ্ঠিতির জন্য উভয়েরই সাহায্য অপরিহার্য। এই দুই পরস্পরবিরোধী ভাবধারার দ্বন্দ্ব শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে এবং এর একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ মীমাংসা শিক্ষার সুচারু সম্পাদনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

এ দ্বন্দ্ব বাহ্যিক

কিন্তু বস্তুত এ বিভ্রান্তি অমূলক। প্রকৃত শৃঙ্খলা এবং প্রকৃত স্বাধীনতার মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই। শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব আমাদের চোখে পড়ে সেটি সম্পূর্ণ বাহ্যিক এবং এঁদের সম্বন্ধে ভুল ধারণা থেকেই এই দ্বন্দ্বের জন্ম।

অন্তর্জাত ও বহির্জাত শৃঙ্খলা

তবে প্রকৃত শৃঙ্খলা কাকে বলে? শিক্ষাবিদেরা শৃঙ্খলাকে দু-শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, অন্তর্জাত শৃঙ্খলা (internal discipline) এবং বহির্জাত শৃঙ্খলা (external discipline)। কোন কিছু করার সময় যখন ব্যক্তি স্বতঃপ্রণোদিত-ভাবে শৃঙ্খলার নিয়মকানুনগুলো মেনে চলে, কারও প্ররোচনা বা শাসন ছাড়াই যখন সে কাজটিতে মনোযোগ দেয়, কাজটির সুষ্ঠু সমাধানের জন্য আবশ্যকীয় নির্দেশগুলি নিজে থেকেই যখন সে পালন করে এবং নিজেই পরিস্থিতির প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী নিজের উপর বিধিনিষেধের অনুশাসন চাপিয়ে দেয় তখন তাকে অন্তর্জাত শৃঙ্খলা বলা হয়। অন্তর্জাত শৃঙ্খলায় বিদ্যালয়, শিক্ষক, পরিচালক প্রভৃতি বহিস্থ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোন হস্তক্ষেপ থাকে না। পরিস্থিতির তাগাদায় ব্যক্তির মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে শৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং ব্যক্তি মুহূর্তের জন্যও ভাবে না যে তার উপর কোন চাপ বা বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বহির্জাত শৃঙ্খলায় কিন্তু বিপরীতটি ঘটে। শৃঙ্খলা ব্যক্তির ভিতর থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে আসে না। কাজটি সমাধান করার জন্য মনোযোগ, একাগ্রতা, আনুগত্য, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি স্বাভাবিকভাবে ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায় না বলেই নিয়মকানুন, বিধিনিষেধ, শাস্তির ভয়, পুরস্কারের লোভ প্রভৃতির সাহায্যে ঐগুলি ব্যক্তির কাছ থেকে জোর করে আদায় করা হয়। স্পষ্টতই ব্যক্তি কাজটি সমাধান করার জন্য কোন স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধ করে না কিন্তু বাইরের চাপে বাধ্য হয়ে সে কাজটি সমাধান করে।

অন্তর্জাত শৃঙ্খলা এবং ব্যক্তির স্বাধীনতার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা সেখানে ব্যক্তি শৃঙ্খলার নিয়মকানুন মেনে চলে নিজের আগ্রহ বা ইচ্ছার তাগাদায়, কোন বাইরের শক্তির চাপে নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে

যে যখন কোন চিত্রকর একটি নতুন ছবি আঁকেন, বা কোন সুরকার যখন কোন নতুন সুরের সৃষ্টি করেন তখন তাঁরা স্বতঃপ্রণোদিত ভাবেই শৃঙ্খলার নিয়মকানুনগুলি মেনে চলেন। চিত্রকরের তুলির টান, রঙের মিশ্রণ, অঙ্কনের ভঙ্গী, এ সমস্তই শৃঙ্খলার কঠিন নিয়মকানুনকে অনুসরণ করে। তেমনই আবার সুরকারের ক্ষেত্রে তাল, লয়, মাত্রা প্রভৃতির সঙ্গে সংহতি রেখে নতুন রাগিণীর সৃষ্টি ও শৃঙ্খলার নিয়মকানুন মেনে চলে এবং এর কোনটাই বিশৃঙ্খলা বা অনিয়ন্ত্রিত প্রচেষ্টা থেকে জন্মাতে পারে না। এই আত্ম-নিয়ন্ত্রণ বা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে নিজে প্রচেষ্টা করাটাই অন্তর্জাত শৃঙ্খলার দৃষ্টান্ত। আবার এই অন্তঃশৃঙ্খলার সঙ্গে স্বাধীনতার কোনরূপ বিবাদ নেই, থাকতে পারে না। কেননা চিত্রকর যখন নতুন ছবি আঁকেন বা সুরকার যখন নতুন সুর তৈরী করেন তখন তাঁরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেন। তাঁদের আচরণের উপর কোনরূপ সঙ্কোচন কোন দিক দিয়ে দেওয়া হয় না, তা যদি দেওয়া হত তাহলে তাঁরা কখনই নিজেদের কল্পনাকে ওভাবে বাস্তবে রূপ দিতে পারতেন না। শিল্পী যখন নতুন কিছু সৃষ্টি করেন তখন তাঁর আচরণ সমস্ত বাহ্যিক বিধিনিষেধের উপরে, পূর্ণ স্বাধীন এবং নিয়ন্ত্রণাতীত। নতুবা নতুন জিনিষের সৃষ্টি তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না।

অতএব দেখা যাচ্ছে অন্তর্জাত শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতা এ দুটি পরস্পরের প্রতিবন্ধক ত নয়ই, বরং পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। কোন নতুন বস্তু বা ভাব সৃষ্টি করতে হলে বা গঠনমূলক কিছু করতে হলে বা শিল্পীর কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করতে হলে একদিকে যেমন চাই স্বাধীন কাজ করার ক্ষমতা তেমনই চাই আত্ম-নিয়ন্ত্রণ বা অন্তর্জাত শৃঙ্খলা। এ দুয়ের সুষম মিলনেই সত্যকারের সৃষ্টি পৃথিবীর আলো দেখতে পায়।

যেখানে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ নেই, অথচ স্বাধীনতা আছে সেটি আবার সত্যকারের স্বাধীনতা নয়—তা হল স্বাধীনতার বিকৃত রূপ, তার নাম স্বেচ্ছাচার। স্বেচ্ছাচার কখনও কোন গঠনমূলক কাজ করতে পারে না। স্বেচ্ছাচার অপচয় ও ধ্বংসের পরিসাধক মাত্র।

তেমনই কেবলমাত্র শৃঙ্খলা আছে, অথচ স্বাধীনতা নেই, তাও আবার সত্যকারের শৃঙ্খলা নয়। সে শৃঙ্খলা বহির্জাত—অতএব তা শৃঙ্খলার বিকৃতরূপ। তাকে প্রকৃত শৃঙ্খলা বলা চলে না, সে হল শৃঙ্খল। জেলখানার কয়েদী বা কন্‌সেণ্ট্রেসান ক্যাম্পের বন্দীদের মধ্যে যে শৃঙ্খলা দেখা যায় সেটা শৃঙ্খলা নয়, সেখানে বেয়নেটের খোঁচা বা বন্দুকের ভয় দেখিয়ে শৃঙ্খলা বজায় রাখা হয়।

অতএব সেটা দাসত্বেরই নামান্তর। তেমনই বিদ্যালয়ে চোখ রাঙিয়ে বা বেত নাচিয়ে যে শৃঙ্খলা রাখা হয় তাও এক ধরনের দাসত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়।

খেলাও এই ধরনের একটা আচরণ যাতে অন্তঃশৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতা পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। নিবিষ্টমনে খেলায় রত একটি শিশুকে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাব যে কি ভাবে শিশুটি নিজে থেকেই নিজের উপর শৃঙ্খলার নানা নিয়মকানুন চাপিয়ে দিয়েছে এবং বাইরের কারও চাপ বা প্ররোচনা ছাড়াই কেমন সানন্দে সেই নিয়মগুলো সে মেনে চলেছে। অথচ তার স্বাধীনতা রয়েছে অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত। কেউই তার কোন আচরণে বাধা দিচ্ছে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে খেলা হল এমন আচরণ যেখানে শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতা পরস্পরের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। এইজন্যই খেলার শিক্ষামূলক সম্ভাবনা অতি প্রচুর। খেলায় শিশুর আগ্রহ ও উন্মুখতা স্বাভাবিক এবং স্বতস্ফূর্ত। খেলার মধ্যে দিয়ে শিশুর সত্তা পূর্ণ ও অব্যাহত বিকাশের সুযোগ পায়। আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতা এ দুইয়ের সমন্বয়ের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল খেলা।

অতএব ওপরের আলোচনা থেকে আমরা নীচের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে আসতে পারি।

প্রথমত, প্রকৃত শৃঙ্খলা হল অন্তর্জাত শৃঙ্খলা বা আত্ম-নিয়ন্ত্রণ। এই শৃঙ্খলায় ব্যক্তি স্বতপ্রণোদিতভাবে কার্যের সুষ্ঠু সমাধানের জন্য অপরিহার্য শৃঙ্খলার বিধি-নিষেধগুলি মেনে চলে।

দ্বিতীয়ত, অন্তর্জাত শৃঙ্খলার সঙ্গে স্বাধীনতার কোন বিবাদ নেই। বরং প্রত্যেক সৃজনমূলক কাজের পিছনেই আছে এ দুয়ের পারস্পরিক সহযোগিতা।

তৃতীয়ত, খেলাও এক ধরনের আচরণ যেখানে অন্তর্জাত শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা অভিন্ন হয়ে গেছে।

চতুর্থত, বহিঃর্জাত শৃঙ্খলা বন্ধন বা দাসত্বের নামান্তর। এখানে ব্যক্তির উপর বহিস্থিত শক্তির চাপ দিয়ে তাকে শৃঙ্খলার নিয়মকানুন মানতে বাধ্য করা হয়। সেইরকম আত্ম-নিয়ন্ত্রণবিহীন স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচার বৈ আর কিছু নয়।

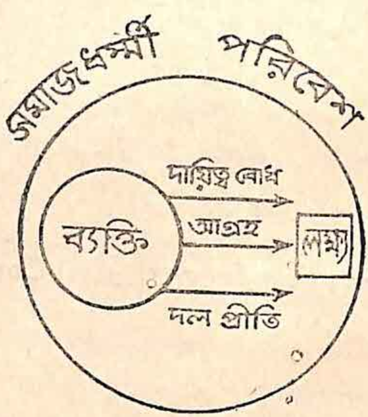
সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social Control)

এখন প্রশ্ন হল কেমন করে এই অন্তর্জাত শৃঙ্খলা শিক্ষার্থীদের মধ্যে আনা যায় এবং কেনই বা গতানুগতিক বিদ্যালয়ে এই শৃঙ্খলা এতদিন আনা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। আধুনিক শিক্ষাবিদগণের মতে সমাজধর্মী পরিবেশই একমাত্র অন্তর্জাত

শৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে পারে এবং এই বস্তুটির অভাবের জন্যই গতানুগতিক বিদ্যালয়ে অন্তর্জাত শৃঙ্খলা সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নি এবং তার ফলে শিক্ষকদের বাধ্য হয়ে কৃত্রিম শৃঙ্খলার আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

কোন পরিস্থিতি যখন সত্যকারের সমাজধর্মী হয়ে ওঠে তখন দেখা যাবে যে তার অন্তর্গত প্রত্যেকটি ব্যক্তিই একটি বিশেষ ঐক্যের সূত্রে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে যায়। প্রত্যেকেই নিজেকে ঐ সমাজের সমগ্র সংগঠনের একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলে মনে করে এবং তার সহযোগিতা ও কর্তব্যপালনের উপর যে সমাজটির সংহতি ও প্রগতি নির্ভর করছে এ উপলব্ধি তার মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে যায়। ফলে সে নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে যেমন একদিক দিয়ে সচেতন হয়ে ওঠে তেমনই তার উপর ন্যস্ত কর্তব্যপালন করতে সে সত্যকারের একটা আন্তরিক তৃপ্তিবোধ করে। সেই কারণেই তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করতে ও নিজের ইচ্ছাকে সমাজের মঙ্গলসাধনে নিয়োজিত করতে সে একটুও দ্বিধা করে না। সে একবারও মনে করে না যে এই নিয়ন্ত্রণের ফলে তার স্বাধীনতার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচন ঘটেছে। কেননা, তার স্বাধীনতার এই যে সঙ্কোচন এটা বহিঃস্থ কোন শক্তির দ্বারা সৃষ্ট নয়, এটা তার সম্পূর্ণ আত্মসৃষ্ট, স্ব-আরোপিত, তার ইচ্ছা, পছন্দ ও অভিরুচির দ্বারা পূর্ণসমর্থিত। অতএব দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তি যখন সত্যকারের সমাজধর্মী পরিবেশের মধ্যে গিয়ে পড়ে তখন তার মধ্যে নিজে থেকে শৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, তাকে নিয়মকানুন মানাবার জন্য কোনরূপ বাইরের হস্তক্ষেপের দরকার হয় না। একেই জন ডিউই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social Control) নাম দিয়েছেন।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিটি প্রকৃত সমাজেরই স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য।

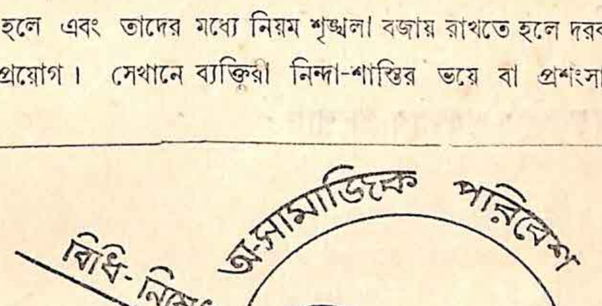


[প্রকৃত সমাজ-ধর্মী পরিবেশে ব্যক্তিকে কাজ করানোর জন্য কোন বাইরের শক্তির প্রয়োজন হয় না। ব্যক্তির মধ্যে আপনা হতেই কাজের জন্য আগ্রহ ও শৃঙ্খলাবোধ দেখা দেয়। এর নাম সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বা অন্তর্জাত শৃঙ্খলা]।

যখন ব্যক্তি কোন সমাজধর্মী পরিবেশের সম্মুখীন হয় তখনই সে সেই পরিবেশের একটা স্বাভাবিক এবং অমোঘ নিয়ন্ত্রণের অধীনস্থ হয়ে যায়। পরিবেশের দাবী ও প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী সে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবেই নিজের আচরণকে পরিবর্তিত ও নিয়ন্ত্রিত করে থাকে এবং সানন্দে পরিবেশের সেই শাসনকে মেনে নেয়। এই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আত্মশাসনেরই নামান্তর। সেইজন্য তার স্বাধীনতার সঙ্কোচন বা অপরের হস্তক্ষেপের কোন কথাই ব্যক্তির মনে দেখা দেয় না।

তাছাড়া ব্যক্তি নিজেকে সেই পরিবেশের একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলে মনে করে বলে সে তার সাধ্যমত করার চেষ্টা করে। সমাজের সংহতির জন্য তার সামর্থ্যে যতটুকু সম্ভবপর তা করতে সে দ্বিধাবোধ করে না। এক কথায় সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ব্যক্তি যেমন সহজ ও অন্তর্জাত শৃঙ্খলা মেনে চলে তেমনই তার সাধ্যায়ত্ত ক্ষমতা যতটুকু, ততটুকু সমাজের কল্যাণে উৎসর্গ করতে সে একটুও ইতস্তত করে না।

কিন্তু যেখানে পরিবেশটি প্রকৃত সমাজধর্মী নয় অর্থাৎ যেখানে মানুষ আছে অথচ সমাজ তৈরী হয় নি, সেখানে পরিবেশের নিজস্ব কোন নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা নেই। সেই তথাকথিত সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে দিয়ে কোন কাজ করাতে হলে এবং তাদের মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হলে দরকার বহিঃস্থ শক্তির প্রয়োগ। সেখানে ব্যক্তিরা নিন্দা-শাস্তির ভয়ে বা প্রশংসা-পুরস্কারের



[অসামাজিক পরিবেশে ব্যক্তিকে কাজ করাতে হলে প্রয়োজন বাহিক চাপের। এর ফলে দেখা দেয় বহির্জাত শৃঙ্খলা।]

লোভে নিয়মকানুন মেনে থাকে। কিন্তু তারা কখনই সাধ্যমত চেষ্টা করে না বা তাদের ক্ষমতার পূর্ণ প্রয়োগ করে না।

গতানুগতিক বিদ্যালয়ে ঠিক এই কারণেই অন্তঃশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না এবং কৃত্রিম শৃঙ্খলার সাহায্য নিতে হয়। যদিও শিক্ষার্থীরা সংখ্যায় বহু, তবুও তারা সত্যকারের সমাজ গড়ে তুলতে পারে না। বিদ্যালয়ের অস্বাভাবিক এবং অসমাজোচিত পরিবেশের জন্য এই শিক্ষার্থীর দলটি একটি অসংযত ও অসংবদ্ধ জনতাই থেকে যায়, সত্যকারের সমাজে পরিণত হয় না। ফলে তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হলে শাসন, কঠোর বিধিনিষেধ, শাস্তি-পুরস্কার প্রভৃতির সাহায্য নিতে হয়। এই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে মনোযোগ, একাগ্রতা, আনুগত্য ও নিয়মানুবর্তিতা দেখা যায় সে সবই কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক। গতানুগতিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বর্ণনা করতে গিয়ে মণ্টেসরী এক জায়গায় বলেছেন যে একরাশ ঝকঝকে প্রজাপতিকে কে যেন পিন দিয়ে বিঁধে বিঁধে রেখেছে।

আবার মজার কথা হচ্ছে যে যতক্ষণ এই বাহিরের শক্তির চাপটি বজায় থাকে ততক্ষণই শৃঙ্খলা থাকে। আর যে মুহূর্তে এই চাপ শিথিল হয়ে যায় সেই মুহূর্তে এই শৃঙ্খলাও অদৃশ্য হয়ে যায়।

শিক্ষায় অন্তর্জাত শৃঙ্খলার প্রয়োগ

শিক্ষাকে সার্থক ও কার্যকরী করে তুলতে হলে আর যে শিক্ষার্থীর উপর অস্বাভাবিক শৃঙ্খলা চাপিয়ে দেওয়া চলবে না এ সত্য আধুনিক শিক্ষাবিদগণ সকলেই উপলব্ধি করেন। তাঁরা এও বোঝেন যে শিক্ষার্থীকে তার পাঠগ্রহণের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে এবং এই স্বাধীনতার মধ্য থেকেই আসবে সত্যকারের স্বাভাবিক শৃঙ্খলাবোধ, যার আমরা নাম দিয়েছি অন্তর্জাত শৃঙ্খলা বা স্বাধীন শৃঙ্খলা।

ফলে আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীকে পাঠগ্রহণের ব্যাপারে নানাভাবে স্বাধীনতা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এই আধুনিক শিক্ষা পরিকল্পনা-গুলিতে গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার কৃত্রিম শৃঙ্খলার অচলায়তনকে যথাসম্ভব ভেঙ্গে

ফেলে দিয়ে সহজ স্বচ্ছন্দ স্বাস্থ্যময় পরিবেশে যাতে শিশু শিক্ষালাভ করতে পারে তারই আয়োজন করা হয়েছে। শিক্ষায় স্বাধীনতা প্রয়োগের এই ধরনের কয়েকটি মূর্ত উদাহরণের উল্লেখ নীচে করা হল।

মণ্টেসরী পদ্ধতি

মারিয়া মণ্টেসরী তাঁর প্রসিদ্ধ শিক্ষাপদ্ধতিতে স্বাধীনতা এবং শৃঙ্খলার এই আধুনিক পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করেছেন। মণ্টেসরী পদ্ধতিতে বলতে গেলে শিক্ষার্থীর শিক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণ তার নিজের উপরেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তার উপরে বাইরের কোন নিয়ন্ত্রণ বা শাসন নেই বললেই চলে। মণ্টেসরী পদ্ধতিতে কোন শিক্ষয়িত্রী নেই, যাঁরা থাকেন তাঁদের বলা হয় পরিচালিকা। তাঁদের একমাত্র কাজ হল শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করা এবং নিতান্ত প্রয়োজন হলে তাকে সাহায্য করা।

মণ্টেসরী সমাজধর্মী পরিবেশের অসীম ক্ষমতায় বিশ্বাসী। তিনি বিশ্বাস করেন যে সামাজিক পরিবেশে খেলাধূলা, আদান-প্রদান, যৌথকর্ম প্রচেষ্টা ইত্যাদির মাধ্যমে শিশু জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় আচরণগুলি শিখে নেবে। তার জন্য তার উপর কোন রকম বাইরের অনুশাসন বা নিয়ন্ত্রণ চাপাতে হবে না।

মণ্টেসরীর শিক্ষা পরিকল্পনার এক অভিনব বৈশিষ্ট্য হল তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষামূলক উপকরণগুলি (Didactic apparatus)। এই উপকরণগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কারও সাহায্য ছাড়াই তাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের পুষ্টিসাধন এবং পঠন, লিখন ও গণিতের প্রাথমিক জ্ঞান-সঞ্চয় করতে পারে। এক কথায় মণ্টেসরী পদ্ধতিতে শিক্ষা হচ্ছে আত্ম-শিক্ষণেরই নামান্তর এবং সেখানে শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা পুরোপুরি বাধাহীন ও নিরঙ্কুশ।

সর্বত্রই দেখা গেছে যে শিক্ষার্থীরা তাদের এই অবাধ স্বাধীনতার মোটেই অপব্যবহার করে না। তারা কোন দিক দিয়েই বিশৃঙ্খল বা স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে না, তাদের মধ্যে প্রচুর দায়িত্ববোধ, আত্মনির্ভরতা, সম্মানজ্ঞান, সহযোগিতার অভ্যাস প্রভৃতি সদ্‌গুণ গড়ে উঠতে দেখা গেছে।

ডাল্টন প্ল্যান

শিক্ষায় স্বাধীনতার প্রয়োগের আর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল ডাল্টন প্ল্যান (Dalton Plan)। এর প্রবর্তক আর একজন মহিলা, নাম হেলেন পার্কহার্ষ্ট

(Helen Parkhurst)। এতে প্রচলিত শ্রেণীগত পঠনকে সম্পূর্ণ তুলে দিয়ে তার স্থানে ব্যক্তিগত শিক্ষণের প্রথা প্রবর্তিত করা হয়েছে। ক্লাস বা শ্রেণীর মারফৎ শিক্ষণই হল শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার উপর এক প্রকারের হস্তক্ষেপ। ক্লাস মানেই হল যে শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট সময়ে এক নির্দিষ্ট বিষয় একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পড়তে বাধ্য। ডাল্টন প্ল্যানে এই শ্রেণী-পদ্ধতিতে শিক্ষণের পরিবর্তে পঠনীয় বিষয়টি শেখার দায়িত্ব শিক্ষার্থীর উপর সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টিকে প্রথমে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে (unit) বিভক্ত করা হয় এবং এইগুলিকে করণীয় কাজ (assignment) রূপে শিক্ষার্থীর উপর ভার দিয়ে দেওয়া হয়। শিক্ষার্থী সেগুলিকে তার রুচি, আগ্রহ এবং সময় অনুযায়ী নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পন্ন করে। পঠনের সময়, পদ্ধতি বা বিষয়ের নির্বাচন সম্বন্ধে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা শিক্ষার্থীর উপর চাপান হয় না। অবশ্য যখনই শিক্ষার্থী দরকার অনুভব করবে তখনই সে শিক্ষকের সাহায্য পেতে পারবে।

যদিও এই পদ্ধতিটিকে বাস্তবে পূর্ণভাবে রূপ দিতে যথেষ্ট অসুবিধা ও জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়, তথাপি এই পরিকল্পনাটি যে ব্যক্তিগত বৈষম্যরূপ মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বটির উপর প্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শিক্ষার্থীর নিজস্ব সহজাত শক্তি ও সম্ভাবনাগুলির পূর্ণ বিকাশ সম্ভব করতে হলে যে তাকে পঠনের বিষয়, পদ্ধতি ও সময় নির্বাচনে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে, শিক্ষার এই পরম সত্যটাকে মূর্তরূপ দেবার সার্থক প্রচেষ্টা হল ডাল্টন প্ল্যান।

হিউরিষ্টিক পদ্ধতি

শিক্ষণের পদ্ধতি ও প্রয়োগভঙ্গী সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দেবার পরিকল্পনা পাওয়া যায় আর একটি শিক্ষণ প্রথায়। এটি হিউরিষ্টিক পদ্ধতি (Heuristic Method) নামে পরিচিত। মণ্টেসরী বা ডাল্টন প্ল্যানের মত এটি একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থা নয়, এটি বিশেষ এক প্রকারের শিখন পদ্ধতির পরিকল্পনা মাত্র। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক গতানুগতিক প্রথা অনুযায়ী সম্পূর্ণ ও সুনির্দিষ্ট জ্ঞানটি শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দেন না। তার পরিবর্তে তিনি শিক্ষার্থীকে আবিষ্কারকের ভূমিকায় স্থাপিত করেন এবং উপযোগী প্রশ্নের সাহায্যে তাকে ধীরে ধীরে নিজে থেকে সত্যটি আবিষ্কার করতে সাহায্য করেন। যদিও এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা কেবলমাত্র জ্ঞান আহরণের পন্থা নির্বাচনে সীমাবদ্ধ, তবুও এর মূল্য ও কার্যকারিতা যথেষ্ট। বিশেষ করে বিজ্ঞান এবং গণিতের শিক্ষণে এর উপকারিতা সুপ্রমাণিত।

ল্যাবরেটরী স্কুল

শিক্ষায় স্বাধীনতার পূর্ণ প্রয়োগের দৃষ্টান্তরূপে জন ডিউইর প্রসিদ্ধ ল্যাবরেটরী স্কুলের নাম উল্লেখ করতে হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলটিতে শিক্ষার্থীদের উপর কোনরূপ বাহ্যিক শৃঙ্খলার বোঝা চাপান হয় নি। শিক্ষা গ্রহণের সময়, বিষয়, পদ্ধতি প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারেই শিক্ষার্থীদের রুচি ও চাহিদাই ছিল শেষ ও চরম কথা। ডিউই বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃত সমাজধর্মী পরিবেশ গড়ে তুলতে পারলে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে তাদের সাধ্যমত প্রয়াসটুকু করতে এবং প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলার বিধি-নিষেধগুলো নিজেরাই মেনে চলবে। ডিউইর ল্যাবরেটরী স্কুলে তাঁর তত্বটি পূর্ণমাত্রায় সপ্রমাণিত হয়ে গেছে।

প্রজেক্ট পদ্ধতি

কিলপ্যাট্রিকের প্রবর্তিত প্রজেক্ট পদ্ধতিটিও শিক্ষার স্বাধীনতার আর একটি বিশিষ্ট প্রয়োগের দৃষ্টান্ত। এই পদ্ধতিতে শিক্ষাকার্যটি নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ ভার থাকে শিক্ষার্থীর উপর। শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সমস্যার আকারে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা হয় এবং শিক্ষার্থীরা নিজেরাই যৌথভাবে সেই সমস্যাগুলি সমাধান করার পরিকল্পনা তৈরী করে এবং পরে সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্যাগুলির সমাধানে পৌছবার চেষ্টা করে। একই প্রজেক্ট বলা হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার সময়, পদ্ধতি, বিষয়বস্তু, এ সবই নির্বাচনের পূর্ণ স্বাধীনতা শিক্ষার্থীরা ভোগ করে থাকে।

জর্জ জুনিয়র রিপাবলিক, লিটল কমনওয়েলথ

বিদ্যালয় পরিচালনা ও আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখার গুরুদায়িত্ব শিক্ষার্থীদের উপর অর্পণ করলে তারা যে অতি সন্তোষজনক ও আশাতীত-ভাবে সেই কর্তব্য পালন করে তারও সপক্ষে একাধিক পরক্ষীণমূলক প্রচেষ্টার উল্লেখ করা যেতে পারে। আমেরিকায় একদল অপরাধপ্রবণ ছেলেমেয়েদের নিয়ে জর্জ জুনিয়ার রিপাবলিক নামে একটি নতুন ধরনের বিদ্যালয় খোলা হয়। এই বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরিচালনা, শৃঙ্খলা বজায় রাখা ইত্যাদি সংক্রান্ত সমস্ত কাজের দায়িত্বই এই ছেলেমেয়েদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে ঐ ছেলেমেয়েগুলি আরও উচ্ছৃঙ্খল বা অসংযত হওয়া দূরে থাকুক, দেখা গেল যে তাদের মধ্যে অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। প্রত্যেকেই

তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন হয়ে উঠেছে এবং নিজেরাই স্বেচ্ছায় শৃঙ্খলা ও বিধিনিষেধের বন্ধনে ধরা দিয়েছে। যারা ছিল একদিন উচ্ছৃঙ্খল, অপরাধপ্রবণ ও সমাজ-নিন্দিত ছেলেমেয়ের দল, তারাই একদিন গড়ে তুলল দায়িত্বশীল, সুসংযত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ছাত্রছাত্রীদের এক অভিনব সমাজ।

ইংলণ্ডে হোমার লেন নামক একজন শিক্ষাবিদ্ ঠিক এই একই রকমের একটি পরীক্ষণ চালান। তিনিও একদল দুষ্কৃতিপ্রবণ ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটা বিদ্যালয় গড়ে তোলেন। তার নাম দেন লিটল কমনওয়েলথ এবং ঐ বিদ্যালয় পরিচালনার সমস্ত ভার দেন ঐ ছেলেমেয়েদের হাতে। কালক্রমে দেখা যায় যে ঐ অপরাধপ্রবণ ছেলেমেয়েরা সম্পূর্ণ পরবর্তিত হয়ে একদল দায়িত্বশীল ও সুসংযত ছাত্রছাত্রীতে পরিণত হয়েছে।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the modern concept of freedom. How can you reconcile this concept of freedom with the need of discipline in the school ?

Ans. (পৃঃ ৯৫—পৃঃ ১০৬)

2. Write an essay on "Free Discipline." (B.T. 1954)

Ans. (পৃঃ ৯৫—পৃঃ ১১০)

3. "Discipline is not an external thing like 'order' but something that touches the inmost springs of conduct."—Explain and indicate the educational implications of this statement. (B. T. 1959)

Ans. (পৃঃ ৯৫—পৃঃ ১০৬)

4. What is the place of discipline in child-centred education ? (B.A. 1957)

Ans. (পৃঃ ৯৫—পৃঃ ১১০)

5. What do you understand by "free discipline" and what is its place in school ? (B. A. 1954)

Ans. (পৃঃ ৯৫—পৃঃ ১১০)

6. Discuss the modern concept of discipline. What is the importance of this concept in the field of education ? (B. A. 1960)

Ans. (পৃঃ ৯৫—পৃঃ ১১০)

7. What do you mean by 'social control' ? How can such control be created and what are its utilities ?

Ans. (পৃঃ ১০৩—পৃঃ ১০৬)

এগার

শাস্তি ও পুরস্কার (Reward & Punishment)

বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে অতি প্রাচীনকাল থেকেই শাস্তি ও পুরস্কার দানের প্রথা দুটি অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। যেদিনই প্রথম প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদানের প্রথার প্রবর্তন হয় অর্থাৎ যেদিনই প্রথম বিদ্যালয় তৈরী হয় সেদিন থেকেই শিক্ষকের সামনে একটি অতি জটিল সমস্যা দেখা দেয়। সমস্যাটি হল কেমন করে শিক্ষার্থীকে পাঠ-গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা যায়।

এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটির সমাধান রূপে প্রবর্তিত করা হল শাস্তি ও পুরস্কার দানের প্রথা। কালক্রমে শুধু পাঠ শেখা নয়, বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বজায় রাখা, শিক্ষকের অনুগত হওয়া ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারেই শিক্ষার্থীকে অভীষ্ট আচরণ করতে বাধ্য করার জন্য শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যাপক ব্যবহার সুরু হল। যারা বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা মেনে চলে, শিক্ষকের অনুগত হয় এবং যথারীতি পাঠ শেখে তাদের উৎসাহিত করবার জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। আর যারা বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে বা শিক্ষকের বাধ্য হয় না বা পড়াশুনা ঠিকমত করে না তাদের জন্য নির্ধারিত হল শাস্তি।

শিক্ষার ক্ষেত্রে শাস্তি ও পুরস্কার দুটি বিভিন্নধর্মী শক্তিরূপে কাজ করে থাকে। উপযুক্ত ভাবে প্রয়োগ করতে পারলে দুটিই শিশুকে কোন বিশেষ লক্ষ্যের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে পারে বা তা থেকে সরিয়ে আনতে পারে। তবে শাস্তির ক্ষেত্রে থাকে শাস্তিকে এড়িয়ে যাবার ইচ্ছা এবং পুরস্কারের ক্ষেত্রে কাজ করে পুরস্কারকে পাবার প্রত্যাশা। শাস্তি-পুরস্কার দানের প্রথা দুটি প্রাণীর স্বাভাবিক দুঃখের প্রতি বিরাগ এবং সুখের প্রতি আসক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে প্রথম অবস্থায় বা অজটিল ক্ষেত্রগুলিতে এদের কার্যকারিতা অতি সহজেই প্রমাণিত হয় এবং সারা পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই যেখানে শিক্ষা-প্রক্রিয়ার সহগামীরূপে শাস্তি ও পুরস্কার দানের প্রথা প্রবর্তিত হয় নি।

মানসিক ও দৈহিক শাস্তি

শাস্তির কার্যকারিতা বাড়াবার জন্য নানা বিভিন্ন প্রকৃতির শাস্তির উদ্ভাবন করা হয়েছে। প্রকারভেদে শাস্তি এখন সংখ্যায় গণনাতীত। দেশ ও কাল ভেদে

নানা প্রকার শাস্তির বিবরণ পাওয়া যায়। মোটামুটিভাবে শাস্তিকে আমরা দু-শ্রেণীতে ফেলতে পারি, (১) মানসিক বা মনোবিজ্ঞানমূলক-শাস্তি এবং (২) দৈহিক শাস্তি। মানসিক শাস্তির মূল লক্ষণ হল শিশুর মনে পীড়ন বা কষ্টের সৃষ্টি করা। নানা প্রকারের মানসিক শাস্তি বিদ্যালয়ে প্রচলিত আছে। যেমন স্কুলের ছুটির পর কিছুক্ষণ আবদ্ধ করে রাখা,সর্বসমক্ষে তার অপরাধ প্রকাশ করা এবং তার সমালোচনা করা ; অপরাধীকে শিক্ষকের প্রীতি থেকে বঞ্চিত করা ; পড়াশোনায় অকৃতকার্য হলে নীচের ক্লাসে বসিয়ে দেওয়া ইত্যাদি।

প্রকারের দিক দিয়ে দৈহিক শাস্তির কোন পরিসংখ্যান দেওয়া যায় না। প্রতি দেশে প্রতি যুগে নির্যাতন-প্রিয় শিক্ষকগণের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে বহু বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি জন্মলাভ করে শাস্তির বৈচিত্র্য ও সংখ্যা বাড়িয়ে তুলেছে। সামান্য কানমলা থেকে সুরু করে মাথায় ইঁট নিয়ে কড়া রোদে দাঁড়িয়ে থাকা এ সবই শিক্ষাব্যবস্থায় শাস্তি-বৈচিত্র্যের নিদর্শনরূপ।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় দৈহিক শাস্তির চেয়ে মানসিক শাস্তি কম কার্যকরী। কিন্তু একথা ঠিক নয়। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে দৈহিক শাস্তি অপেক্ষা শিশু মানসিক শাস্তিকে অধিক ভয় করে। নির্মমতার দিক দিয়ে দৈহিক শাস্তির তুলনায় মানসিক শাস্তি নির্দোষ বলে মনে হলেও শিশুর মনের উপর মানসিক শাস্তির প্রভাব অনেক সময় অত্যন্ত অবাঞ্ছিত ফল প্রসব করে থাকে।

মানসিক ও বস্তুগত পুরস্কার

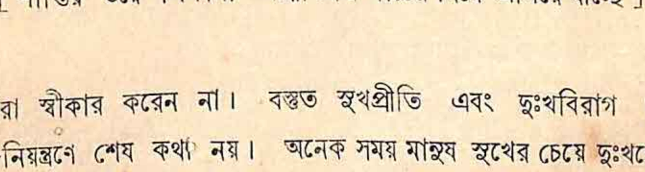
শাস্তির মত পুরস্কারও দু শ্রেণীর হতে পারে। (১) মানসিক ও (২) বস্তুগত। মানসিক পুরস্কার প্রধানত প্রশংসা, সাধুবাদ, প্রকাশ্য গুণকীর্তন, শিক্ষকের মনোযোগের আধিক্য প্রভৃতি নানা প্রকারের হতে পারে। বস্তুগত পুরস্কার বলতে খেলনা, খাদ্য থেকে সুরু করে পুস্তক, পদক, অর্থ প্রভৃতি দেওয়াকে বুঝিয়ে থাকে। শাস্তি ও পুরস্কার উভয়েরই একমাত্র উদ্দেশ্য হল যে, যখন শিশু স্বাভাবিকভাবে পাঠে মনোযোগ দেয় না তখন তাকে কৃত্রিম উপায়ে ঐ পাঠের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তোলা। এইজন্য এ দুটিকে কৃত্রিম বা বাহ্যিক উদ্‌বোধক (artificial or extrinsic incentive) বলে। প্রাথমিক ও সরল ক্ষেত্রগুলিতে শাস্তি ও পুরস্কারের দ্বারা ফল পাওয়া গেলেও সব দিক বিচার করলে কখনই এ দুটিকে কাম্য বলে গ্রহণ করা যায় না।

আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণের নানা গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে সার্থক শিক্ষায় উদ্বোধক হবে স্বাভাবিক এবং আভ্যন্তরীণ। শিশুকে তার পাঠের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে শাস্তি, পুরস্কার বা অন্য কোন বাহ্যিক কৃত্রিম উদ্বোধকের প্রয়োজন হবে না। তার স্বাভাবিক আগ্রহ ও প্রেষণাই একমাত্র উদ্বোধকরূপে কাজ করবে।

তা ছাড়া শাস্তি বা পুরস্কার কোনটাই উদ্বোধকরূপে মোটেই ত্রুটিশূন্য নয়। কার্যকারিতার দিক দিয়েও এ দুটি যেমন অসম্পূর্ণ, তেমনই নীতির দিক দিয়েও এগুলিকে সমর্থন করা যায় না। শাস্তি এবং পুরস্কার শিক্ষা-ব্যবস্থায় কেন কাম্য নয় তার কয়েকটি কারণের উল্লেখ নীচে করা হল।

শাস্তিদানের অপকারিতা

প্রথম, দুঃখকে এড়িয়ে যাবার স্বাভাবিক প্রবণতাকে ভিত্তি করেই শাস্তিদান প্রথার প্রচলন। থর্নডাইকের প্রসিদ্ধ ফললাভের সূত্রটি শাস্তিদানের স্বপক্ষে প্রায়ই উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এই সূত্র অনুযায়ী যে আচরণের শেষে থাকে অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা, সে আচরণ সম্পাদন করা থেকে প্রাণী বিরত থাকে। কিন্তু থর্নডাইকের এই সূত্রটিকে সর্বজনীন বলে আধুনিক মনো-



[শাস্তির ভয়ে শিক্ষার্থী অপ্রীতিকর পাঠের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে]

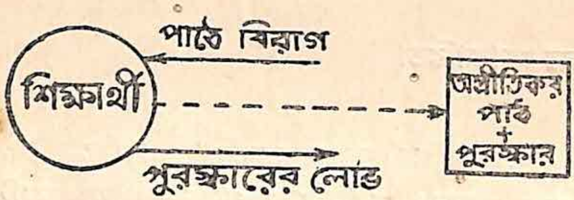
বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন না। বস্তুত সুখপ্রীতি এবং দুঃখবিরাগ মানুষের আচরণ-নিয়ন্ত্রণে শেষ কথা নয়। অনেক সময় মানুষ সুখের চেয়ে দুঃখকে কাম্য বলে মনে করে থাকে। মানুষের শিখন নিয়ে থর্নডাইক নিজে যে পরীক্ষণ চালান তাতেও তিনি দেখেন যে মানুষের ক্ষেত্রে শাস্তি উদ্বোধক-রূপে মোটেই কার্যকরী নয়। অতএব শাস্তিদান প্রথা মনোবিজ্ঞান-সম্মত নয়।

দ্বিতীয়, শাস্তি শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মগ্লানি ও নিম্নতাবোধ (sense of

inferiority) জাগিয়ে তোলে। ফলে তার ব্যক্তিসত্তার সুস্থ বিকাশ ব্যাহত হয় ও শিশু দুর্বল ও ভীরু চিত্তের মানুষরূপে বড় হয়ে ওঠে।

তৃতীয়, শাস্তির প্রতি বিরাগ, ভীতি বা ঘৃণা অনুবর্তন প্রক্রিয়ার (conditioning) মাধ্যমে বিদ্যালয়, শিক্ষক বা পাঠ্যবিষয়ে সঞ্চালিত হয়ে যায় এবং যে উদ্দেশ্যে শাস্তি দেওয়া সে উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। যেমন অঙ্ক শিখাবার উদ্দেশ্যে শিক্ষক শিশুকে শাস্তি দিলেন। ফলে দেখা গেল শাস্তির প্রতি বিরাগ অঙ্কশাস্ত্রে অনুবর্তিত হয়ে গেছে।

চতুর্থ, শাস্তি মাত্রেরই সঙ্গে অল্পবিস্তর নিষ্ঠুরতা থাকে। অনেক নির্যাতন-প্রিয় শিক্ষক শাস্তি দেওয়াকে বেশ উপভোগ করে থাকেন। যখনই এই নিষ্ঠুরতা



[পুরস্কারের লোভ পাঠে বিরাগের চেয়ে শক্তিশালী হওয়ায় শিক্ষার্থী অপ্রীতিকর পাঠের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে]

শিশুর মনকে স্পর্শ করে তখই সে শিক্ষা-শিক্ষক-বিদ্যালয় সমস্তকেই ঘৃণা করতে শেখে। শিশুর মধ্যে ঘৃণা দেখা দিলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধুর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় এবং তার ফলে শিক্ষণ-প্রক্রিয়াটি আয়াসবহুল হয়ে ওঠে।

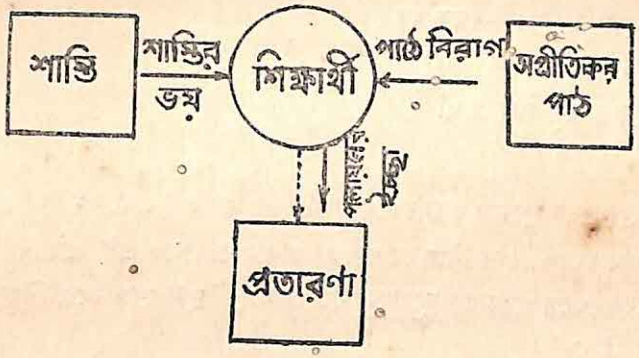
পঞ্চম, দৈহিক শাস্তিদান আবার শিক্ষকের দৈহিক শ্রেষ্ঠত্ব বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। শিশু মনে করে যে যেহেতু শিক্ষক শারীরিক ক্ষমতার দিক দিয়ে তার চেয়ে বড় সেই জোরেই তিনি শাস্তি দিতে পারছেন এবং তার যদি সমান শারীরিক শক্তি থাকত তবে তিনি শাস্তি দিতে পারতেন না। এই কারণে দৈহিক শাস্তিদান নীতির দিক দিয়ে সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য।

ষষ্ঠ, দৈহিক শাস্তি অনেক সময় শিশুর আঙ্গিক ক্ষতি করে দেয়। এডিসনের প্রভু এডিসনকে এমন একটি চড় মারেন যে তিনি সারাজীবনের জন্য বধির হয়ে যান।

সপ্তম, শাস্তির কার্যকারিতা ভীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ যতদিন শিক্ষার্থী শাস্তিকে ভয় করবে ততদিন সে বাধ্য হয়ে পাঠ শিক্ষা করবে। কিন্তু যেই ভয় কেটে যাবে বা শাস্তি তার পক্ষে পর্যাপ্ত বলে বোধ হবে না তখনই

শাস্তির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। এইজন্য শিক্ষককে তখন নতুন শাস্তি উদ্ভাবন করতে হবে বা শাস্তির পরিমাণ বাড়াতে হবে। কিন্তু উদ্ভাবনেরও একটা সীমা আছে এবং শাস্তির পরিমাণও অনির্দিষ্টভাবে বাড়ান যায় না, ফলে শাস্তির কার্যকারিতা ক্রমশ কমে আসতে বা লোপ পেতে বাধ্য।

অষ্টম, শাস্তি শিক্ষার্থীকে প্রতারণা শেখায়। যখন শিক্ষার্থীর কাছে শাস্তি এবং পাঠ দুইই একই রকম অপ্রীতিকর হয়ে ওঠে তখন সে প্রতারণার আশ্রয়



[শাস্তি এবং অপ্রীতিকর পাঠ—এ-দুইই থেকে পালিয়ে শিক্ষার্থী প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে।]

নেয়। যেমন, পড়া না করে বলে পড়া হয়েছে বা অন্য কারও সাহায্য নিয়ে শিক্ষকের দেওয়া কাজ করে রাখে বা অসুস্থতার ভান করে ইত্যাদি। এইভাবে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সে পাঠ এবং শাস্তি দুইই থেকে পালিয়ে বাঁচে।

নবম, সাধারণত মানসিক শাস্তি দৈহিক শাস্তি অপেক্ষা কম নির্মম ও কম দৃষ্টিকটু। কিন্তু এমন অনেক মানসিক শাস্তি আছে যা দৈহিক শাস্তি অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর। দৈহিক শাস্তি যদি গুরুতর প্রকৃতির না হয় তবে সাধারণত স্থায়ী ছাপ রেখে যায় না এবং শিশু পরে প্রায়ই তা ভুলে যায়। কিন্তু মানসিক শাস্তি শিশুর কোমল মনকে বিশেষভাবে বিক্ষুব্ধ করে তোলে এবং ভবিষ্যতে তার মনের স্বাস্থ্যকে বিপন্ন করে তুলতেও পারে। এমন কি স্থায়ীভাবে কোন মানসিক বিকৃতির সৃষ্টি করে যেতে পারে। কি দৈহিক, কি মানসিক, সকল প্রকার শাস্তিই শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের পরিপন্থী এবং সেইজন্য বিশেষভাবে পরিত্যাজ্য।

দশম, শাস্তির বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড় কথা হল যে আধুনিক শিক্ষার সংজ্ঞায়

শাস্তির কোন স্থানই আর নেই। শিক্ষা হল শিশুর অব্যাহত ক্রম-বিকাশ, তার সর্বাঙ্গীন বৃদ্ধি-প্রচেষ্টা। অতএব শিক্ষার এই সংব্যাখ্যানে শাস্তির প্রয়োগের স্থানটা কোথায়? শাস্তি বা পুরস্কার এই ধরনের কোন বাহ্যিক উপকরণই স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রচেষ্টার কোনরূপেই সহায়ক হতে পারে না। দেখা যাচ্ছে যে মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব, নীতি ও শিক্ষার লক্ষ্যের দিক দিয়ে, এমন কি সাধারণ কার্য-কারিতার বিচারেও শাস্তির কোন স্থান আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থায় নেই, থাকতে পারে না। অতএব শাস্তিকে পুরোপুরি বিদ্যালয় থেকে বাদ দেওয়াটাই আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণের সর্ববাদী-সম্মত মত।

বিদ্যালয়ের পুরস্কার প্রথা

শাস্তির চেয়ে পুরস্কার দানের প্রথা অধিকতর কার্যকরী এবং কম অনিষ্টকরও। থর্নডাইক মানুষের শিখন নিয়ে যে পরীক্ষণ চালান তা থেকে এই প্রমাণিত হয়েছে যে মানুষের ক্ষেত্রে পুরস্কার উদ্‌বোধক হিসেবে তবু কিছুটা কাজ করে, কিন্তু শাস্তির কোন মূল্যই নেই।

শাস্তির ক্ষেত্রে পাওয়া যায় এমন অনেক দোষ থেকে পুরস্কার-প্রথা মুক্ত। যেমন, পুরস্কার শিশুর ভীতি, বিরাগ, ঘৃণা ইত্যাদি সৃষ্টি করে না, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক কলুষিত করে না, শিশুর মধ্যে আত্মগ্লানি সৃষ্টি করে না, শিশুর মানসিক বিকৃতি আনে না ইত্যাদি। পুরস্কারদানের স্বপক্ষে একটি সবল মনোবৈজ্ঞানিক যুক্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। পুরস্কার যেহেতু শিশুর মধ্যে মানসিক তৃপ্তি এনে থাকে সেহেতু ঐ তৃপ্তি শিক্ষা পরিস্থিতির অন্তর্গত নানা বস্তুতে অনুবর্তিত (conditioned) হয়ে গিয়ে ঐ সকল বস্তুর প্রতি শিশুর সন্তোষজনক মনোভাব সৃষ্টি করে থাকে। যেমন যে শিক্ষক শিশুদের পুরস্কার দিতে অভ্যস্ত বা যে বিষয় বা কার্যে কৃতকার্যতার জন্য শিশু সুনাম অর্জন করল, সেই শিক্ষক, বিষয় বা কার্যের প্রতি অনুবর্তন (conditioning) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর তৃপ্তির মনোভাব সৃষ্টি হয়ে যায়। এর ফলে শিক্ষণ প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু ও সহজ সম্পাদন স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে থাকে।

কিন্তু পুরস্কার প্রথার অপকারিতাও প্রচুর, কেননা শাস্তির মত পুরস্কারও কৃত্রিম উদ্‌বোধক। শিক্ষার্থীকে স্বাভাবিক পন্থায় শিক্ষায় উদ্‌বুদ্ধ করতে না পারা গেলেই শাস্তি বা পুরস্কারের আশ্রয় নেওয়া হয়ে থাকে। অতএব শাস্তি বা

পুরস্কার কোনটাই স্বাভাবিক পদ্ধতি নয়। দুইই অস্বাভাবিক, কৃত্রিম এবং ফলে অপকারী। পুরস্কার প্রথার প্রধান দোষগুলোর বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

প্রথম এবং সবচেয়ে বড় দোষ হল এই যে পুরস্কার প্রথায় শিক্ষার্থীর কাছে উদ্দেশ্যের চেয়ে উপকরণ বড় হয়ে ওঠে। পাঠশিক্ষা হল উদ্দেশ্য, পুরস্কার হল সেই লক্ষ্যে পৌছতে সাহায্য করার জন্য একটা উপকরণ মাত্র। কিন্তু অনেক সময় দেখা গেছে যে পাঠশিক্ষার পরিবর্তে পুরস্কারই শিশুর কাছে উদ্দেশ্যের স্থান দখল করে বসে আছে। যেমন, যে শিশু চকোলেটের লোভেই পড়া তৈরী করে তার কাছে চকোলেট পাওয়াটাই পাঠশিক্ষার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এতে শিক্ষার নিজস্ব মুল্য সম্বন্ধে শিশুর প্রকৃত জ্ঞান জন্মায় না।

দ্বিতীয়, পুরস্কার শিক্ষার্থীর মধ্যে লোভের সৃষ্টি করে। লোভের একটা বড় লক্ষণ হল অতৃপ্তি। লোভী যত পায় তত চায়। ফলে শিক্ষার্থীকে পুরস্কারের সাহায্যে পাঠে উদ্বুদ্ধ রাখতে হলে পুরস্কারের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করে রাখলে চলবে না,



[পুরস্কারের লোভ পাঠে বিরাগের চেয়ে দুর্বল হওয়ায় শিক্ষার্থী অপ্রীতিকর পাঠ এবং পুরস্কার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।]

দিনের পর দিন বাড়িয়ে যেতে হবে। আজ যদি এক টুকরো চকোলেটে কাজ হয়, কাল দু'টুকরো লাগবে, পরশু আরও বেশী এবং খুব শীঘ্রই এমন দিন আসবে যখন শিক্ষার্থীর লোভ তৃপ্ত করা পুরস্কারদাতার ক্ষমতার বাইরে চলে যেতে পারে।

তৃতীয়, পুরস্কার প্রথা শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে। পুরস্কার সকলে পেতে পারে না, চেষ্টা করলেও না। ফলে পুরস্কার পাবার জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। যারা প্রতিযোগিতায় হেরে যায় তাদের মধ্যে দেখা দেয় ব্যর্থতা, হিংসা ঘৃণা প্রভৃতি অবাঞ্ছিত মনোভাব। আর যারা সাফল্য লাভ করে তাদের মধ্যে জন্মায় গর্ব ও উৎকর্ষবোধ। ফলে

শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে সার্থক শিক্ষা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

৪। চতুর্থ, পুরস্কার শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতারণার ইচ্ছা সৃষ্টি করে থাকে। যখন শিশু দেখে যে নির্দিষ্ট কাজটি শেষ করে পুরস্কার পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছে না তখন সে ছলনার আশ্রয় নেয়। যেমন, মিথ্যা কথা বলে, নকল করে বা অপরের সাহায্য নিয়ে কাজটির সম্পাদন দেখিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থী তার প্রাপ্য পুরস্কারটা হস্তগত করে।

৫। পঞ্চম, আর্থিক পুরস্কার মানসিক পুরস্কারের চেয়ে ক্ষতিকর। এতে শিক্ষার্থীর মনে শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণার সৃষ্টি হয় এবং অপরিণত বয়সেই অর্থের প্রতি অবাঞ্ছিত আসক্তি দেখা দেয়। সরাসরি টাকা দেওয়ার পরিবর্তে অবশ্য শিক্ষাগ্রহণে সুযোগ দেওয়া, পুস্তক উপহার দেওয়া প্রভৃতি পরোক্ষ পুরস্কার অনেক ভাল। দোষহীনতার দিক দিয়ে মানসিক পুরস্কারকে তবু কিছুটা সমর্থন করা যেতে পারে।

শাস্তি ও পুরস্কার উভয়ই পরিত্যাজ্য

কিন্তু সার্থক শিক্ষা ব্যবস্থায় শাস্তি ও পুরস্কার দুইই একেবারে বর্জন করা উচিত। শিশুর শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ তার প্রেষণা-ভিত্তিক। অর্থাৎ তার প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ীই শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হবে। সেখানে পাঠে উদ্‌বুদ্ধ করবে তার নিজস্ব আগ্রহ ও সার্থকতা-বোধ, কোন বাইরের কৃত্রিম উদ্‌বোধক নয়।

শাস্তি ও পুরস্কার প্রথার প্রচলনের মূলে ছিল একটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। প্রাচীন শিক্ষাবিদ্‌গণ মনে করতেন শিশুর শিক্ষার জন্য স্বাভাবিক আগ্রহবোধ থাকে না। অতএব অস্বাভাবিক পন্থার সাহায্য নিতে হবে তাকে শিক্ষা-গ্রহণে উদ্‌বুদ্ধ করার জন্য। কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ ভুল। মানব-দেহে যেমন খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা অতি স্বাভাবিক, মানবমনের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও তেমনি অতি স্বাভাবিক। তবে খাদ্য গ্রহণের জন্য যেমন দরকার ক্ষুধার তেমনই শিক্ষা গ্রহণের জন্য দরকার আগ্রহ ও আসক্তির। ক্ষুধার্তকে খাদ্য খাওয়াতে যেমন কোন কৃত্রিম পন্থার সাহায্য নিতে হয় না তেমনই শিক্ষার জন্য আগ্রহশীল শিশুকে শেখানর জন্য শাস্তি বা পুরস্কাররূপ কোন অস্বাভাবিক পন্থার আশ্রয় নিতে হয় না। অতএব শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে দরকার শিশুর পাঠে সত্যকার

আগ্রহ-সৃষ্টির। দেখতে হবে সে যেন শিক্ষার প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধ করে এবং নির্দিষ্ট পাঠটি গ্রহণের সার্থকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতনতা যেন তার মধ্যে জন্মায়। শাস্তি বা পুরস্কার কোনটিরই প্রয়োগ করার পেছনে কোন যৌক্তিকতা নেই এবং এই অস্বাভাবিক উপায়ের দ্বারা শিক্ষার সহজ ও সর্বজনীন গতি ব্যাহতই হয়। কোন দিক দিয়েই তা উন্নত হয় না।

নীতিশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাতত্ত্ব প্রভৃতি সকল দিক দিয়েই বিচার করে দেখা গেছে যে শাস্তি দেবার পেছনে কোনরূপ যুক্তিপূর্ণ সমর্থন নেই। বরং শাস্তিদানের বিরুদ্ধে এত সবল যুক্তি পাওয়া যায় যে এ প্রথাটির প্রচলন কোন রূপেই মেনে নেওয়া যায় না। দৈহিক শাস্তি ত নিতান্ত গর্হিত, শিক্ষার আদর্শ-বিরোধী, শিক্ষার্থীর বুদ্ধি-প্রচেষ্টার চরম ক্ষতিকর, সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার পক্ষেই গ্লানিকর। এক কথায় এটি বর্বরোচিত, সভ্য মনের চিন্তাধারার সঙ্গে এর কোন সঙ্গতি নেই। মানসিক শাস্তি দৈহিক শাস্তির মত বর্বরোচিত না হলেও শিশুর মনের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হতে পারে এবং অত্যন্ত বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া তার ব্যবহারও সমর্থন করা যায় না।

প্রাচীনপন্থী শিক্ষাবিদ্গণের কেউ কেউ শাস্তিকে একেবারে বিদ্যালয় থেকে বিসর্জন দেবার পক্ষপাতী নন। তাঁরা যদিও শাস্তিকে মন্দ বলে বর্ণনা করেন তবু এর প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেন অর্থাৎ শাস্তিকে তাঁরা প্রয়োজনীয় কু-প্রথা (necessary evil) বলে বর্ণনা করেন। এর উত্তরে বলা চলে যে যা "কু" তা কখনও প্রয়োজনীয় হতে পারে না। তা ছাড়া, এই যে প্রয়োজনীয়তার বোধ এর প্রথম কারণ হল যে গতানুগতিক শিক্ষাপ্রথায় শিশুর মধ্যে পাঠের প্রতি প্রকৃত আসক্তি বা আগ্রহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয় না। যদি পাঠপদ্ধতি, বিষয় এবং পরিবেশকে ঠিকমত নিয়ন্ত্রিত করা যায় তখন দেখা যাবে যে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে শিক্ষার্থীর পাঠের প্রতি আগ্রহ দেখা দিয়েছে এবং শাস্তি বা পুরস্কার দুইই তাদের প্রয়োজনীয়তা হারিয়েছে।

পুরস্কারের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। যতদূর সম্ভব বাস্তব পুরস্কারদানের প্রথাকে বাদ দেওয়া যায় ততই ভাল। তবে মানসিক পুরস্কারকে নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় অতি-বিচক্ষণতার সংগে ব্যবহার করা চলতে পারে। কিন্তু এই মানসিক পুরস্কারের প্রয়োগও কখনই ব্যক্তিগতভাবে করা উচিত নয়। এ প্রয়োগ করতে হবে দলগত ভাবে। অর্থাৎ পুরস্কার দেওয়া হবে মিলিত দলকে এবং দলের সাফল্যের জন্য, ব্যক্তিকে বা ব্যক্তির সাফল্যের জন্য নয়।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the merits and defects of reward and punishment as incentives to learning in school.

Ans. (পৃঃ ১১১—পৃঃ ১১৯)

2. Punishment has been described as a necessary evil. Do you agree ?

Ans. (পৃঃ ১১৩—পৃঃ ১১৯)

3. Distinguish between order and discipline. Discuss in this connection the place of punishment in the maintenance of discipline. (B. A. 1962)

Ans. (পৃঃ ১০১—পৃঃ ১০৪ + পৃঃ ১১৩—পৃঃ ১১৯)

বার

বংশধারা ও পরিবেশ

শিশুর শিক্ষা-পরিকল্পনায় একাধিক বিরোধী প্রকৃতির ভাবধারার দ্বন্দ্ব প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সমাজতন্ত্র, বিদ্যালয় এবং সমাজ, স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা এই শ্রেণীর একাধিক ভাবদ্বন্দ্বের সাক্ষাৎ আমরা ইতিপূর্বেই পেয়েছি এবং এও দেখেছি যে এই ভাবধারার সংঘাত সম্পূর্ণ বাহ্যিক ও আপাত দৃশ্যমান।

এই ধরনের একটি ভাবসংঘাতের রূপ নিয়ে দেখা দেয় শিশুর ব্যক্তিসত্তাগঠনে দুটি বিভিন্ন প্রকৃতির বস্তুর প্রভাব—একটি বংশধারা, অপরটি হল শিশুর পরিবেশ। এই বিরোধী প্রভাবের প্রকৃতি বুঝতে হলে বংশধারা ও পরিবেশের স্বরূপ ভাল করে জানতে হবে।

বংশধারার স্বরূপ

বংশধারা বলতে সেই সকল বৈশিষ্ট্যকে বোঝায় যা শিশু তার জন্মের মুহূর্তে তার মাতাপিতার কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে এবং তার অন্যান্য পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পরোক্ষভাবে পেয়ে থাকে।*

বংশধারা হল সহজাত বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ যেগুলি শিশু সঙ্গে নিয়ে জন্মায়। শিশু জন্মাবার পরের মুহূর্ত থেকেই নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে সুরু করে। শিশুর চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে প্রতিনিয়ত প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে শিশু সেই সকল বৈশিষ্ট্য অর্জন করে সেগুলি হল শিক্ষার দান এবং সেগুলির সঙ্গে বংশধারাকে মিশিয়ে ফেললে চলবে না।

সাধারণত প্রচলিত ভাষণে আমরা বংশধারা বলতে কেবলমাত্র মাতাপিতার সঙ্গে শিশুর যেটুকু সাদৃশ্য আছে সেইটুকুকেই বুঝে থাকি। কিন্তু সাদৃশ্য যেমন বংশ-

*বংশধারার শরীরতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার জন্য লেখকের "শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান" দ্রষ্টব্য।

ধারার অন্তর্গত তেমনই বৈসাদৃশ্যগুলিও তার বংশধারার একটা অঙ্গ, কেননা সাদৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে বৈসাদৃশ্যগুলিও শিশুর উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে থাকে।

সাধারণভাবে বংশধারাকে আমরা তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি, যেমন, ১। দেহগত (Physical) ২। মানসিক (Mental) এবং ৩। মনঃপ্রকৃতি-গত (Temperamental)। দেহগত বংশধারা বলতে বোঝায় ব্যক্তির আকৃতি গঠন, গায়ের রঙ ইত্যাদি। এই শ্রেণীরই অন্তর্গত হল ব্যক্তির গ্রন্থিগত (glandular) বৈশিষ্ট্যগুলি। শরীরের বিভিন্ন গ্রন্থির (gland) কার্যধারার উপর দেহের বৃদ্ধি ও মনের প্রকৃতি অতি নিবিড়ভাবে নির্ভর করে। ব্যক্তির মানসিক বংশধারার মধ্যে পড়ে নানা বৈশিষ্ট্য। প্রথম, প্রক্ষোভগত (emotional) সংগঠন ও প্রবৃত্তি প্রভৃতি। দ্বিতীয়, চিন্তন (thinking), কল্পন (imagining), ইচ্ছন (willing) প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়া সম্পাদনের সামর্থ্য এবং তৃতীয় হল বিভিন্ন প্রকৃতির মানসিক শক্তি। এই মানসিক শক্তিকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়, সাধারণ শক্তি বা বুদ্ধি এবং বিশেষ শক্তি। বিশেষ শক্তি বলতে বোঝায় বিশেষ কোন ক্ষেত্রে পারদর্শিতা দেখানর ক্ষমতা, যেমন গাণিতিক শক্তি, ভাষামূলক শক্তি, যন্ত্রঘটিত শক্তি ইত্যাদি। মনঃপ্রকৃতি (temperament) বলতে বোঝায় মনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, যাকে আমরা চলতি কথায় মুড বা মেজাজ বলে থাকি। দেখা গেছে মনের মৌলিক কাঠামোটির স্বরূপের দিক ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বেশ পার্থক্য আছে এবং এই পার্থক্যের অনেকখানি সহজাত। অলপোর্ট মনঃপ্রকৃতিকে মনের আভ্যন্তরীণ আবহাওয়া বলে বর্ণনা করেছেন।

পরিবেশ

পরিবেশ কথাটির শব্দগত অর্থ হল ব্যক্তির চতুষ্পার্শ। কিন্তু শিক্ষাবিজ্ঞানে আমরা আরও ব্যাপক অর্থে পরিবেশকে নিয়েছি। পরিবেশের গণ্ডী ব্যক্তির চতুষ্পার্শ টুকুর বাইরে আরও অনেক দূরে বিস্তৃত হতে পারে। শিক্ষাবিজ্ঞানে পরিবেশ বলতে বুঝি সেই সকল শক্তি যেগুলি ব্যক্তির উপর কোন না কোন রূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং ব্যক্তির আচরণকে বদলাতে সক্ষম হয়। এই সংব্যাখ্যান অনুযায়ী কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের সত্যকার পরিবেশ হাজার হাজার বছর আগের মিশর বা ব্যাবিলনের কোনও বিস্মৃত প্রভাতে নিহিত থাকতে পারে, আবার তেমনই কোন জ্যোতির্বিদের পরিবেশ দু'পাঁচশো আলোকবর্ষ দূরের কোনও

অজ্ঞাতনামা নীহারিকাকে ঘিরে গড়ে উঠতে পারে। এক কথায় পরিবেশ হল সেই শক্তি বা শক্তির সমষ্টি যা ব্যক্তির আচরণের উপর প্রত্যক্ষভাবে পরিবর্তন ঘটাতে সমর্থ।

শিশু জন্মাবার মুহূর্ত থেকেই পরিবেশের মধ্যে গিয়ে পড়ে এবং পরিবেশের বিভিন্ন শক্তি তার উপরে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে স্থুরু করে দেয়। শিশুকে সেই পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে খানিয়ে চলতে হয়, নতুবা তার অস্তিত্বই বজায় রাখা সঙ্গীন হয়ে ওঠে। শিশুর এই প্রচেষ্টাকেই সঙ্গতিবিধান (adjustment) বলা হয়। আর এই সঙ্গতিবিধান করতে গিয়ে শিশুর মধ্যে যে আচরণের পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাকেই বলা হয় শিক্ষা। অতএব পরিবেশের কাজ এবং শিক্ষাকে আমরা অভিন্ন বলে ধরে নিতে পারি।

পরিবেশ বড় না বংশধারা ?

এখন একটা জটিল বিতর্ক বহুদিন ধরেই শিক্ষাবিদ্ ও মনোবিজ্ঞানীদের শিরঃপীড়ার কারণ ঘটিয়ে এসেছে। সে বিতর্কটি হল, শিশুর ব্যক্তিসত্তার গঠনে বংশধারা বড় না পরিবেশ বড় ? এ নিয়ে বহু বিতর্ক ও গবেষণা হয়েছে। আমরা এবার সেইগুলির আলোচনা করব।

বংশধারাবাদী

একদল শিক্ষাবিদ্ বলেন যে বংশধারাই সব, পরিবেশের কোন মূল্যই নেই। শিশু যে বংশধারা নিয়ে জন্মাবে সেই বংশধারাই পুরোপুরি তার ব্যক্তিসত্তার প্রকৃতি নির্ণয় করবে, তা তার পরিবেশ যেমনই হোক না কেন। অর্থাৎ পরিবেশ ভাল হওয়া বা মন্দ হওয়াটার কোন গুরুত্ব নেই এবং তা ব্যক্তির বংশধারার মধ্যে কোন পরিবর্তন আনতে পারে না। এঁদের আমরা বংশধারা-বাদী (Hereditarian) বলে বর্ণনা করতে পারি। বাংলা প্রবাদ "গাধা পিটিয়ে মানুষ হয় না" বা ইংরাজী প্রবাদ "শূয়োরের কান থেকে সিল্কের থলি তৈরী হয় না" ইত্যাদি উক্তিগুলি এই বংশধারাবাদেরই সমর্থক। বংশধারাবাদীদের সংব্যাখ্যানে শিক্ষার গুরুত্ব খুবই কম। তারা যখন বংশধারাকে অপরিবর্তনীয় ও অমোঘ বলে ধরে নিয়েছেন তখন শিক্ষার বিশেষ কোন মূল্য থাকতে পারে না। তাঁদের মতে শিক্ষা শিশুর মধ্যে সত্যকারের কোন পরিবর্তনই ঘটাতে পারে না।

পরিবেশবাদী

তেমনই আর একদল শিক্ষাবিদ্ আছেন যাঁরা বংশধারার কোন মূল্য দিতে চান না। তাঁদের কাছে পরিবেশই সব। উপযুক্ত পরিবেশের নিয়ন্ত্রণে শিশুর ব্যক্তি-সত্তাকে খুসীমত গড়ে তোলা যায় তা তার বংশধারা যাই থাকুক না কেন। এঁদের আমরা পরিবেশবাদী (Environmentalist) বলতে পারি। প্রসিদ্ধ আচরণবাদী ওয়াটসন একজন চরম পরিবেশবাদী। তিনি এক জায়গায় বলেছেন যে তাঁকে যদি একটি স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবান শিশু দেওয়া যায় এবং যদি তিনি নিজের ইচ্ছামত পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন তবে তিনি সেই শিশুটিকে তাঁর খুসীমত যে কোন শ্রেণীর মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে পারেন—যেমন, ডাক্তার, আইনজীবী, শিল্পী, ব্যবসাদার, এমন কি ভিক্ষুক বা চোর রূপেও ; শিশুটির পূর্বপুরুষদের প্রতিভা, প্রবণতা, সামর্থ্য, বৃত্তি, জাতি ইত্যাদি যাই হক না কেন, তাতে কিছু এসে যাবে না।

বংশধারাবাদীদের কাছে যেমন শিক্ষার কোন বিশেষ মূল্য নেই, পরিবেশ-বাদীদের কাছে কিন্তু ঠিক তার বিপরীত। পরিবেশবাদীরা বংশধারার বিশেষ কোন মূল্য দেন না। তাঁদের কাছে শিক্ষাই সব। শিক্ষা অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারিণী, অঘটন-ঘটন-পটিয়সী।

পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ

বংশধারাবাদী এবং পরিবেশবাদীদের সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী দুটি সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে আসতে হলে আমাদের এ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণগুলির সঙ্গে প্রথমে পরিচিত হতে হবে। এই বিতর্ককে ভিত্তি করে নানা প্রকৃতির গবেষণা বহুদিন হতেই হয়ে আসছে।

কুলপঞ্জী পর্যবেক্ষণ

বংশধারাবাদীদের মধ্যে প্রথমে ফ্রান্সিস গ্যাল্টনের (Francis Galton) নাম করতে হয়। তিনি ডারউইন প্রভৃতি বিখ্যাত মনীষিদের কুলপঞ্জী পর্যবেক্ষণ করেন এবং তা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে মানুষের ব্যক্তিসত্তা নির্ধারিত

হয় তাঁর উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বৈশিষ্ট্যগুলির দ্বারা। কার্ল পিয়ার্সন (Karl Pearson) পরে গ্যাল্টনের কুলপঞ্জী পর্যবেক্ষণের কাজটি আরও এগিয়ে নিয়ে যান এবং মোটামুটিভাবে গ্যাল্টনের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করেন। নিম্নশ্রেণীর লোকের কুলপঞ্জী পর্যবেক্ষণ সুরু করেন ডাগডেল (Dugdale)। তাঁর প্রসিদ্ধ ইয়ুকস্ (Jukes) পরিবার পর্যবেক্ষণ বংশধারাবাদের স্বপক্ষে যায়। কুখ্যাত অপরাধী ইয়ুকসের পরিবারে নিম্ন-মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির আধিক্য দেখে ডাগডেল সিদ্ধান্ত করেন যে ব্যক্তিসত্তা-গঠনে বংশধারার প্রভাবই সব চেয়ে বেশী। গডার্ডের (Goddard) কালিকাক (Kallikak) পরিবারের পর্যবেক্ষণও বংশধারা-বাদীদের স্বপক্ষে উল্লখ করা চলে। গত আমেরিকা বিপ্লবের সময় এক ব্যক্তি দুটি বিভিন্ন প্রকৃতির নারীর সংস্পর্শে আসে। তাদের মধ্যে একজন উন্নতবুদ্ধি এবং উচ্চবংশ-জাত। অপরটি স্বল্পবুদ্ধি এবং সমাজের নিম্নস্তর থেকে প্রসূত। কালক্রমে এই দুটি নারীকে অবলম্বন করে দুটি বংশ শাখা গড়ে উঠে। দেখা যায় যে উন্নতবুদ্ধি মেয়েটির বংশে উন্নতস্তরের ছেলেমেয়েই বেশী জন্মেছে এবং স্বল্পবুদ্ধি মেয়েটির বংশের অধিকাংশ ছেলেমেয়েই নিম্নস্তরের মানুষ হয়ে জন্মেছে। গডার্ড এছাড়া আরও ৩২৭টি স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তির পরিবারের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করেন এবং দেখেন যে এই পরিবারগুলির মধ্যে শতকরা ৫৪টি ক্ষেত্রে বুদ্ধিস্বল্পতা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া।

যমজ পর্যবেক্ষণ

ব্যক্তির উপর বংশধারা ও পরিবেশের তুলনামূলক প্রভাব নির্ণয়ের জন্য যমজ সন্তান পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি খুবই সহায়ক। যমজ সন্তান দু'শ্রেণীর হতে পারে—সমকোষী বা অভিন্ন যমজ এবং ভিন্নকোষী যমজ। সমকোষী যমজ বলতে বোঝায় যে দুটি শিশুই এক অভিন্ন মাতৃপিতৃ-কোষ থেকে জন্মেছে এবং ভিন্নকোষী-যমজ বলতে বোঝায় যে দুটি সন্তান বিভিন্ন কোষ থেকে জন্মলাভ করেছে। সমকোষী যমজের ক্ষেত্রে বংশধারা একেবারে অভিন্ন। এখন যদি দুটি সমকোষী যমজ শিশুকে জন্মাবার পর থেকেই দুটি বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ করা হয় তাহলে তাদের পর্যবেক্ষণ করে দেখা যেতে পারে যে তাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা দিয়েছে কিনা। যদি দেখা যায় যে তাদের পরিবেশের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি তবে বুঝতে হবে যে বংশধারাই সব, পরিবেশ কিছু

নয়। কিন্তু যদি দেখা যায় যে বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ করার জন্য বংশধারা এক হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা যাচ্ছে তবে বুঝতে হবে যে পরিবেশের প্রভাব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

থর্নডাইক, মেরীম্যান, উইংফিল্ড, হলজিঙ্গার প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা যমজ সন্তান নিয়ে অনেকগুলি পরীক্ষণ চালান। নিউম্যান এবং মুলার প্রায় দশটি ক্ষেত্রের উল্লেখ করেন যেখানে সমকোষী যমজ সন্তানেরা ঘটনাচক্রে দুটি বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হয়েছে। স্থইসিনগার (Schwesinger) এই সমস্ত পরীক্ষণের ফলাফলের একটি সারাংশ তৈরী করেন। তা থেকে দেখা যায় যে সমকোষী যমজ যদি বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হয় তবে তাদের মধ্যে বেশ কিছুটা বৈষম্য প্রকাশ পায়, যদিও তাদের মূলগত সাদৃশ্য অক্ষুণ্ণই থাকে।

বংশধারা ও বুদ্ধি

বুদ্ধির দিক দিয়ে শিশুর ব্যক্তিসত্তানির্ণয়ে বংশধারার প্রভাব বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বুদ্ধির উপর পরিবেশের ক্ষমতা তেমন উল্লেখযোগ্য নয় বলেই অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীর ধারণা। সমকোষী ও ভিন্নকোষী যমজ সন্তান, এক পিতা-মাতার সন্তান, এক গোষ্ঠীগত ভাইবোন প্রভৃতিদের উপর প্রদত্ত বুদ্ধির অভীক্ষার ফলও তত কাছাকাছি। আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক পরিসংখ্যান শাস্ত্রের হিসাব অনুযায়ী এই বিভিন্ন দলের মধ্যে সহপরিবর্তনের (correlation) মানের তালিকা নিম্নরূপ পাওয়া গেছে।

সমকোষী যমজ	...	·৯০
ভিন্নকোষী যমজ	...	·৭৫
এক পিতামাতার সন্তান	...	·৫০
এক গোষ্ঠীগত ভাইবোন	...	·২৫
সম্বন্ধহীন ছেলেমেয়ে	...	·০০

উপরের পরিসংখ্যান থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে যে বংশধারার দিক দিয়ে ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক যত বেশী থাকে তাদের বুদ্ধি বা সাধারণ মানসিক ক্ষমতার মধ্যেও তত বেশী মিল থাকে।

ঐ ছাড়া শিশুর বুদ্ধির সঙ্গে তার পিতামাতার বৃত্তি এবং সামাজিক অবস্থানেরও একটা নিকট সম্বন্ধ পাওয়া গেছে। দেখা গেছে, যে সকল ব্যক্তিরা উন্নত শ্রেণীর বৃত্তি অনুসরণ করেন তাঁদের ছেলেমেয়েরা উন্নতবুদ্ধির হয়, যারা নিম্নশ্রেণীর ব্যবসায়, বা কেরানীগিরি ইত্যাদি পেশা অনুসরণ করেন তাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বুদ্ধির স্বল্পতা দেখা যায়। বুদ্ধির উপর বংশধারার যে যথেষ্ট প্রভাব আছে তা এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে।

শিক্ষায় বংশধারা ও পরিবেশের প্রভাব

বংশধারা ও পরিবেশ নিয়ে এই সকল গবেষণা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তেই আসতে পারি যে ব্যক্তিসত্তার সংগঠনে উভয়েরই অবদান সমান গুরুত্বপূর্ণ। এ দু'য়ের মধ্যে কোন্‌টি বড় এবং কোন্‌টি ছোট, এ বিতর্ক নিষ্প্রয়োজন ও অর্থহীন। কেননা, কেবলমাত্র বংশধারা শিশুর ব্যক্তিসত্তাকে গড়ে তুলতে পারে না, তেমনই কেবলমাত্র পরিবেশও শিশুর পূর্ণ বিকাশ-সাধন করতে পারে না। ব্যক্তিসত্তা এ দু'য়ের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফল। বংশধারা জোগায় কাঁচামাল আর পরিবেশ তাই দিয়ে গড়ে তোলে ব্যক্তিসত্তার পরিণতরূপ।

আবার কেবলমাত্র বংশধারা ও পরিবেশের নিছক যোগফল বা সমষ্টিকেই ব্যক্তিসত্তা ভাবলে ভুল হবে। অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তাকে বিশ্লেষণ করলে কেবল খানিকটা বংশধারা এবং খানিকটা পরিবেশের ফল পাওয়া যাবে যে, তাও নয়। এ দু'য়ের সংঘর্ষে দুইই বদলে যায়, এবং তাদের মধ্য থেকে তৃতীয় একটি সত্তার আবির্ভাব হয়। তারই নাম ব্যক্তিসত্তা।

শিশুর শিক্ষায় বংশধারার প্রভাবের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে হবে। মনে রাখতে হবে শিক্ষার্থীর বংশধারাই তার শিক্ষার গতি ও সীমারেখা নিয়ন্ত্রিত করে দেবে। কি ভাবে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া হবে, কি স্তরের শিক্ষা দেওয়া হবে এবং কোথায় সেই শিক্ষার সীমারেখা টানা হবে এ সকল মূল্যবান্‌ তথ্যগুলি নির্ধারিত করে দেবে বংশধারা।

শিক্ষায় শিক্ষার্থীর দৈহিক বংশধারার প্রভাব তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। দৈহিক আকৃতি, গঠন ইত্যাদি শিশুর শিক্ষাকে তেমন প্রভাবান্বিত করে না। অবশ্য যদি শারীরিক কোনও খুঁত বা অসম্পূর্ণতা থেকে থাকে তবে তা শিশুর শিক্ষায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অ্যাড্‌লারের (Adler) পরীক্ষণ থেকে

দেখা গেছে যে শারীরিক ত্রুটিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের মধ্যে নিম্নতাবোধ (sense of inferiority) প্রচুর জন্মে থাকে।

মানসিক বংশধারা কিন্তু শিশুর শিক্ষাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। বিশেষ করে বুদ্ধির প্রভাব শিক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেখা গেছে যে স্কুল-কলেজের সাফল্য অনেকখানি (·৬০ সহপরিবর্তনের মান) নির্ভর করে বুদ্ধির উপর। অতএব শিশু কি পরিমাণ বুদ্ধির অধিকারী তার উপর তার শিক্ষা উল্লেখযোগ্যভাবে নির্ভরশীল এবং পরিবেশের চাপে বুদ্ধির বিশেষ পরিবর্তন হয় না বলেই সাধারণত মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন। এই ব্যাপারটা বুদ্ধ্যঙ্কের অপরিবর্তনশীলতা নামে মনোবিজ্ঞানে পরিচিত। এই তত্ত্ব অনুযায়ী শিশুর বুদ্ধ্যঙ্ক মোটামুটি ভাবে অপরিবর্তিতই থাকে। অবশ্য কতকগুলি আধুনিক পরীক্ষণে এই সুপ্রতিষ্ঠিত তথ্যের বিরোধিতা করা হয়েছে। দেখা গেছে যে উপযুক্ত পরিবেশের নিয়ন্ত্রণে বুদ্ধ্যাঙ্কের পরিবর্তনও ঘটান যায়। তবে এই তথ্যটি এখনও পুরোপুরি সমর্থিত হয়নি। বুদ্ধি বা সাধারণ মানসিক ক্ষমতা ছাড়া আরও অনেক বিশেষ ক্ষমতা শিশু উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে থাকে যা শিশুর শিক্ষাকে রীতিমত প্রভাবান্বিত করে থাকে। ভাষামূলক শক্তি, যন্ত্রঘটিত শক্তি, গাণিতিক শক্তি ইত্যাদি বিশেষ শক্তিগুলি শিশুর শিক্ষার প্রকৃতি ও কার্যকারিতাকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।

এই সকল তথ্য থেকে আমরা মোটামুটিভাবে ধরে নিতে পারি যে শিশুর মানসিক ক্ষমতা সহজাত ও একরকম অপরিবর্তনীয়। অতএব শিশুর শিক্ষা এই দিক দিয়ে অনেকখানি বংশধারার উপর নির্ভরশীল।

শিশুর মনঃপ্রকৃতিরও শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্ব আছে। এই মনঃপ্রকৃতি শিশুর মনের মৌলিক সংগঠনের স্বরূপ নির্ধারিত করে দেয় এবং তার ব্যক্তিসত্তার কাঠামো গড়ে তোলে। শিশুর মানসিক সংগঠনের সঙ্গে শিক্ষা অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। মনঃপ্রকৃতি বা মনের আভ্যন্তরীণ আবহাওয়ার স্বরূপের উপর শিক্ষার সফলতা অনেকটা নির্ভর করছে এবং মনঃপ্রকৃতি আবার নির্ভর করছে শিশুর বংশধারা বা উত্তরাধিকারের উপর।

কিন্তু তা বলে এ ভাবলেও ভুল হবে যে ব্যক্তিসত্তা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বংশধারার দ্বারা। আগেই বলেছি যে বংশধারা শিক্ষার গতিপথ এবং সীমারেখা নির্ধারিত করে দেয় কিন্তু শিক্ষার মূল অবয়ব গড়ে ওঠে পরিবেশের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। পরিবেশই বংশধারাকে রূপময় করে তোলে

হাতুড়ির কঠিন ঘায়ে যেমন আকৃতিহীন লোহার তাল বিশেষ একটা রূপ নিয়ে প্রকাশ পায় তেমনই পরিবেশের প্রতিক্রিয়ার চাপে গঠনহীন রূপহীন বংশধারা সাবয়ব হয়ে ওঠে। অতএব শিশুর শিক্ষা একদিক দিয়ে যেমন, বংশধারার উপর নির্ভরশীল, তেমনই আবার নির্ভরশীল পরিবেশের বিভিন্নধর্মী প্রতিক্রিয়ার উপর।

এ থেকে আমরা আর একটি অতি মূল্যবান সিদ্ধান্তে পৌছতে পারছি। শিশুর শিক্ষা এবং ব্যক্তিসত্তাগঠনে শিক্ষকের দায়িত্ব হল অসীম। পরিবেশের নিয়ন্ত্রণের উপর যখন শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুগঠন এতখানি নির্ভর করছে তখন শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য যে প্রচুর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শিক্ষক শিশুর বংশধারার প্রকৃতি বদলাতে পারেন না বা তার সঙ্গে কিছুটা যোগ করেও দিতে পারেন না—এ কথা সত্য কিন্তু বংশধারাকে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত করাটা অনেকখানি শিক্ষকের উপর নির্ভর করে। বংশধারার পূর্ণবিকাশ নির্ভর করে পরিবেশের উপর। উপযুক্ত পরিবেশ পেলেই বংশধারা স্বাভাবিক ও সহজ পথে এগোতে পারে, তার বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ পেতে পারে এবং পূর্ণ পরিণতিতে গিয়ে পৌছতে পারে। বংশধারা থাকে অবিকশিত সম্ভাবনা-বৈচিত্র্যের রূপ নিয়ে শিশুর মধ্যে সুপ্ত অবস্থায়। একমাত্র উপযোগী পারিবেশিক শক্তিগুলিই সেই সুপ্ত সম্ভাবনাগুলিকে জাগাতে এবং পূর্ণভাবে বিকশিত করতে পারে

শিক্ষকের কর্তব্য

শিক্ষার্থীর বংশধারার সুষ্ঠু ও পূর্ণ বিকাশের জন্য সুবিবেচক শিক্ষকের কি কি করা উচিত তার একটা বিবরণী নীচে দেওয়া হল।

১। আধুনিক ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির উপর শিক্ষা-ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করা। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন মানসিক শক্তি অনুযায়ী শ্রেণী বিভাজন করা এবং তাদের সামর্থ্যের উপযোগী করে শিক্ষণ-প্রক্রিয়াটির পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ করা।

২। শিক্ষণ পদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞান-সম্মত করে তোলা এবং যাতে শিক্ষার্থী সার্থক ও কার্যকরী শিখন লাভ করতে পারে তা দেখা।

৩। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর চাহিদা, রুচি ও সামর্থ্য পর্যবেক্ষণ করা এবং সেই মত শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারিত করা। একেই পাঠক্রমের বহুমুখীকরণ (diversification) বলে। শিক্ষাকে যত বেশী বিভিন্নমুখী ও বৈচিত্র্যপূণ

করা হবে ততই শিক্ষার্থীর বিভিন্নধর্মী সামর্থ্য ও রুচি বিকশিত হবার সুযোগ পাবে।

৪। শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করা এবং আধুনিক মনোবিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে শিশুর মানসিক অসুস্থতার চিকিৎসা করা।

৫। স্কুলে স্বাস্থ্যপ্রদ পরিবেশ গড়ে তোলা। ক্লাসঘরগুলি যথেষ্ট প্রশস্ত এবং আলো-বাতাসময় করা। খেলাধূলা ও অন্যান্য সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর ব্যবস্থা রাখা।

৬। শিখন-সহায়ক আধুনিক উপকরণগুলির বহুল ব্যবহার করা। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত বিজ্ঞান-সম্মত করে তোলা।

৭। শিক্ষার্থীর দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য নিয়মিত স্বাস্থ্য-পরীক্ষণ করা, চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা এবং স্বাস্থ্য-রক্ষার আইন-কানুন সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদিগকে অবহিত করা।

৮। শিক্ষার্থীর অগ্রগতি মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিমাপ করা। পশ্চাদ্‌পদদের অসাফল্যের কারণ নির্ণয় করা এবং তাদের সংশোধনের জন্য উপযুক্ত নির্দেশ দেওয়া।

৯। সু-পরিচালনা ও সুমন্ত্রণার সাহায্যে শিক্ষার্থীকে তার পক্ষে উপযোগী কর্মসূচী নির্বাচন ও অনুসরণ করতে সাহায্য করা।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the question whether nature or nurture, inherited endowment or environmental influence, has the more potent effect on determining a child's development. (B. T. 1953)

Ans. (পৃঃ ১২৩—পৃঃ ১২৯)

2. Why more stress is now-a-days laid on the influence of environment rather than on heredity in regard to the mental development of children ?

Ans. (পৃঃ ১২৪—পৃঃ ১৩০)*

3. Discuss the relative importance of heredity and environment in either (a) intellectual growth of children or (b) their emotional developments.

Ans. (পৃঃ ১২৬—পৃঃ ১২৯)*

---

*লেখকের 'শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান' দ্রষ্টব্য।

4. "Development is neither an unfolding of heredity without influence from the environment nor a process of being passively moulded by the environment"—Discuss.*
(B. T. 1957).

Ans. (পৃঃ ১২৩—পৃঃ ১২৯)

5. Write an essay on the influence of heredity and environment on the mental development of children.
(B. T. 1958)

Ans. (পৃঃ ১২৩—পৃঃ ১২৯)

6. Discuss the part played by heredity and environment in their distinctive functions ? (B. T. 1959)

Ans. (পৃ: ১২৩—পৃ: ১২৯)

7. How does heredity influence education ?
(B. A. 1957)

Ans. (পৃ: ১২৩—পৃ: ১৩০)

8. Discuss the relative influence of heredity and environment on the educational attainments of children ?
(B. A. 1958)

Ans. (পৃঃ ১২১—পৃঃ ১৩০)

9. What do you understand by nature and nurture ? Which, in your opinion, seems to have more potent effect in determininng a child's development ? Give reason for your answer. (B. A. Hons. 1959)

Ans. (পৃঃ ১২১—পৃঃ ১২৯)

10. What do you understand by nature and nurture ? Develop the idea that nurture is a great factor which moulds human lives in many ways. (B. A. 1960)

Ans. (পৃঃ ১২১—পৃঃ ১২৯)

11. What do you understand by heredity and environment ? Discuss their relative influence on the development of a child. (B. A. 1961)

Ans. (পৃঃ ১২১—পৃঃ ১২৯)

---

* লেখকের 'শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান' দ্রষ্টব্য।

তের

খেলা ও শিক্ষা

শিক্ষা-পরিকল্পনায়, প্রতিপদে আমরা একাধিক পরস্পর-বিরোধী ভাবধারার সংস্পর্শে এসে থাকি। এই ভাব-সংঘাতগুলিই শিক্ষার লক্ষ্যকে অনির্দিষ্ট করে তোলে, তার সহজ গতিপথকে অবরুদ্ধ করে ফেলে এবং শিক্ষার কার্যকলাপকে ক্ষুণ্ণ করে তোলে। অথচ এই ভাবমূলক দ্বন্দ্বগুলি প্রকৃত নয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রতা, বিদ্যালয় এবং সমাজ, শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতা ইত্যাদি ভাব-সংঘাতগুলির প্রকৃতি আলোচনা করার সময় আমরা তার যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি।

এই রকম আর একটি ভাব-সংঘাতের সাক্ষাৎ পাই আমরা খেলা ও শিক্ষার মধ্যে। খেলা এবং শিক্ষা দুটিই প্রাণীমাত্রেরই অতি স্বাভাবিক ও অতি আদিম আচরণ। কিন্তু চিরকালই এ দুটির মধ্যে আমরা একটি বিরাট ব্যবধানের কল্পনা করে এসেছি। সাধারণত খেলাকে প্রাণীর উদ্দেশ্যহীন, অসংলগ্ন ও অনর্থক আচরণ বলে ভাবা হয়ে থাকে এবং শিক্ষাকে উদ্দেশ্যপূর্ণ, সুনিয়ন্ত্রিত ও সার্থক আচরণ বলে মনে করা হয়ে থাকে। ফলে এ দুটির মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে এটা ভাবা দূরে থাকুক, সাধারণ পিতামতা শিক্ষক সকলেই মনে করে এসেছেন যে খেলা ও শিক্ষা পরস্পরবিরোধী। খেলার সময় খেলা, পড়ায় সময় পড়া, এই ছিল প্রাচীন শিক্ষাবিদ্‌গণের নির্দেশ। দুয়ের মধ্যে কোন মিল নেই, থাকতে পারে না। কিন্তু বর্তমানে এ ধারণা বদলে গেছে। খেলাকে আর অর্থহীন অসংলগ্ন আচরণ বলে মনে করা হয় না। বরং আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাবিদ্‌গণ নতুন শিক্ষা পরিকল্পনায় খেলাকে শিক্ষার একটি অতি কার্যকরী মাধ্যম রূপে ব্যবহার করে থাকেন। এ থেকেই খেলা-ভিত্তিক শিক্ষা (Playway) কথাটির সৃষ্টি হয়েছে। খেলার এই আধুনিক ধারণাকে বুঝতে হলে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদ্‌গণ খেলার যে বিভিন্ন সংব্যাখ্যান দিয়েছেন সেগুলির সঙ্গে আগে আমাদের পরিচিত হতে হবে।

খেলার বিভিন্ন তত্ত্ব (Theories of Play)

অতি প্রাচীনকাল হতেই খেলা বস্তুটি কি এবং কেনই বা প্রাণীমাত্রেই খেলে, এ প্রশ্ন দার্শনিক এবং মনোবিজ্ঞানীদের প্রচুর কৌতূহল জাগিয়ে

এসেছে। শিশুর খেলার সংব্যাখ্যানরূপে একাধিক তত্ত্বও আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে।

অতিরিক্ত শক্তি নিষ্কাশনের তত্ত্ব (Theory of Surplus Energy)

খেলার এ তত্ত্বটি বোধকরি প্রাচীনতম। এই মতবাদটি প্রথমে জার্মান কবি ও শিক্ষাবিদ্ শিলার (Schiller) এবং পরে ইংরাজ দার্শনিক স্পেন্সার (Spencer) প্রচার করে থাকেন। এ জন্য এটিকে সময় সময় শিলার-পেন্সার তত্ত্ব বলেও বর্ণনা করা হয়। এই মতবাদ অনুযায়ী ক্রমবিকাশমান শিশুর যে উদ্যম ও শক্তিটুকু তার জীবনধারণের জন্য ব্যয়িত হয় না সেটুকু খেলার মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। এই মতবাদটির মধ্যে কিছুটা সত্য থাকলেও এটিকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না। তার কারণ হল—

প্রথম, এটি খেলার যান্ত্রিক ব্যাখ্যা। বয়লারের মধ্যে যখন বাষ্প অতিরিক্ত হয়ে যায় তখন সেই উদ্বৃত্ত বাষ্পকে বার করে দেবার ব্যবস্থা রাখতে হয়। এই মতবাদে খেলাকে অনেকটা সেই ভাবেই কল্পনা করা হয়েছে। এখানে খেলা একটা পরিষ্কার শরীরতত্ত্বমূলক প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয় এবং যে খেলে তার কোন ইচ্ছা বা অভিরুচির কোন মূল্যই এখানে দেওয়া হয়নি। তা ছাড়া এই মতবাদ অনুযায়ী শারীরিক চাহিদা মেটান ছাড়া খেলার আর অন্য কোন কাজ নেই।

দ্বিতীয়, লাফান, ঝাঁপান, দৌড়ান, হাসা ইত্যাদি খেলার মধ্য দিয়ে যদিও শিশুর প্রচুর শক্তি বহিপ্র্রকাশ পাবার সুযোগ পায় তবুও এমন অনেক খেলা আছে যাতে শিশুর কোনরকম শক্তি বা উদ্যম ব্যয়িত হয় না। এমন কি শিশু যখন অসুস্থ অর্থাৎ যখন অতিরিক্ত শক্তি-নিষ্কাশনের কোন কথাই ওঠে না তখনও তাকে খেলা করতে দেখা যায়।

তৃতীয়, খেলার যে একটা সুসংহত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপ আছে সেটার কোন ব্যাখ্যা এই তত্ত্বে পাওয়া যায় না।

পুনরনুষ্ঠানের তত্ত্ব (Theory of Recapitulation)

এই মতবাদটি যদিও বেশ প্রাচীন তবু ষ্টান্‌লী হল (Stanely Hall) প্রথম এর সুচিন্তিত রূপদান করেন। তাঁর মতে খেলার মধ্য দিয়ে শিশু তার

পূর্বপুরুষদের অনুষ্ঠিত আচরণগুলি নিজের জীবনে সম্পন্ন করে থাকে। শিশুদের বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন খেলা পর্যবেক্ষণ করে হল্ এই সিদ্ধান্ত করেন যে মানবজাতি তার ক্রমবিবর্তনের পর্যায়ে যে সকল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছিল শিশু তার বিভিন্ন বয়সে খেলার মধ্য দিয়ে সেই সকল আচরণের সম্পাদন করে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ, মানবজাতি প্রথমে ছিল নগ্ন, শিকারী, যাযাবর ও নিষ্ঠুর। শিশুও প্রথম জীবনে নগ্নদেহ, পরিভ্রমণশীল ও দয়া-মমতা প্রভৃতি অনুভূতিশূন্য। পরে মানব ধীরে ধীরে সামাজিক হয়ে উঠল, শিশুর মধ্যেও সামাজিক সচেতনতা দেখা দিল। মানুষের জীবনে এল দলগত যুদ্ধের দিন, শিশুও তীর-ধনুক ইত্যাদি নিয়ে খেলা সুরু করল। মানুষও তারপর ধীরে ধীরে স্থায়ী ও সুশৃঙ্খল সমাজ-জীবন যাপন করতে সুরু করল। শিশুও ক্রমশঃ শান্ত, সংযত ও সমাজ-প্রিয় হয়ে উঠল। এইভাবে মানবসভ্যতার অগ্রগতির বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে শিশুর খেলার একটা বাস্তব সঙ্গতি খুঁজে বার করা যেতে পারে। একেই পুনরনুষ্ঠানের (Recapitulation) তত্ত্ব বলা হয়। এই তত্ত্বটির যথেষ্ট চমৎকারিতা থাকলেও নানা কারণে এটিকে সমর্থন করা চলে না।

প্রথম, বিজ্ঞানের দিক দিয়ে এ তত্ত্বটি সমর্থনযোগ্য নয়। মানবজাতির বিভিন্ন যুগের সমষ্টিগত আচরণের সঙ্গে শিশুর আচরণের কোন বাস্তব সম্বন্ধ থাকতে পারে না।

দ্বিতীয়, এ মতবাদে স্বাধীন ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা সম্পন্ন প্রাণীরূপে শিশুকে কল্পনা করা হয় নি। মনে করা হচ্ছে শিশু যেন পুরোপুরি বংশধারার দাস এবং এক অদৃশ্য শক্তির নিয়ন্ত্রণে তাকে আচরণ করে যেতে হচ্ছে। মানুষের আচরণ কেবলমাত্র বংশধারার দ্বারাই নির্ধারিত হয় না। পরিবেশেরও ব্যক্তি-আচরণ নিয়ন্ত্রিত করার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। এই পুনরনুষ্ঠানের তত্ত্বটি কিন্তু এক সময়ে শিক্ষাবিদ্গণের কাছে বিশেষভাবে আদৃত হয়েছিল এবং বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে শিশুর কর্মসূচী নিয়ন্ত্রণে ব্যাপকভাবে এ মতবাদটির প্রয়োগ করা হত। কিন্তু আধুনিক কালে এ তত্ত্বটির বিশেষ মূল্য দেওয়া হয় না।

ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির তত্ত্ব (Theory of Future Preparation)

কার্ল গ্রুস নামে একজন সুইস্ মনোবিজ্ঞানীর মতে শিশুর খেলা তার ভবিষ্যৎ পরিণত জীবনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার প্রয়াসমাত্র। ছোট

মেয়ে যখন পুতুল খেলে বা ছোট ছেলে যখন বাবার চেয়ারে বসে টেলিফোন ধরে তখন আসলে সে তার ভবিষ্যৎ জীবনের আচরণের সঙ্গে নিজেকে পরিচিত করে নিচ্ছে। বিভিন্ন ছেলেমেয়েদের খেলা দেখে বোঝা যাবে যে সে কোন্ ধরনের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার চেষ্টা করছে। যে শিশু কলকব্জা নিয়ে খেলা করে তার সম্বন্ধে বলা চলে যে বড় হয়ে যন্ত্রপাতি-সংক্রান্ত কাজের জন্য প্রস্তুত হওয়াটাই তার আভ্যন্তরীণ ইচ্ছা।

গ্রুসের মতে মানব-শিশু জন্মানর সময় পরিণত জীবনের কোন আচরণই জানে না। অথচ তাকে বাঁচতে হলে সেগুলি শিখতে হবে। এই শিক্ষার মাধ্যম হল খেলা। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীরা জন্মের সময় থেকেই পরিণত জীবনের আচরণে অভ্যস্ত। সেইজন্য তাদের মধ্যে খেলা কম এবং যতই উচ্চতর প্রাণীর ক্ষেত্রে যাওয়া যাবে ততই দেখা যাবে যে খেলার পরিমাণ ও বৈচিত্র্য বাড়ছে। মানুষের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য ও পরিমাণ সর্বাধিক। এই থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে খেলা ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির মাধ্যম বিশেষ।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা অবশ্য স্বীকার করেন যে শিশুর আভ্যন্তরীণ চাহিদাই খেলাকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু খেলাকে পরিণত জীবনের জন্য প্রস্তুতি বলে বর্ণনা করা ভুল হবে। খেলার মধ্যে দিয়ে নানা আচরণ শিশু শেখে একথা মানলেও এটা বলা অতিশয়োক্তি হবে যে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং কৌশলগুলি আয়ত্ত করাটাই শিশুর খেলার উদ্দেশ্য। জ্ঞান ও কৌশল আয়ত্ত করাটা নিছক আনুষঙ্গিক হিসেবেই খেলার সঙ্গে সঙ্গে এসে থাকে।

বিরেচনের তত্ত্ব (Theory of Satharsis)

এ তত্ত্বটিও বহু প্রাচীন, যদিও আধুনিক ফ্রয়েডীয় সংব্যাখ্যানে এর গুরুত্ব আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। এ তত্ত্বটির অর্থ হল শিশু খেলার মধ্য দিয়ে তার মনের অবদমিত কামনাগুলিকে তৃপ্তিদান করে। ফ্রয়েডের মতে মানুষ কতকগুলি আদিম অসভ্যোচিত ইচ্ছা নিয়ে জন্মায়। সেগুলি কিন্তু আমাদের সামাজিক পরিবেশে পূর্ণ হবার সুযোগ পায় না। ফলে শিশু নিজের অজ্ঞাতসারেই সেগুলিকে অবদমিত করতে বাধ্য হয়। এই অবদমিত ইচ্ছাগুলি খেলার মধ্যে দিয়ে তৃপ্তিলাভ করে। যেমন শিশুর জন্মগত একটা আদিম বাসনা হল ময়লা নিয়ে ঘাঁটা (scatophilia)। সভ্য পরিবেশে এটি প্রকাশ্যে নিষিদ্ধ বলে শিশু

খেলার ছলে ধূলো, বালি, কাদা নিয়ে ঘেঁটে তার সেই ইচ্ছাকে তৃপ্ত করে। তেমনই শিশুর হিংসা, যুযুৎসা প্রভৃতির কামনা তৃপ্তি পায় ফুটবল, হা-ডু-ডু ইত্যাদি প্রতিযোগিতামূলক খেলার মধ্য দিয়ে।

ফ্রয়েডের এই ব্যাখ্যানের মধ্যে যে যথেষ্ট সত্য আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। খেলার মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্ততা ও স্বাভাবিকতা থাকে তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে এর পিছনে মনের জোর তাগিদ নিশ্চয়ই আছে এবং খেলার শেষে যে আনন্দ শিশু পায় তা থেকেও এ সিদ্ধান্ত করা যায় যে খেলার মধ্যে দিয়ে শিশুর কোন অতৃপ্ত কামনার তৃপ্তি ঘটেছে। তবে ফ্রয়েডের এই ব্যাখ্যাটি পুরোপুরি মনোবৈজ্ঞানিক। অতৃপ্ত কামনার তৃপ্তিদান ছাড়াও শিশুর জীবনে খেলার আরও প্রভাব আছে। মনোবৈজ্ঞানিক দিক ছাড়াও খেলার একটা দার্শনিক দিক আছে।

জীবন-সক্রিয়তার তত্ত্ব (Theory of Life Activity)

খেলার এই তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা দিয়েছেন জন ডিউই। তিনি খেলাকে জীবন-সক্রিয়তার একটি প্রকার ভেদ রূপে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে সক্রিয়তা প্রাণী-মাত্রেরই অস্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্য। জীবন মানেই সক্রিয়তা। অতএব প্রাণী কাজ করা ছাড়া বাঁচতেই পারে না। কর্ম তার প্রাণের পরিচায়ক। এখন ব্যক্তিগত কাজ নানা রূপ হতে পারে। শিশুর ক্ষেত্রে তা হল খেলা, অর্থাৎ এমন কর্ম যা কোন বিশেষ লক্ষ্যের প্রতি উদ্দিষ্ট নয়। শিশু যখন বড় হয় তখন তার এই কাজ দু শ্রেণীর হয়ে যায়, লক্ষ্য-উদ্দিষ্ট এবং লক্ষ্য-হীন। লক্ষ্য-উদ্দিষ্ট সক্রিয়তাকে আমরা কাজ বলে থাকি, লক্ষ্যহীন সক্রিয়তাকে বলে থাকি খেলা। পরিণত ব্যক্তিরা লক্ষ্য-উদ্দিষ্ট এবং লক্ষ্য-হীন দুরকম কাজই করে থাকে। শিশু কেবল লক্ষ্যহীন কাজই জানে।

খেলার এই ধরনের একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন ফ্রয়েবেল। তাঁর মতে খেলা হচ্ছে শিশুর আত্ম-সক্রিয়তা। অন্তর্নিহিত সত্তাকে স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের পথে নিয়ে যেতে হলে প্রয়োজন খেলার। এই জন্যই ফ্রয়েবেলের প্রবর্তিত কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে খেলা একটা বিশেষ স্থান অধিকার করেছে।

এই তত্ত্বগুলির মধ্যে কোন্‌টি ভুল কোন্‌টি ঠিক, বলা সম্ভব নয়। প্রত্যেকটি মতবাদেই অল্পবিস্তর সত্য আছে। তবে অতিরিক্ত শক্তিনিষ্কাশনের তত্ত্ব এবং পুনরানুষ্ঠানের তত্ত্ব, এ দুটিকে নিতান্তই অসম্পূর্ণ বলে বাদ দিতে পারি। ভবিষ্যৎ

প্রস্তুতির ব্যাখ্যাটি সত্য হলেও পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বরূপে ওটিকে নেওয়া যায় না, কেননা জ্ঞান অর্জন বা কৌশল আয়ত্তকরণকে খেলার মূল লক্ষ্য বলা চলে না। তবে খেলার মাধ্যমে যে শিশু প্রচুর জ্ঞান এবং কৌশলের অধিকারী হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেটিকে শিশুর খেলার লক্ষ্য বললে ভুল হবে। খেলার বিরেচন তত্ত্বটিকে মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যারূপে গ্রহণ করা চলতে পারে। খেলার মধ্য দিয়ে যে শিশুর অতৃপ্ত চাহিদাগুলি তৃপ্ত হয় এ কথা অনস্বীকার্য। বিশেষ করে পরিণত বয়সের খেলাগুলির মধ্য দিয়ে ব্যক্তির অতৃপ্ত কামনাগুলি তৃপ্ত হবার যে সুযোগ পায় এও প্রমাণিত সত্য। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে এই ব্যাখ্যা নির্ভুল হলেও শিক্ষাবিজ্ঞানের দিক দিয়ে এ ব্যাখ্যাটিকে সম্পূর্ণ বলা চলতে পারে না। জন ডিউইর জীবন সক্রিয়তার ব্যাখ্যাটাই এই তত্ত্বগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য। প্রাণীর অস্তিত্ব ও বিকাশ সক্রিয়তার উপর নির্ভরশীল এবং খেলা সেই সক্রিয়তার একটা বিশেষ রূপ। এই ব্যাখ্যায় খেলাকে জীবন-প্রয়াসেরই একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

খেলা-ভিত্তিক শিক্ষা (Playway in Education)

খেলা এবং শিক্ষার মধ্যে প্রাচীন শিক্ষাবিদ্‌গণ যে দুস্তর ব্যবধানের কল্পনা করতেন আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় সেটা একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তার পরিবর্তে দেখা দিয়েছে খেলাকে শিক্ষার একটা কার্যকরী মাধ্যম করে তোলার প্রচেষ্টা। ক্যাল্ডওয়েল কুক (Caldwell Cook) নামক একজন শিক্ষাবিদ্‌ প্রথম খেলা-ভিত্তিক শিক্ষা কথাটির প্রবর্তন করেন। খেলা-ভিত্তিক শিক্ষাকে একটি বিশেষ কোন শিক্ষাব্যবস্থা বলে ভাবলে ভুল হবে। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিভূ বিশেষ এবং আধুনিক শিক্ষা-সংস্কারের আন্দোলনের মূল বক্তব্যটিই এর মাধ্যমে প্রতিফলিত হচ্ছে।

খেলার দশটি বৈশিষ্ট্য

খেলাকে কেন শিক্ষার ভিত্তি করা উচিত এবং কেমন করেই বা করা যায় সেটি বুঝতে হলে খেলার প্রকৃত স্বরূপটি আমাদের জানতে হবে। শিশুর খেলা পর্যবেক্ষণ করলে যে বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেগুলি হল এই—

প্রথম, খেলা একটি স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ। শিশু নিজে নিজেই খেলে, খেলার জন্য তাকে কোনরূপ চাপ বা বাহ্যিক উদ্‌বোধক দিতে হয় না।

দ্বিতীয়, খেলা একটি স্বাধীন প্রক্রিয়া। অর্থাৎ খেলার সময় শিশু সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। তার আচরণের উপর কোন রূপ বাইরের শক্তির হস্তক্ষেপ থাকে না।

তৃতীয়, খেলার মধ্যে যে শৃঙ্খলা, সে শৃঙ্খলা অন্তর্জাত। খেলার সময় শিশুকে বহু নিয়মকানুন, বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়। কিন্তু এগুলি বাইরের কোন শক্তির দ্বারা চাপান হয় না। এগুলি সম্পূর্ণ স্ব-আরোপিত এবং খেলার সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্যই শিশুর নিজের দ্বারা বিরচিত।

চতুর্থ, খেলার সময় মনোযোগ, উন্মুখতা, আনুগত্য, বাধ্যতা প্রভৃতি গুণগুলি নিজে থেকেই দেখা দেয়। তার জন্য কোন বাহ্যিক বা কৃত্রিম উদ্‌বোধক লাগে না।

পঞ্চম, খেলা মাত্রেই সৃজনমূলক। শিশুর সৃজনস্পৃহা খেলার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। খেলার ছলে শিশু যা সৃষ্টি করে বড়দের কাছে তার কোন মূল্য না থাকলেও শিশুর কাছে তা পরম অর্থপূর্ণ।

ষষ্ঠ, খেলা উদ্দেশ্যমূলক, সুনিয়ন্ত্রিত ও সার্থক আচরণ। খেলাকে যে সাধারণত অর্থহীন, অসঙ্গত উদ্দেশ্যহীন শক্তি ও সময়ের অপচয় বলে মনে করা হয় তা ভুল। শিশুর খেলার উদ্দেশ্যটা বড়দের কাছে পরিস্ফুট না হলেও শিশুর নিজের কাছে তা বেশ ভালভাবেই জানা থাকে।

সপ্তম, খেলার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এর মাধ্যমে শিশু নানা জ্ঞান এবং কৌশল শিখে থাকে। এইজন্যই কার্ল গ্রুস প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্‌গণ খেলাকে শিশুর ভবিষ্যতের প্রস্তুতি বলে বর্ণনা করেছেন।

খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর দেহের যেমন পুষ্টিসাধন হয় তেমনই তার মানসিক, অনুভূতিমূলক, এবং সামাজিক দিকগুলিও পরিণতি লাভ করে। বিশেষ বিশেষ খেলার মাধ্যমে শিশুর মনন ও কল্পন শক্তিরও বিকাশ হয়। সময় সময় খেলা এমন স্তরে গিয়ে পৌঁছতে পারে, যখন এটি জটিল একটি সমস্যার আকার ধারণ করে। এই ধরনের খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর চিন্তন ও বিচারকরণের শক্তি বিকশিত হয়।

অষ্টম, খেলা শিশুর অবদমিত কামনাগুলিকে তৃপ্ত করে তার মনের শান্তি এবং সমতা বজায় রাখে। বাস্তব জীবনে যে সকল কামনা শিশু নানা কারণে পূর্ণ

করতে পারে না সেগুলি সে খেলার মাধ্যমে পূর্ণ করে। খেলা অবাঞ্ছিত কামনাকে বাঞ্ছিত পথে নিয়ে গিয়ে তার তৃপ্তিসাধন করে থাকে। শিশুর অসামাজিক প্রবৃত্তিগুলি খেলার মাধ্যমে উন্নীত (sublimated) হতে পারে এবং ফলে তার মানসিক অস্থিরতা দূর হয়ে যায়। এই থেকেই উদ্ভূত হয়েছে খেলার বিরেচনের তত্ত্বটি। অতএব দেখা যাচ্ছে যে খেলার সঙ্গে শিশুর মানসিক তৃপ্তির একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে।

নবম, খেলা শিশুর বিকাশ প্রচেষ্টার সঙ্গে অভিন্ন। ডিউইর মতে প্রাণীমাত্রেই বিকাশ লাভ করে সক্রিয়তার মধ্যে দিয়ে এবং খেলাই হচ্ছে সেই সক্রিয়তার একটা স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত রূপ। এইজন্য ডিউই খেলাকে জীবন-সক্রিয়তার একটা প্রকারভেদ বলে বর্ণনা করেছেন।

খেলা এবং কাজ

দশম এবং সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, খেলার উদ্দেশ্য খেলার মধ্যেই নিহিত। খেলার তৃপ্তি খেলাতেই এবং এর কোন বহিস্থিত লক্ষ্য বা গন্তব্য নেই। এইখানেই খেলার সঙ্গে কাজের পার্থক্য। কাজের একটা বহিস্থিত লক্ষ্য আছে, সেটা পাওয়াতেই কাজের তৃপ্তি। কাজের তৃপ্তি কাজের মধ্যে নেই, আছে বাইরে, কিন্তু খেলার তৃপ্তি খেলার মধ্যেই।

সাধারণত আমরা কতকগুলো আচরণকে খেলা এবং কতকগুলো আচরণকে কাজ বলে বর্ণনা করে থাকি। আসলে তেমন কোন সুনির্দিষ্ট বিভাজন রেখা এ দুয়ের মধ্যে নেই। একই আচরণ খেলা হতে পারে, আবার কাজও হতে পারে। নির্ভর করছে আচরণটির লক্ষ্যের উপর। যদি লক্ষ্যটি আচরণটির মধ্যেই থাকে, অর্থাৎ আচরণটি সম্পন্ন করাই যদি আচরণের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে ঐ আচরণটি খেলার পর্যায়ে ফেলা যাবে, আর যদি ঐ আচরণটির লক্ষ্য থাকে বাইরে, অর্থাৎ ঐ লক্ষ্যটি পাওয়াই হচ্ছে আচরণ সম্পাদনের প্রধান উদ্দেশ্য তাহলে ঐ আচরণটিকে কাজ বলা হবে। যে ফুটবল খেলে নিছক ফুটবল খেলার উদ্দেশ্যেই, তার কাছে ফুটবল খেলাটা সত্যকারের খেলা। আর যে ফুটবল খেলে জীবিকা-অর্জনের জন্য, তার কাছে ফুটবল খেলাটা কাজের পর্যায়ে পড়ে। অবশ্য সময় সময় খেলা এবং কাজ পরস্পরের সঙ্গে এমন ভাবে মিলে যেতে পারে যে আচরণের কতটুকু খেলা এবং কতটুকু কাজ তার নিখুঁত সীমারেখা বার করা শক্ত হয়ে ওঠে।

খেলা-ভিত্তিক শিক্ষার স্বরূপ

অতএব দেখা যাচ্ছে যে খেলা এমনই একটি আচরণ যা স্বতঃপ্রণোদিত, স্বাভাবিক, স্বাধীন এবং তৃপ্তিকর। তার উপরে খেলা উদ্দেশ্যবিহীন বা অর্থহীনও নয়। উপযুক্ত পরিবেশ ও উপকরণের সহায়তায় খেলার মধ্য দিয়ে যে কোন স্তরের উদ্দেশ্যের সার্থকসিদ্ধি ঘটানো যেতে পারে।

এই সকল বৈশিষ্ট্যের জন্যই খেলাকে শিক্ষার মাধ্যম করে তোলাটা আধুনিক শিক্ষাসংস্কারের কর্মসূচীর প্রধানতম অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষাকার্যের সঙ্গে যাঁরাই সংশ্লিষ্ট আছেন তাঁদের একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা হল যে শিশু স্বাভাবিকভাবে পাঠগ্রহণে কখনই রাজী হয় না এবং শাস্তি, পুরস্কার ইত্যাদি অস্বাভাবিক পন্থায় তাকে পাঠগ্রহণে বাধ্য করতে হয়। অথচ খেলার ক্ষেত্রে শিশুকে কোনরূপ বাহ্যিক চাপও দিতে হয় না এবং সেখানে শৃঙ্খলা বজায় রাখাটা একটা সমস্যাই নয়। অতএব শিক্ষাকে যদি খেলার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায় তবে শিশুর শিক্ষার প্রতি বীতরাগ, ভীতি প্রভৃতি আর থাকবে না এবং সে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবেই ব্যাকরণ বা ভূগোলের পাঠ গ্রহণে উৎসাহিত হবে, যেমন সে উৎসাহিত বোধ করে প্রজাপতির পিছনে ছুটতে বা বালি দিয়ে রাজপ্রাসাদ তৈরী করতে। এই চিন্তাধারা থেকে জন্ম নিয়েছে আধুনিক খেলা-ভিত্তিক শিক্ষার পরিকল্পনা।

শিক্ষাকে খেলাভিত্তিক করার মানে কিন্তু এ নয় যে প্রচলিত অর্থে যাকে আমরা খেলা বলি সেই খেলার পরিমাণ শিক্ষায় বাড়িয়ে দেওয়া। খেলা বলতে এখানে সেই সকল আচরণকে বোঝায় যার সম্পাদনের জন্য শিশু স্বাভাবিক আগ্রহ বোধ করে। অর্থাৎ এক কথায় শিক্ষাকে সম্পূর্ণ আগ্রহ-ভিত্তিক করে তুলতে হবে। শিক্ষার পদ্ধতি এবং বিষয়বস্তু দুইই এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে শিশুর শিক্ষাগ্রহণে স্বাভাবিক ইচ্ছা এবং প্রচেষ্টা দেখা যায়। অনেক শিক্ষাবিদই শিক্ষাকে শিশুর আগ্রহানুকূল করাটার ভুল অর্থ করেন। তাঁরা ভাবেন যে শিক্ষাব্যবস্থাকে শিশুর মনোমত করার অর্থ হচ্ছে যে শিক্ষার গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া। শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে অনেক দুরূহ এবং জটিল বস্তু আছে যা শেখা শিশুর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন এবং তাঁদের মতে শিক্ষাকে শিশুর পক্ষে মনোরম করে তুলতে হলে সেগুলিকে বাদ দিতে হবে। এককথায় এই সমালোচকগণ মনে করেন যে শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করতে হলে পাঠক্রমটি রমণীয় ও সহজ বস্তু দিয়ে ভরিয়ে তুলতে হবে এবং সেখানে কোন দুরূহ বা জটিল বস্তুর স্থান হবে না। কিন্তু এ ধারণা নেহাৎই ভ্রান্তিজনক।

শিক্ষায় শিশুর আগ্রহ নির্ভর করে তার চাহিদা এবং প্রেষণার উপর। যে বস্তুটির প্রতি শিশুর চাহিদা আছে এবং যার জন্য শিশু স্বাভাবিকভাবেই প্রেষণা বোধ করে থাকে, সেটি আয়ত্ত করতে শিশু চেষ্টার কোন ত্রুটিই করে না। দুরূহতা বা জটিলতার কোন প্রশ্নই সেখানে ওঠে না। শিশু যখন কোন বিষয় শিখতে একবার উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে তখন দেখা গেছে যত রকম প্রতিবন্ধকই তার সামনে আসুক না কেন সে তা অনায়াসে অতিক্রম করে যায়, অবশ্য যদি না সেটা তার সাধ্যাতীত হয়। অতএব শিক্ষাকে খেলা-ভিত্তিক বা আগ্রহ-ভিত্তিক করতে হলে যে তাকে অতি-সহজ বা অতি-সরল করে তুলতে হবে একথা একান্ত ভুল। পাঠ-ক্রমের দুরূহতা জটিলতা প্রভৃতি অক্ষুণ্ণ রেখেই শিক্ষাকে খেলাভিত্তিক করা চলতে পারে।

শিক্ষাকে খেলা-ভিত্তিক করার পন্থা

খেলা-ভিত্তিক শিক্ষা কোন একটি বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা নয়। সকল শিক্ষা-পরিকল্পনাতেই এই নীতির প্রয়োগ চলতে পারে এবং আধুনিক অধিকাংশ শিক্ষা-ব্যবস্থাতেই এ নীতি অল্প বিস্তর গ্রহণ করা হয়েছে। সত্য বলতে কি শিক্ষার প্রগতিশীল চিন্তাধারার মর্মার্থই এই খেলাভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে নিহিত রয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থাকে খেলা-ভিত্তিক করতে হলে নীচের বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

প্রথম, শিক্ষণ-পদ্ধতি শিক্ষার্থীর গ্রহণ-সামর্থ্যের উপযোগী হবে।

দ্বিতীয়, পাঠক্রম শিক্ষার্থীর চাহিদার সঙ্গে সুসমন্বিত হবে। বিষয়গুলির বিভাজন এবং বিভিন্ন পর্যায়ের বিন্যাস এমন হবে যাতে শিশু সেই পাঠের মধ্যেই তৃপ্তি খুঁজে পাবে। পাঠক্রমের অন্তর্গত অভিজ্ঞতাগুলি যেন শিশুর বাস্তবজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকে।

তৃতীয়ত, শিশুর স্বাধীনতার উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না। শৃঙ্খলা হবে স্বাভাবিক এবং অন্তর্জাত। তার জন্য প্রয়োজন সমাজধর্মী পরিবেশের গঠন। বহির্জাত শৃঙ্খলা বা শাস্তি-পুরস্কার ইত্যাদি কৃত্রিম উদ্‌বোধকের ব্যবহার একেবারে পরিত্যাজ্য।

চতুর্থ, বিদ্যালয়-পরিবেশকে এমন করে গড়ে তুলতে হবে যাতে শিশুর সকল রকম চাহিদা সেখানে পরিতৃপ্তি খুঁজে পায়। দলগত উদ্যোগ, যৌথ কর্মপ্রচেষ্টা,

পর্যাপ্ত সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী, প্রজেক্ট, পাঠাগার, মিউজিয়াম, ভ্রমণ ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুর বহুমুখী বিকাশপ্রচেষ্টা যেন অভীষ্ট পুষ্টিলাভ করতে পারে।

পঞ্চম, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক সমানুভূতি এবং পারস্পরিক আদান-প্রদানের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। বিদ্যালয় পরিবেশের মধ্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই পারস্পরিক ভাব-বিনিময় ও সাধারণ অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে এমন এক সুসংবদ্ধ বিদ্যালয়-সমাজ গড়ে তুলবেন, যেখানে শিক্ষা হয়ে দাঁড়াবে খেলার মতই একটি স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত, তৃপ্তিকর প্রক্রিয়াবিশেষ।

ষষ্ঠ, শিক্ষা-প্রক্রিয়ায় গতানুগতিক চিরাচরিত পদ্ধতির মধ্যে নতুনত্ব আনতে হবে। পাঠ-গ্রহণকে এমনভাবে পরিকল্পিত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী তার মধ্যে বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব খুঁজে পায়। সনাতন বক্তৃতাপদ্ধতিতে শেখানর চেয়ে পঠনীয় বিষয়টিকে সক্রিয় উদ্যোগে পরিণত করতে পারলে শিক্ষার্থী সহজেই আকৃষ্ট হবে। বিতর্ক, আলোচনা, অভিনয়, প্রজেক্ট প্রভৃতি যতই পাঠক্রমের অন্তর্গত হবে ততই শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক মনোযোগ ও আগ্রহ সেদিকে যাবে।

প্রশ্নাবলী

1. In all play we find an element of joy, and on this account we find play associated with the fine arts. Show that play is a good means of sublimation. (B. T. 1952)

Ans. (পৃঃ ১৩৫—পৃঃ ১৩৯)

2. Work is conscious activity dominated by the object which it seeks to produce and drudgery is conscious activity whose value is not evident to the actor. How far should play impulse be utilised in overcoming drudgery and hard work. (B. T. 1953)

Ans. (পৃঃ ১৩৭—পৃঃ ১৪২)

3. Write short notes on Playway in Education. (B. A. 1957)

Ans. (পৃঃ ১৩৭—পৃঃ ১৪২)

4. It is said that our school should be a place in which work is play and play is life. Three in one and one in three.' —Elucidate. (B. T. 1957)

Ans. (পৃঃ ১৩৭—পৃঃ ১৪২)

5. Describe critically the different theories of play.

Ans. (পৃঃ ১৩২—পৃঃ ১৩৭)

6. What do you mean by Playway in Education? Illustrate your answer with examples. (B. A. 1960)

Ans. (পৃঃ ১৩৭—পৃঃ ১৪২)

7. What do you mean by 'work' and 'play'? How are they distinguished from each other? Give examples. (B. A. 1961)

Ans. (পৃঃ ১৩৭—পৃঃ ১৪০)

চৌদ্দ

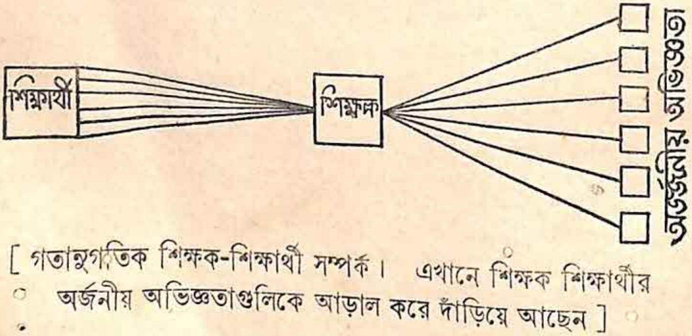
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

এর পূর্বের অনুচ্ছেদগুলিতে আমরা দেখেছি যে বহু বিরোধী-ধর্মী ভাবসত্তার পারস্পরিক সংঘাতে শিক্ষার ক্ষেত্রটি জর্জরিত। এই বিভিন্ন সংঘাতের প্রভাবে শিক্ষার লক্ষ্য, পদ্ধতি, ও বিষয়বস্তু এতদিন অনিশ্চিত ও সমস্যাময় হয়ে ছিল। আমাদের আলোচনাগুলির মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল এই সংঘাতগুলির অবাস্তবতা প্রমাণ করা। ব্যক্তি-সমষ্টি, বিদ্যালয়-সমাজ, শৃঙ্খলা-স্বাধীনতা, বংশধারা-পরিবেশ ইত্যাদি একাধিক ভাবসংঘর্ষের প্রকৃতি আলোচনার সময় আমরা দেখেছি যে এ সংঘর্ষগুলির মধ্যে কোন বাস্তবতা নেই। এগুলি পুরোপুরি আমাদের ভ্রান্তধারণা থেকেই প্রসূত।

এইরকম আর একটি বিপরীতধর্মী-সত্তার সংঘর্ষের সন্ধান আমরা পাই শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কের মধ্যে।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্বন্ধ—প্রাচীন ও আধুনিক

গতানুগতিক শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কাজ হল একেবারে পরস্পরের বিপরীত। শিক্ষক জ্ঞান প্রদান করেন, শিক্ষার্থী গ্রহণ করে। একজন দাতা, আর একজন গ্রহীতা। শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে সার্থক এবং কার্যকরী করে

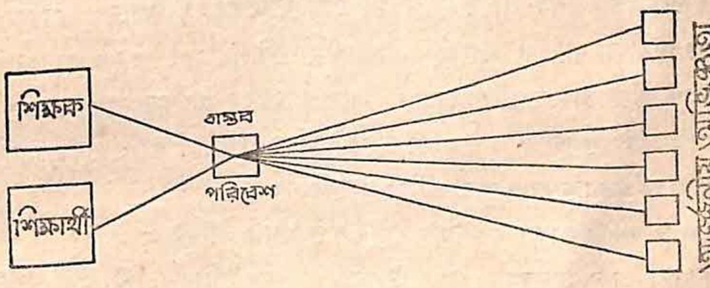


[গতানুগতিক শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক। এখানে শিক্ষক শিক্ষার্থীর অর্জনীয় অভিজ্ঞতাগুলিকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছেন]

তুলতে হলে এ দুটি বিপরীত-ধর্মী সত্তাকে একযোগে কাজ করতে হবে। নতুবা শিক্ষাই সম্ভব হবে না। এই সংব্যাখ্যানে শিক্ষার্থী তার পক্ষে অবশ্য অর্জনীয়

অভিজ্ঞতাগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে আহরণ করতে পারে না। শিক্ষক সেগুলির একমাত্র পরিবেশকরূপে কাজ করেন। এর ফলে শিক্ষার্থী তার জীবন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন শিক্ষক তার অভিজ্ঞতাগুলিকে আড়াল করে এবং তাঁর মাধ্যমেই শিক্ষার্থী পরোক্ষভাবে পরিচিত হতে পারে তার জীবনের অপরিহার্য অভিজ্ঞতাগুলির সঙ্গে। তিনি যেন সেই অভিজ্ঞতাগুলি হতে নির্যাস প্রস্তুত করে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেন এবং শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের দেওয়া সেই পূর্ণাঙ্গ ত্রুটীহীন জ্ঞান লাভ করেই সন্তুষ্ট থাকে।

কিন্তু আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কের এ ব্যাখ্যা পরিত্যক্ত হয়েছে। এখানে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের কাজ বিপরীতধর্মী নয়। শিক্ষার্থী শিক্ষকের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর মাধ্যমে জ্ঞান ও চিন্তাধারার পাঠ গ্রহণ করে না। বা তার অর্জনীয় অভিজ্ঞতাগুলির সঙ্গে পরোক্ষভাবে পরিচিতি লাভ করে না। এখানে শিক্ষার্থী তার বাস্তব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরিবেশের সঙ্গে তার সাধ্যমত সুসঙ্গতি-বিধানের চেষ্টা করে। শিক্ষকের স্থান আজ শিক্ষার্থীর বিপরীতে নয়, শিক্ষার্থীর পাশে। আধুনিক যুগে শিক্ষার্থী প্রত্যক্ষভাবেই তার জীবন-সমস্যার সমাধানে নিযুক্ত হয়, শিক্ষক থাকেন তার সহায়করূপে তার পাশে। তিনিও শিক্ষার্থীর সঙ্গে মিলিতভাবে তার অভিজ্ঞতায় অংশগ্রহণ করেন এবং তাকে তার সমস্যাসমাধানে উপযুক্ত নির্দেশ ও সুমন্ত্রণা দিয়ে থাকেন। শিক্ষক সেই গতানুগতিক



[আধুনিক শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক। এখানে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সহায়করূপে বাস্তব পরিবেশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে তার অর্জনীয় অভিজ্ঞতাগুলিলাভে সাহায্য করছেন]

শিক্ষাব্যবস্থার মত শিক্ষার্থী এবং তার অভিজ্ঞতার মাঝে দাঁড়িয়ে থেকে তাকে তার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন থেকে আর বঞ্চিত করেন না।

এই নূতন শিক্ষক শিক্ষার্থী সম্পর্কের পরিকল্পনায় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে

আচরণ বা প্রকৃতির দিক দিয়ে কোন বিরোধ নেই। ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই সৌহার্দ্যপূর্ণ ও প্রীতিময়। গতানুগতিক পরিকল্পনায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক ছিল আড়ষ্ট, অস্বাভাবিক এবং প্রায় ক্ষেত্রেই তিক্ততাপূর্ণ। শিক্ষক তাঁর সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী কাজের সম্বন্ধে সচেতন থাকতেন এবং যথাসম্ভব নিজেকে শিক্ষার্থী থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতেন। অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষকের মধ্যে একটা উচ্চতাবোধ জন্মাত এবং তিনি নিজের পদ-মর্যাদা এবং কার্য সম্বন্ধে একটা অতি-উন্নত ধারণা পোষণ করতেন। এই সকল কারণে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে আদান-প্রদান চলত দুটি অসমান স্তর থেকে এবং শিক্ষক ব্যক্তি হিসেবে যতই ভালই হোন না কেন, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মৌলিক বিরোধিতা কোন দিক দিয়েই যাবার ছিল না। এই দুই অসমান স্তরের দুটি মানুষের মধ্যে সত্যকারের সমাজ-ধর্মী ঐক্যবোধ গড়ে উঠত না এবং কখনই শিক্ষক ও শিক্ষার্থী একই সমাজের অন্তর্গত হয়ে উঠতে পারতেন না। শিক্ষককে চিরকালই মনে করা হত অন্য সমাজের মানুষ। প্রয়োজন হলে তিনি সাময়িকভাবে শিক্ষার্থী সমাজে প্রবেশ করতেন মাত্র।

ফলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে কখনই স্বাভাবিক শৃঙ্খলাবোধ জাগাতে পারতেন না। বাধ্য হয়ে তাঁকে আশ্রয় গ্রহণ করতে হত নানা অস্বাভাবিক পন্থার। তাঁর ব্যক্তিত্বকে করে তুলতে হত গাম্ভীর্যময়, কঠোর এবং সময় সময় ভীতিকর। সহজভাবে তিনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিশতে পারতেন না, তাদের একজন হয়ে উঠতে পারতেন না এবং প্রায়ই এক কৃত্রিম উদাসীনতা ও দূরত্বের আবরণে নিজেকে ঢেকে রাখতে বাধ্য হতেন। এতেও যেখানে ফল হত না সেখানে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য তাঁকে আশ্রয় নিতে হত নিন্দা-প্রশংসা, শাস্তি-পুরস্কার, কঠোর বিধিনিষেধ ইত্যাদি নানা অস্বাভাবিক উপকরণের।

আজকের শিক্ষকের রূপ কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরকম। তিনি এখন আর শিক্ষার্থীর জ্ঞান-দাতা, চক্ষু-উন্মেষক কোন উন্নতস্তরের অপরিচিত প্রাণী নন। তিনি শিক্ষার্থীদেরই সমাজের একজন—একাধারে সহায়ক, সহ-কর্মী, সচিব এবং হিতৈষী বন্ধু। তাঁকে ঘিরে অবাস্তব মর্যাদা বা গৌরবের কোন জ্যোতির্মণ্ডল নেই। তিনি শিক্ষার্থীদের মতই একজন দোষে-গুণে মিলিয়ে সহজ সাধারণ মানুষ, অতিরিক্তের মধ্যে তাঁর আছে অধিক অভিজ্ঞতা, শিক্ষার্থীদের প্রতি সহানুভূতি এবং তাদের সাহায্য করার আন্তরিক ইচ্ছা। শিক্ষক সম্বন্ধে অতীতের অতিমানবিক দেব-সুলভ পরিকল্পনাটি এখন লুপ্তপ্রায়।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কও এইরকম সহজ, সরল ও স্বাভাবিক ছিল। সেখানে আশ্রমবাসী গুরু-শিষ্যগণ সকলে মিলে একটি অখণ্ড সমাজ তৈরী করতেন এবং মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সকলে সকল প্রকার অভিজ্ঞতা অর্জন করতেন। জ্ঞানের দিক দিয়ে শিষ্যের চেয়ে গুরু অনেক উন্নত হলেও পারস্পরিক সহজ আদান প্রদান, ভাব-বিনিময়ের কখনই অভাব হত না। প্রাচীন গ্রীসেও গুরু শিষ্যের মধ্যে বেশ সহজ নিবিড় যোগসূত্র বিরাজ করত। সক্রেটিসের শিষ্য-মাত্রেই ছিল বন্ধু, বন্ধুমাত্রেই শিষ্য।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে এই অস্বাভাবিক ও আড়ষ্ট সম্পর্কের সুরু হল সেদিন যেদিন থেকে শিক্ষা হয়ে দাঁড়াল প্রতিষ্ঠানমূলক। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলগত শিক্ষণ-পদ্ধতি দেখা দিল। ক্লাশ তৈরী হল, বেঞ্চ এল, শিক্ষকের জন্য নির্দিষ্ট চেয়ার টেবিল দেখা দিল। শিক্ষার্থীর সংখ্যা যখন আরও বেড়ে উঠল তখন বেঞ্চের জায়গায় এল গ্যালারী, শিক্ষকের জন্য তৈরী হল প্ল্যাটফর্ম। এর ফলে ধীরে ধীরে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে দেখা দিল দূরত্ব ও অপরিচিতির একটা অবাস্তব ব্যবধান। এই অবাস্তব ব্যবধানটা দূর করে পুনরায় স্বাভাবিক এবং আন্তরিক যোগসূত্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সব দেশের শিক্ষাবিদেরাই উপলব্ধি করেছেন এবং আধুনিক শিক্ষা-সংস্কার আন্দোলনের একটা বড় কর্মসূচী হচ্ছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে একটা সহজ স্বাভাবিক মৈত্রীর বন্ধন স্থাপন করা।

পাশ্চাত্যের অনেক বিদ্যায়তনে শিক্ষক আজ তাঁর বহুদিনের উচ্চ আসন থেকে নেমে শিক্ষার্থীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। ক্লাসে, লাইব্রেরীতে, বিতর্ক-সভায়, খেলার মাঠে, ভ্রমণে, যৌথ কর্ম-প্রচেষ্টায়, সর্বত্রই আজ শিক্ষককে সহ-অংশগ্রহণকারী রূপে শিক্ষার্থীর পাশে দেখা যায়। শান্তিনিকেতনেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর নব শিক্ষা-পরিকল্পনায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মাঝে এই অবাস্তব দেয়ালটা ভেঙে দিয়েছিলেন। যেখানেই শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কটা এইভাবে সহজ ও সৌহার্দ্যময় হয়ে উঠতে পেরেছে সেখানেই শিক্ষা হয়ে উঠেছে মঙ্গলময় ও সার্থক। যেখানে তা হয় নি সেখানে শিক্ষা কষ্ট-কল্পিত, অসার্থক এবং ব্যবসায়পর্যায়ভুক্ত।

শিক্ষক-কেন্দ্রিক শিক্ষা

প্রাচীন শিক্ষা ছিল পুরোপুরি শিক্ষক-কেন্দ্রিক। শিক্ষা-পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীর স্থান ছিল অতি নগণ্য। সমস্ত বিদ্যালয় জুড়ে বিরাজ করতেন শিক্ষক। তাঁর উন্নত গুরুগাম্ভীর ব্যক্তিত্বে বিদ্যালয়ের আবহাওয়া ছিল নিষিক্ত। ক্লাশেও শিক্ষকই ছিলেন সব। শিক্ষা-প্রক্রিয়ায় যতটুকু সক্রিয়তা তখন ছিল তার সবটুকুই সম্পাদন করতেন শিক্ষক একা। তিনি তাঁর উপলব্ধি, জ্ঞান ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষণীয় বিষয়টি আয়ত্ত করতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করতেন আর শিক্ষার্থীরা নীরব নিস্পন্দ হয়ে সেই জ্ঞান-বিশ্লেষণ শুনত। শিক্ষার্থীর পক্ষে করার কিছু ছিল না এবং তাকে কিছু করার সুযোগও দেওয়া হত না।

কিন্তু আধুনিক যুগে শিক্ষা ব্যবস্থার এ রূপটি বদলে গেছে। বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার্থীকে নতুন করে আবিষ্কার করা হল। শিক্ষার্থীকে অবহেলা করে যে সার্থক শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়া যায় না এ সহজ সত্যটুকু সকলেই হৃদয়ঙ্গম করলেন। তার ফলে শিক্ষার আমূল সংস্কার সুরু হল। শিক্ষক-কেন্দ্রিক শিক্ষা ধারার স্থানে গড়ে তোলা হল শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা।

শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক শিক্ষা

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে স্থান দেওয়া হয়েছে সবার পুরোভাগে। শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়েই এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থার পাঠক্রম গড়ে তোলা হয়েছে। শিক্ষক আর শিক্ষার্থীর সমস্ত অভিজ্ঞতার একমাত্র পরিবেশক নন। সত্য বলতে কি, অভিজ্ঞতা-পরিবেশন করার কোন দায়িত্বই তাঁর আজ নেই। কেননা আধুনিক শিক্ষানীতি অনুযায়ী অভিজ্ঞতা পরোক্ষ পন্থায় কারও মাধ্যমে অর্জন করা যায় না। সে জ্ঞান হয় নিতান্তই নিষ্ক্রিয়, তার কোন কার্যকারিতা নেই। অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীকে সঞ্চয় করতে হবে নিজেকে প্রত্যক্ষভাবে। ফলে শিক্ষকের সেই সর্বব্যাপী প্রাধান্য আর নেই। তাঁর কাজও প্রচুর পরিমাণে কমে গেছে। সমস্ত সক্রিয়তা এখন শিক্ষার্থীর। একদা-বিস্মৃত শিক্ষার্থী এখন নাটকের প্রধান ভূমিকায়, শিক্ষক আর নন।

আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষকের কাজ

কিন্তু তা বলে একথা ভাবলে ভুল হবে যে শিক্ষকের দায়িত্ব কমে গেছে। কাজের গুরুভার কমে গেলেও গুরুত্ব একটুও কমেনি। বরং কাজের প্রকৃতির বিচারে শিক্ষকের দায়িত্ব ও গুরুত্ব আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। আগে শিক্ষক ছিলেন কেবলমাত্র জ্ঞানদাতা। তাঁর নিজের আহরিত তথ্যের সমষ্টি ও উপলব্ধি করা তত্ত্বের ভাণ্ডারটি শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দিয়েই তিনি কর্তব্যমুক্ত হতেন। তাঁর কর্মক্ষমতার বিচার হত কতটা সাফল্যের সঙ্গে তিনি এই কাজটি করতে পারলেন তার দ্বারা।

কিন্তু আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষকের কাজ অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্ব-আহরিত সুনির্দিষ্ট কতকগুলি জ্ঞানের বর্ণনা শিক্ষার্থীকে শুনিয়ে তাঁর কর্তব্যের আজ আর শেষ হয় না। সে জ্ঞান যাতে শিক্ষার্থী বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে সেটা দেখাই এখন শিক্ষকের প্রধান কাজ। উদাহরণস্বরূপ, আগে কাকে ভদ্রতা বা সামাজিকতা বলে, শিক্ষার্থীকে শেখাতে হলে ভদ্রতা বা সামাজিকতার উপর জ্ঞানবহুল একটি বক্তৃতা দিলেই শিক্ষকের কাজ শেষ হয়ে যেত কিন্তু এখন শিক্ষার্থী যাতে বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ভদ্রতা বা সামাজিকতার প্রকৃতি জানতে পারে সে ব্যবস্থা করাই শিক্ষকের কাজ। অতএব আধুনিক শিক্ষকের কাজ প্রাচীন শিক্ষকের তুলনায় পরিমাণে কম হলেও গুরুত্বের দিক দিয়ে অনেক বেশী।

আধুনিক শিক্ষকের কাজ কেবলমাত্র কতকগুলি তত্ত্বমূলক জ্ঞান-অর্জনে সাহায্য করাতেই সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর কাজ এখন আগের চেয়ে অনেক ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং শিক্ষার্থীর সত্তার এমন কোন দিক নেই যাকে আজ তা গভীরভাবে স্পর্শ করে না।

আধুনিক সমাজে বিশেষ করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষকের কাজ যে কত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁর দায়িত্ব যে কত সুদূরপ্রসারী তা নীচের তালিকাটি পড়লেই বোঝা যাবে।

(১) আধুনিক শিক্ষক জ্ঞান দান করেন না, শিক্ষার্থীকে জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করেন। শিক্ষার্থী যাতে বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞানগুলি শিখতে এবং আবশ্যকীয় কৌশলগুলি আয়ত্ত করতে পারে তার ব্যবস্থা, পরিকল্পনা এবং সম্পাদন এ সবই শিক্ষকের কর্মসূচীর অন্তর্গত।

(২) এর জন্য শিক্ষককে দক্ষ পরিকল্পক হতে হবে। এমনভাবে পাঠক্রমকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী তার মাধ্যমে সুষ্ঠু জীবনযাত্রার জন্য অর্জনীয় অভিজ্ঞতাগুলি আহরণ করতে পারে।

(৩) এত গেল জ্ঞানের দিক। গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার অন্যান্য দিকেরও যাতে সুষ্ঠু বিকাশ ঘটে সেটা দেখাও শিক্ষকের কাজ। শিক্ষার্থীর অনুভূতিমূলক ও সমাজগত দিকগুলি যাতে বাঞ্ছিত পথ ধরে এগোয় তার ব্যবস্থা শিক্ষককে করতে হবে। আধুনিক বিদ্যালয়গুলির কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের কাজের গণ্ডীও বৃহত্তর হয়ে গেছে। বিদ্যালয়ে সমাজধর্মী পরিবেশ তৈরী করে শিক্ষার্থীর সামাজিক সচেতনতাকে পুষ্ট করা, মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে সহযোগিতা, বন্ধুপ্রীতি, স্বার্থত্যাগ ইত্যাদি সদ্‌গুণ সৃষ্টি করা, নানারূপ সহপাঠক্রমিক কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর বিশেষ ক্ষমতাগুলিকে জাগিয়ে তোলা, সুপরিকল্পিত অভিজ্ঞতা-বৈচিত্র্যের সাহায্যে শিক্ষার্থীর মানসিক অনুভূতিমূলক সাম্য বজায় রাখা প্রভৃতি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি আধুনিক শিক্ষকের কর্মসূচীর অন্তর্গত হয়ে পড়েছে।

(৪) আধুনিক শিক্ষকের কাজ কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের চারটে পাঁচিলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পাঠাগার, যাদুঘর, খেলার মাঠ থেকে সুরু করে ক. শিক্ষার্থীর বাড়ী পর্যন্ত আজকের শিক্ষকের নিয়মিত গতিবিধি। তাছাড়া শিক্ষককে শিক্ষার্থীর পিতা-মাতা, ভাইবোনদের সঙ্গেও অতি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে হয়। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার অভীষ্ট বিকাশের জন্য তার সম্পূর্ণ জীবনযাত্রার সঙ্গেই শিক্ষককে পরিচিত হতে হয়।

(৫) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষকের দায়িত্ব আরও অধিক। আজকের শিক্ষার্থী যাতে আগামীকাল রাষ্ট্রের যোগ্য নাগরিক হয়ে উঠতে পারে, শাসনতন্ত্রের দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে পারে, এবং আর দশজনের সঙ্গে সহানুভূতি ও সহযোগিতার সঙ্গে কাজ করতে পারে, তার জন্য শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করার দায়িত্বও আধুনিক শিক্ষকের উপর।

(৬) শিক্ষার্থীর জীবন-দর্শন গঠনে আজ শিক্ষকই হলেন প্রধান সহায়ক। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রাচীনকালের ব্যবধান আজ লোপ পেয়ে যাওয়ায় শিক্ষক সরাসরি শিক্ষার্থীর মনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। সেই-জন্য যাতে শিক্ষার্থী সবল সুস্বাস্থ্যময় একটা জীবনদর্শন গড়ে তুলতে পারে সে দিক দিয়ে আধুনিক শিক্ষকের করণীয় অনেকখানি। ব্যক্তিগত প্রভাব ও

আলোচনার মধ্যে দিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীর গঠনোন্মুখ ভাবধারার একটা সুসংহত রূপ দিতে পারেন।

(৭) সবশেষে আসে সুপরিচালনা এবং সুমন্ত্রণা। আধুনিক শিক্ষক শিক্ষার্থী-সমাজের একজন হওয়ার ফলে সাক্ষাৎভাবে শিক্ষার্থীর আচরণকে প্রভাবান্বিত করতে পারেন। তাঁর উন্নত অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতার সাহায্যে তিনি শিক্ষার্থীর সমগ্র জীবন প্রচেষ্টাকেই নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন এবং যাতে সুষ্ঠু পরিণতিতে সে প্রচেষ্টার সমাপ্তি হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও তিনি গ্রহণ করতে পারেন।

উপসংহারে একটু বলা যায় যে আধুনিক শিক্ষক আর কেবলমাত্র শিক্ষক নন, তিনি শিক্ষার্থীর সহকর্মী, মন্ত্রণাদাতা, হিতৈষী বন্ধু, জীবনদর্শন-গঠনে প্রধান সহায়ক এবং জীবনপ্রচেষ্টায় অভীজ্ঞ পথ প্রদর্শক।

এত হল শিক্ষার্থীর দিক দিয়ে আধুনিক শিক্ষকের কর্তব্য ও দায়িত্বের বিবরণ। বিদ্যালয়ের দিক দিয়েও আধুনিক শিক্ষকের কাজ কম নয়। বিদ্যালয়ের পাঠক্রম নির্ধারণ, শ্রেণী অনুযায়ী তার বন্টন, দৈনন্দিন অনুসরণীয় কর্মসূচী প্রণয়ন, অভিজ্ঞতা-বৈচিত্র্যের নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষার্থীদের অনুশীলনের অগ্রগতির পর্যবেক্ষণ এবং যথাসময়ে তার পরীক্ষাগ্রহণ, অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষণ ইত্যাদি বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজের উল্লেখ করা যায় যা আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষকের কর্তব্যের অন্তর্গত।

সুশিক্ষকের লক্ষণ (Marks of a good teacher)

সার্থক শিক্ষার একটা বড় উপকরণ হলেন সুশিক্ষক। শিক্ষাকে ফলপ্রদ করতে হলে যেমন শিক্ষার্থীর উপযোগী পাঠক্রমের প্রয়োজন, উন্নত আধুনিক পদ্ধতির প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন যোগ্য শিক্ষকের। শিক্ষক যদি উপযুক্ত না হন তাহলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ত ব্যর্থ হয়ই এমন কি তিনি শিক্ষার্থীর পরম ক্ষতির কারণও হয়ে উঠতে পারেন। সুশিক্ষক যেমন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তাকে তার পূর্ণতম বকাশের পথে নিয়ে গিয়ে তাকে এক আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দান করতে পারেন, আবার তেমনই কুশিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্ভাবনাগুলির অকাল মৃত্যু ঘটিয়ে তার ভবিষৎকে অন্ধকারময় করে তুলতে পারেন। সুশিক্ষা ও সুশিক্ষক মূলত অভিন্ন বললেই চলে।

সকল শিক্ষকই কিন্তু সুশিক্ষক নন। সুশিক্ষক হতে গেলে কতকগুলি বিশেষ

গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার। কোন্ কোন্ গুণ থাকলে সুশিক্ষক হওয়া যায়, শিক্ষকের কো কোন্ গুণ শিক্ষার্থীরা পছন্দ করে বা শিক্ষকের কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শিক্ষার সাফল্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে নানা মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন গবেষণা চালান। বার্‌র্ (Barr) নামে একজন মনোবিজ্ঞানী এই ধরনের কতকগুলি পরীক্ষণের ফল একত্র করে শিক্ষকের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শিক্ষাসাফল্যের সম্বন্ধের একটা তালিকা প্রণয়ন করেন।

আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা সুশিক্ষকের বৈশিষ্ট্যকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা

(১) ব্যক্তিগত গুণাবলী, (২) জ্ঞান ও দক্ষতা, (৩) আচরণমূলক বৈশিষ্ট্যাদি।

ব্যক্তিগত গুণাবলী

(১) সুশিক্ষকের প্রথম লক্ষণ হল যে তিনি সুবিবেচক হবেন। বার্‌রের মতে শিক্ষার সাফল্যের সঙ্গে এই গুণটির খুব নিবিড় যোগসূত্র আছে। অবশ্য সুবিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আরও অনেকগুলি গুণ—যেমন, শিক্ষার্থীর কাজের যথেষ্ট মূল্যদান, কোমলতা, সৌহার্দ্য, ভদ্রতা, সহানুভূতি, সাহায্য করার মনোভাব. ধৈর্য, সহনশীলতা ইত্যাদি। এই গুণগুলি শিক্ষার্থীকে শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য একপ্রকার অপরিহার্য বললেই চলে।

(২) সুবিবেচনার পর বার্‌রের তালিকা অনুযায়ী আসে বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতা। সাধারণ লোকের বুদ্ধির মানের চেয়ে সুশিক্ষকের বেশী বুদ্ধি থাকা প্রয়োজন একথা অবিসংবাদিত। কেননা, শিক্ষণ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত করা, জটিল ঘটনা-বিন্যাসের সমাধান উদ্ভাবন করা, শিক্ষার্থীর জনতাকে সংঘবদ্ধভাবে পরিচালিত করা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাঁকে করতে হয়। অতএব তাঁর বিচক্ষণতা, দূরদৃষ্টি, বিচারশক্তি, মানসিক ক্ষমতা, সাধারণ জ্ঞান ইত্যাদি সাধারণের চেয়ে যে উৎকৃষ্ট স্তরের হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

(৩) সুশিক্ষকের আর একটি লক্ষণ হল প্লবতা (Buoyancy)। প্লবতা বলতে বোঝায় পরিস্থিতির চাপে অবদমিত না হওয়া, প্রতিকূল ঘটনাচক্রের কাছে হার না মানা ও যে কোন অবস্থায় মনের প্রফুল্লতা বজায় রাখা। বার্‌রের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী এই গুণটির সঙ্গে শিক্ষকের সাফল্যের বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। প্লবতার মধ্যে আমরা ফেলতে পারি আশাবাদিতা, উদ্যম, প্রফুল্লতা, বাচন-শক্তি,

প্রকাশ-ক্ষমতা, রসজ্ঞান প্রভৃতি গুণগুলি। রসবোধের শক্তিটি বিশেষ করে সফল শিক্ষকের একটা অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

৪। এর পরে সুশিক্ষকের যে বৈশিষ্ট্যটির উল্লেখ করতে হয় সেটি হল প্রক্ষোভঘটিত সাম্য। অসংযত, খামখেয়ালী ও অস্থিরচিত্ত শিক্ষকের পক্ষে সাফল্যলাভ করা খুবই শক্ত। সুশিক্ষকের আত্মসংযম থাকবে, তাঁর কথাবার্তায় দৃঢ়তা প্রকাশ পাবে এবং আচরণে স্থিরতা থাকবে। তবেই শিক্ষার্থীরা তাঁকে অনুসরণ করবে এবং তাঁর উপর নির্ভর করার উৎসাহ পাবে।

৫। সুশিক্ষক যথেষ্ট দায়িত্বশীল হবেন। তাঁর জানা উচিত যে তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব শিক্ষার্থীর গঠনোন্মুখ মনের উপর গভীর ছাপ রেখে যেতে পারে এবং বহু দিক দিয়ে তার মনের গঠন-প্রকৃতি নির্ধারণ করতে পারে। সেইজন্য তাঁর আচরণ, মন্তব্য, চিন্তাধারা প্রভৃতি সুসংযত হওয়া উচিত, নইলে শিক্ষার্থীর গঠনপ্রয়াসী ব্যক্তিসত্তাকে বিপথগামী করে তুলতে পারে।

৬। সুশিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গী উদার ও যথেষ্ট ব্যাপক হবে। শিক্ষার্থীর মনের প্রসারতা বৃদ্ধি করাও তাঁর একটা বড় কাজ। শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গী যদি সংকীর্ণ এবং অনুদার হয় তবে শিক্ষার্থীর মনের প্রসারতা বৃদ্ধি পাবে না। এর জন্যে নিজের শিক্ষণীয় বিষয়টি ছাড়াও অন্যান্য সকল বিষয়ে শিক্ষকের ব্যাপক জ্ঞান থাকা দরকার।

৭। সুশিক্ষক চিন্তায় ও আচরণে প্রগতিশীল হবেন। যে শিক্ষক প্রাচীন ও সনাতন ভাবধারার গণ্ডী পার হতে চান না, তিনি সার্থক শিক্ষা কখনই দিতে পারেন না। জ্ঞান সদাবর্ধনশীল, সতত পরিবর্তনধর্মী। যিনি সেই জ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে পা মিলিয়ে চলবেন তিনিই শিক্ষণের দায়িত্ব নিতে পারেন।

৮। সুশিক্ষক তাঁর বিচার এবং সিদ্ধান্তে সকল প্রকার ব্যক্তিগত প্রভাবের উপর থাকবেন। বারের তালিকাতে এই লক্ষণটির নাম দেওয়া হয়েছে নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity)। এর অন্তর্গত হল পক্ষপাতিত্ব-হীনতা, উদারতা, ন্যায়-বিচার ইত্যাদি। দেখা গেছে যে অনেক ভাল শিক্ষকও তাঁদের এই গুণটির অভাবের জন্য শিক্ষণ-সাফল্য থেকে বঞ্চিত হন।

৯। নির্ভরযোগ্যতা সুশিক্ষকের আর একটি অতি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য। তাঁর আচরণ কথাবার্তা যেন শিক্ষার্থীর মনে তাঁর প্রতি যথেষ্ট বিশ্বাসের সৃষ্টি করতে পারে। যে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিশ্বাসভাজন নন, তাঁর পক্ষে কার্যকরী শিক্ষা দেওয়া সম্ভবই নয়।

১০। এবার আসে সুশিক্ষকের ব্যক্তিত্বের কথা। বার্‌রের তালিকাতেও শিক্ষকের ব্যক্তিত্বকে উল্লেখযোগ্য স্থান দেওয়া হয়েছে। তবে শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি সম্বন্ধে আধুনিক ধারণা যথেষ্ট বদলে গেছে। পূর্বে মনে করা হত সুশিক্ষক হতে গেলে গুরুগম্ভীর, কর্তৃত্বধর্মী ও কঠোর ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হয়। কিন্তু প্রগতিশীল শিক্ষা পরিকল্পনায় এ ধরনের শিক্ষকের কোন স্থান নেই। শিক্ষক এখন শিক্ষার্থীর সহকর্মী, হিতৈষী বন্ধু-বিশেষ। তাঁকে শিক্ষার্থীর সঙ্গে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা করতে হবে এবং তাদের সমাজের একজন হতে হবে। অতএব তাঁর ব্যক্তিত্ব হবে প্রীতিময়, সৌহার্দ্যভিত্তিক ও আকর্ষণীয়। বাররের পর্যবেক্ষণে আকর্ষণীয়তাকে সুশিক্ষকের একটা লক্ষণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্যক্তিগত আকর্ষণ (personal magnetism), ব্যক্তিত্বের মাধুর্য ইত্যাদি এই পর্যায়ের অন্তর্গত।

দৈহিক সুশ্রীতা সুশিক্ষকের একটা অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য নয়। অনেক ছাত্র-প্রিয় শিক্ষককেই এই বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিতই দেখা গেছে। সুশিক্ষককে যে প্রিয়দর্শন হতেই হবে তার কোন অর্থ নেই। তবে দৈহিক খুঁত বা বিকলাঙ্গতা শিক্ষা–সাফল্যের অন্তরায়।

স্বাস্থ্যের উপর কিন্তু শিক্ষণের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। বার্‌রের পর্যবেক্ষণেও এ সত্য সমর্থিত হতে দেখা গেছে। স্বাস্থ্যহীন বা সদা-অসুস্থ শিক্ষক কখনই শিক্ষার্থীদের প্রতি সুবিচার করতে পারেন না।

বার্‌রের তালিকা থেকে আরও দেখা গেছে যে শিক্ষকের বয়স, উচ্চতা, ওজন এমন কি সামাজিক পদমর্যাদার সঙ্গেও সুশিক্ষণের কোন সম্পর্ক নেই।

জ্ঞান ও দক্ষতা

শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষকের পর্যাপ্ত জ্ঞান সুশিক্ষকের আর একটি অপরিহার্য গুণ। সার্থক শিক্ষা নির্ভর করে উপযুক্ত পরিচালনার উপর এবং তার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানবত্তা। অগভীর বিদ্যা নিয়ে শিক্ষক কখনই শিক্ষার্থীর ঈপ্সীত বিকাশ ঘটাতে পারেন না।

কেবলমাত্র শিক্ষণীয় বিষয়টিতে শিক্ষকের জ্ঞান থাকলে চলবে না। জ্ঞানের সকল শাখার সঙ্গেই শিক্ষকের অল্পবিস্তর পরিচিতি থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। শিক্ষার্থীদের বহুমুখী কৌতূহল ও জ্ঞানস্পৃহাকে যিনি তৃপ্ত করতে পারেন তিনিই সুশিক্ষক।

সুশিক্ষক শিক্ষণের আধুনিক পদ্ধতিগুলির সঙ্গেও বিশেষভাবে পরিচিত থাকবেন। আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের নানা পরীক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষণ পদ্ধতি সম্বন্ধে নিত্য নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে। সুশিক্ষক সেই সকল তথ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত থাকবেন এবং সেগুলি যথাসম্ভব বাস্তবে প্রয়োগ করবেন।

মনোবিজ্ঞানে, বিশেষ করে শিশু মনোবিজ্ঞানে, সুশিক্ষকের গভীর জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। শিক্ষকের সমস্ত কাজই কতগুলি বিকাশোন্মুখ মানুষের মনকে নিয়ে—তাদের চিন্তা, অনুভূতি, আশা, চাহিদা ইত্যাদিকে ঘিরে। অতএব মনোবিজ্ঞানে শিক্ষকের গভীর জ্ঞান থাকা অপরিহার্যভাবে আবশ্যক। শিশু মনো-বিজ্ঞান ছাড়াও দল-মনোবিজ্ঞানে(Group Psychology)জ্ঞান থাকাও শিক্ষকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন শিক্ষার্থীদের নিয়ে সুসংহত ও সুসংবদ্ধ সমাজ গড়ে তোলাই শিক্ষকের প্রধান কাজ, এবং ব্যক্তিগত ও দলগত উভয় প্রকার মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এর অত্যাবশ্যক উপকরণ। এ ছাড়াও বার্‌রের তালিকা অনুযায়ী শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ককে অনুকূল করে গড়ে তোলার দক্ষতাও সুশিক্ষকের একটি বড় লক্ষণ।

আচরণমূলক বৈশিষ্ট্য

এই পর্যায়ে প্রথমে পড়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার। প্রাচীন শিক্ষকের দমনাত্মক ব্যবহারের স্থানে সহানুভূতি ও সুবিবেচনার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সমস্যাগুলিকে গ্রহণ করাই হচ্ছে সুশিক্ষকের যথার্থ লক্ষণ। পক্ষপাতহীনতাও শিক্ষণের সাফল্যের একটা উল্লেখযোগ্য উপাদান।

সাহায্যদান ও সহযোগিতাও সুশিক্ষকের আর একটি বড় লক্ষণ। শিক্ষার্থীরা যেন শিক্ষককে কেবলমাত্র শিক্ষাদান এবং পরীক্ষাগ্রহণের একটা যন্ত্র বলে না মনে করে, তাঁকে তারা তাদের সহায়ক শুভাকাঙ্ক্ষী বলেই যেন গ্রহণ করে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ভদ্র ব্যবহার ও শিক্ষার্থীদের প্রতি সংবেদনশীল মনোভাব প্রভৃতি সুশিক্ষকের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

শিক্ষণপ্রিয়তাকে একটা সুশিক্ষকের বড় লক্ষণ বলে বর্ণনা করা যায়। সাধারণত দেখা যায় যাঁরা অন্য কোন বৃত্তিতে সুবিধা করতে না পেরে নিরুপায় হয়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করেছেন তাঁরা বহু গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সুশিক্ষক হতে পারেন

না। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে শিক্ষকতা তাঁদের কাছে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নয়। অতএব শিক্ষকতায় তাঁদের আগ্রহ নেই। শিক্ষণপ্রীতি' আর শিক্ষার্থী-প্রীতি প্রায় একই কথা। ফলে শিক্ষণে আগ্রহ না থাকলে শিক্ষার্থীরাও শিক্ষকের কাছে প্রিয় হয়ে দাঁড়ায় না এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক সুশিক্ষণের প্রতিকূল হয়ে ওঠে।

প্রধান শিক্ষকের কার্যাবলী

শিক্ষকদের মধ্যে প্রধান শিক্ষকের স্থান বেশ কিছুটা স্বতন্ত্র। তিনি মূলত শিক্ষক হলেও অন্যান্য শিক্ষকের তুলনায় তাঁর কর্তব্য যেমন অধিক, দায়িত্বও তেমনই প্রচুর। সাধারণ শিক্ষকের সম্পর্ক প্রধানত ছাত্রদের সঙ্গে। শিক্ষার্থীদের সমাজের সুষ্ঠু সংগঠন করা, তাদের অভিজ্ঞতাগুলি সুনিয়ন্ত্রিত করা ইত্যাদি কর্তব্যের মধ্যেই তাঁর কাজ সীমাবদ্ধ। কিন্তু প্রধান শিক্ষকের কাজ শিক্ষার্থী-সমাজ ও শিক্ষক-সমাজ এই দুই নিয়েই। তাঁকে একাধারে ত্রিবিধ অংশে অবতীর্ণ হতে হয়, যথা—শিক্ষক, পরিচালক ও সমন্বয়-সাধকের রূপে।

শিক্ষকরূপে

সাধারণ শিক্ষকের মত প্রধান শিক্ষকও শিক্ষার্থী সমাজের একজন হবেন। নিজের পদমর্যাদা, কঠোর ব্যক্তিত্ব নিয়ে যে প্রধান শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলেন তিনি শিক্ষার্থীদের সত্যকারের চাহিদা মেটাতে পারেন না। আধুনিক প্রগতিশীল প্রধান শিক্ষককে এইজন্য আমরা পড়ার ক্লাসে, পাঠাগারে, খেলার মাঠে, সর্বত্রই শিক্ষার্থী-সমাজের অন্তর্ভুক্ত একজন হিতৈষী সহায়করূপেই দেখতে পাই।

সাধারণ শিক্ষক হয়ত কোন একটি বা কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর সংস্পর্শে আসেন, কিন্তু প্রধান শিক্ষককে সকল শ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে হয়। তিনি বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীরই শিক্ষক। অনেক প্রধান শিক্ষককে বিদ্যালয়ের অন্যান্য কাজ নিয়ে এতই ব্যস্ত দেখা যায় যে তাঁর পক্ষে শিক্ষণের কাজ করার সময় হয়ে ওঠে না। কিন্তু এ প্রথা নিতান্তই ক্ষতিকর। মনে রাখতে হবে যে প্রধান শিক্ষক প্রথমে শিক্ষক, তার পরে অন্য কিছু। তিনি সমস্ত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে

ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হবেন, তাঁদের মধ্যে সংহতি বজায় রাখবেন এবং শিক্ষার্থী-দের জনতাকে সুসংবদ্ধ সমাজরূপে গড়ে তুলতে সাহায্য করবেন। যে সকল বিদ্যালয়ে ছাত্রাবাস আছে সে সকল স্থানে প্রধান শিক্ষকের প্রত্যেকটি ছাত্রের সুখ-দুঃখ সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া উচিত।

শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষকদের সক্রিয় সাহায্য করবেন। নূতন আগন্তুক শিক্ষককে সহানুভূতি ও নিজের অভিজ্ঞতার সাহায্যে যথাযথ পরিচালনা করার দায়িত্বও প্রধান শিক্ষকের।

পরিচালকরূপে

বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরিচালনা-তরীর হাল ধরে থাকেন প্রধান শিক্ষক। এ দিক দিয়ে তাঁকে যথেষ্ট ব্যবহারিক বুদ্ধি, সাধারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে হয়। বিদ্যালয়ের জটিল সমস্যার সমাধান, আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার ব্যবস্থা, শিক্ষক-নিয়োগ, ছাত্র-নির্বাচন, পরীক্ষা গ্রহণ প্রভৃতি নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব থাকে প্রধান শিক্ষকের উপর।

সমন্বয়-সাধকরূপে

প্রধান শিক্ষকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল সমন্বয়-সাধন। এই সমন্বয় সাধন আবার নানা বিভিন্ন দলের মধ্যে হতে পারে, যেমন—শিক্ষার্থী-ও-শিক্ষার্থী, শিক্ষক-ও-শিক্ষার্থী, শিক্ষক-ও শিক্ষক, শিক্ষক-ও-পরিচালক এবং শিক্ষক-ও-অভিভাবক।

প্রথম, শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সুসংহত সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার্থী সমাজ গড়ে তোলা প্রধান শিক্ষকের কাজ।

দ্বিতীয়, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে অনুকূল প্রীতিময় সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং শিক্ষণ যাতে অভীষ্ট পথ ধরে এগোয় তা দেখাও প্রধান শিক্ষকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

তৃতীয়, বিভিন্ন শিক্ষকদের মধ্যে যাতে সৌহার্দ্যপূর্ণ সহযোগিতার বন্ধন বজায় থাকে এবং বিদ্যালয়ের আবহাওয়া কোনরূপ দ্বন্দ্ব বা অবাঞ্ছিত ঘটনার দ্বারা কলুষিত না হয় সেটা দেখাও প্রধান শিক্ষকের কর্তব্য।

চতুর্থত, শিক্ষক এবং বিদ্যালয়ের পরিচালকদের মধ্যে যাতে কোনরূপ সংঘাত না বাঁধে এবং শিক্ষকদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা মিটানোর উপযুক্ত ব্যবস্থা হয় তার ব্যবস্থা করাও প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব।

সর্বশেষে আসে শিক্ষক-অভিভাবক সহযোগিতার কথা। শিক্ষাকে সার্থক ও কার্যকরী করতে হলে, শিশুর শিক্ষক ও পিতামাতার মধ্যে একটা নিকট সহ-যোগিতার সম্বন্ধ গড়ে তুলতে হবে। নানা কারণে এ দুয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠার সুযোগ পায় না। প্রধান শিক্ষকের কর্তব্য হল শিক্ষক অভিভাবকের মধ্যে এই বাঞ্ছিত যোগাযোগ স্থাপন করা। অভিভাবকদের বিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ করে এনে, শিক্ষকদের অভিভাবকদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ দিয়ে, শিক্ষক-অভিভাবক আলোচনা-সভার আয়োজন করে প্রধান-শিক্ষক এই যোগাযোগটি সক্রিয়ভাবে স্থাপন করতে পারেন।

অতএব দেখা যাচ্ছে শিক্ষকতা ও পরিচালনা ছাড়া প্রধান শিক্ষকের একটা বড় কাজ হল সমন্বয়-সাধন। বিদ্যালয়টি একাধিক শক্তির কর্মক্ষেত্র। শিক্ষক, পরিচালক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী এই চারটি প্রধান শক্তি বিদ্যালয়ের মাধ্যমে পরস্পরের উপর প্রতিক্রিয়া করে চলে। প্রধান শিক্ষক হলেন এই শক্তিগুলির কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর বিচক্ষণতা, ব্যবহারিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে তিনি বিভিন্ন শক্তিগুলির মধ্যে সমন্বয় আনেন এবং তাদের মিলিত প্রচেষ্টা যাতে অভীষ্টতম পরিণতির পথে এগোয় তার ব্যবস্থা করেন।

প্রশ্নাবলী

1. Write an essay on—Relation between the teacher and the taught. (B. T. 1950)

Ans. (পৃঃ ১৪৪—পৃঃ ১৪৮)

2. 'Teacher' is essentialy another name for 'influence'. Show that the function of the teacher is to influence the child to personalise the impersonal experiences which constitute the course of study. (B. T. 1958)

Ans. (পৃঃ ১৪৯—পৃঃ ১৫১)

3. What personal characteristics in a pupil do lead towards success in school? Think of the teacher who was most successful in helping you to learn. What personal

characteristics of the teacher contributed most to the success ? (B. T. 1953)

Ans. (দ্বিতীয়াংশ ঃ—পৃঃ ১৫১—পৃঃ ১৫৬)

4. What are the functions of a teacher ? Why is he considered the most important in the educational system ? (B. A. 1955)

Ans. (পৃঃ ১৪৯—পৃঃ ১৫১)

5. Describe the marks of a good teacher. (B. A. 1957)

Ans. (পৃঃ ১৫১—পৃঃ ১৫৬)

6. What the mainspring is to the watch, the fly wheel to the machine, or the engine to the steamship, the headmaster is to the school. Discuss. (B. A. 1959)

Ans. (পৃঃ ১৫৬—পৃঃ ১৫৮)

7. "The teacher should not merely be the fountain of facts or the walking Encyclopaedia but the guide, philosopher and friend to the young." Discuss. (B. A. 1960)

Ans. (পৃঃ ১৪৯—পৃঃ ১৫৬)

8. What according to you, are the essential qualifications of a teacher ? In this connection discuss the statement—"The function of a teacher is somewhat like that of a gardener". (B. A. 1961)

Ans. (পৃঃ ১৪৯—পৃঃ ১৫৬)

9. "It is the exemplar of an educated person that the teacher is, it is the stimulation and inspiration which he generates, it is the personality that he radiates.........which make him the great formative force." Elucidate. (B. T. 1961)

Ans. (উঃ ১৪৯—উঃ ১৫৬)

পনর

পরীক্ষা-গ্রহণ

শিক্ষাদানের সঙ্গে পরীক্ষাগ্রহণ অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। শিক্ষার্থীকে কোন কিছু শেখানোর সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষকের বা বিদ্যালয়ের কাজ শেষ হয়ে যায় না। দেখতে হয় যে কতদূর সেই বিষয়টি শিক্ষার্থী গ্রহণ করতে পেরেছে। শিক্ষার্থীর এই শিক্ষা গ্রহণের পরিমাপ করাকেই পরীক্ষাগ্রহণ নাম দেওয়া হয়েছে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষণের সার্থকতার পরিমাপ হয় পরীক্ষাগ্রহণের মাধ্যমেই এবং একথাও অনেকটা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, যেদিন থেকে ইচ্ছাকৃত শিক্ষাদানের পদ্ধতির প্রথম প্রচলন হল সেদিনই পরীক্ষা-গ্রহণ পদ্ধতিটিও পাশাপাশি জন্ম নিল।

সাধারণত সব দেশের স্কুল কলেজেই লিখিত পরীক্ষা পদ্ধতির প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। নিম্নশ্রেণীতে এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষা পদ্ধতিও প্রচলিত আছে।

পরীক্ষা-গ্রহণের উদ্দেশ্য (Purposes of examination)

এই প্রচলিত লিখিত পরীক্ষা-পদ্ধতির মাধ্যমে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি সাধারণত সাধিত হয়ে থাকে।

১। এগুলি জ্ঞানার্জনের পরিমাপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ দেখা হয় যে একটি বিশেষ বিষয়ের কোন বিশেষ জ্ঞানটুকু শিক্ষার্থী আহরণ করতে পারল কিনা।

২। এগুলি পুরো একটি শ্রেণী বা সমগ্র স্কুলটির উপর প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। শ্রেণী বা স্কুলের শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনের মান পরিমাপ করা যেমন এক দিক দিয়ে পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য তেমনই আবার শিক্ষকদের কর্মদক্ষতার পরিমাপ করাটাও পরীক্ষা-গ্রহণের উদ্দেশ্যের অন্তর্গত। প্রাচীনকালে স্কুলগুলিকে সরকারী অর্থসাহায্য দেওয়া হত এই পরীক্ষার ফলাফলের বিচার করে। আজকাল যদিও এই পরীক্ষার ফলাফলের বিচারে অর্থ দেওয়ার প্রথা প্রচলিত নেই, তবু এখনও জনসাধারণ স্কুলের মূল্য নির্ধারণ করে থাকে স্কুলের পরীক্ষার ফলাফলের বিচার

করে। আমাদের দেশে স্কুলবোর্ডগুলি থেকে কোন বিশেষ স্কুলের পক্ষে অনুমোদন লাভ করা বা সে অনুমোদন বজায় রাখা নির্ভর করে সেই স্কুলের পরীক্ষার ফলাফলের উপর।

৩। অনেক পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ সাফল্য-গণনা (prognosis) করা সম্ভব হয় বলে মনে করা হয়, অর্থাৎ মনে করা হয় যে বর্তমানে পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে কি ধরনের সাফল্য লাভ করবে তা তার পরীক্ষার ফল থেকে বলা যেতে পারে। পরীক্ষার এই গুণটি আছে বলে ধরে নেওয়া হয় বলেই পরবর্তী উচ্চতর শিক্ষাস্তরে শিক্ষার্থীর প্রবেশ করার যোগ্যতা তার পরীক্ষার ফলাফল থেকেই বিচার করা হয়। যেমন স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করে যে শিক্ষার্থীর কলেজে পড়ার যোগ্যতা আছে কিনা, ডিগ্রী স্তরের পরীক্ষার ফল থেকে বিচার করা হয় যে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার যোগ্য কিনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল থেকে সিদ্ধান্ত করা হয় যে তাকে কোন বিশেষ বৃত্তি-গ্রহণ করতে দেওয়া হবে কিনা ইত্যাদি।

৪। নিছক জ্ঞানের মান-নির্ধারণ ছাড়াও পরীক্ষার মাধ্যমে আরও অন্যান্য অনেক গুণের পরিমাপ হয় বলে বিশ্বাস করা হয়। যেমন, যে ছেলে ভাল করে স্কুল-ফাইনাল পাশ করেছে, সে যে কেবল কতকগুলি স্কুল-পাঠ্য বিষয়েই ব্যুৎপত্তি লাভ করেছে তা নয়, পাঠ্য-বিষয়ের বাইরেও অনেক জ্ঞান সে লাভ করেছে—এটা ধরে নেওয়া হয়। তাছাড়া পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করতে হলে যথেষ্ট ধৈর্য, অধ্যবসায়, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি গুণের প্রয়োজন হয়। সেজন্য পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিমাপ ছাড়াও এই গুণগুলিরও পরিমাপ হয়ে যায়।

৫। পরীক্ষাপদ্ধতি পড়াশোনায় উদ্‌বোধক-রূপে কাজ করে থাকে। একথা খুবই সত্য যে বহু স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়ে নিছক পরীক্ষার চাপেই পড়াশোনা করে থাকে। বহু শিক্ষাবিদ্‌ই এই কারণে স্কুল-কলেজ থেকে পরীক্ষা-পদ্ধতি তুলে দেবার বিরোধিতা করে থাকেন।

পরীক্ষাকে পড়াশোনার উদ্‌বোধকরূপে ব্যবহার করার অর্থই হল পড়াশোনায় শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক আগ্রহ সৃষ্টি করতে না পারা। পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীকে পড়াশোনায় উদ্বুদ্ধ করতে হলে অপরিহার্যভাবে প্রতিযোগিতা, পুরস্কারের লোভ নিন্দা বা শাস্তির ভয় ইত্যাদি অস্বাভাবিক উপকরণগুলির সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু স্বাস্থ্যকর শিক্ষাপরিবেশ বা সার্থক-শিক্ষা কোনটিরই পক্ষে এই অস্বাভাবিক উদ্‌বোধকগুলি মঙ্গলকর নয়।

৬। পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দুর্বলতা বা ত্রুটির প্রকৃত স্বরূপটা নির্ণয় করা (diagnosis) যায় এবং তার যথার্থ কারণটা কি তাও শিক্ষক নিরূপন করতে পারেন। এর ফলে শিক্ষক সে দোষত্রুটিগুলির উপর বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন।

৭। ক্যাণ্ডেল (Kandel) প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্‌গণের মতে শিক্ষার্থীর সুপরিচালনাই (guidance) হচ্ছে পরীক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য। পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর যেমন ত্রুটি-নির্ণয় (diagnosis) করা যায়, তেমনই আবার তার সাফল্যের ভবিষ্যৎ-গণনাও (prognosis) করা যায়। অতএব এ দুয়ের সাহায্যে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ শিক্ষা, বৃত্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে সার্থক পরিচালনা করা যেতে পারে।

৮। সাধারণত স্কুল-কলেজে শিক্ষার্থীদের শ্রেণীবিন্যাসেও পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রচুর সাহায্য করে থাকে। পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করে কে কোন্ শ্রেণীর যোগ্য ঠিক করা হয় এবং এক শ্রেণী থেকে আর এক শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়।

প্রচলিত পরীক্ষার ত্রুটি

যদিও পরীক্ষার দ্বারা উপরের উদ্দেশ্যগুলি সাধিত হতে পারে, কিন্তু প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতির অসংখ্য ত্রুটির জন্য এর কোনটিই ভালভাবে সম্পাদিত হয় না। প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনা হয়ে থাকে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা নীচে করা হল।

প্রথমত যে সকল প্রচলিত পরীক্ষা সাধারণত স্কুলে কলেজে দেওয়া হয়ে থাকে সেগুলি রচনাধর্মী (essay-type)। অর্থাৎ প্রশ্নগুলির উত্তর পরীক্ষার্থীকে রচনা বা আলোচনার আকারে দিতে হবেই। যেমন প্রশ্ন করা হল, "গুপ্তযুগকে সুবর্ণযুগ বলা হয় কেন?" কিংবা "নদীর কি কি কাজ তার বর্ণনা কর" কিংবা "রাম ও রাবণের চরিত্রের তুলনা দাও।" এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর লিখতে হলে পরীক্ষার্থীর পক্ষে বিস্তৃত একটি রচনা লেখা ছাড়া উপায় থাকে না। প্রচলিত পরীক্ষায় অধিকাংশ ত্রুটির মূলেই হল তার এই রচনাধর্মিতা।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা যে কোন উৎকৃষ্ট পরিমাপ-যন্ত্র বা পরীক্ষার কয়েকটি অত্যাবশ্যক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, যথা ১। নির্ভরযোগ্যতা (Reliability)

২। যাথার্থ্য (Validity) ৩। প্রয়োগশীলতা (Administrability) ৪। সংব্যাখ্যান ও তুলনীয়তা (Interpretation and Comparability) এবং সময় ও অর্থের পরিমিততা (Economy)।

দেখা গেছে যে প্রচলিত রচনা-ধর্মী পরীক্ষাপদ্ধতিতে ওপরের বৈশিষ্ট্যগুলির কোনটিই নেই ঃ

১। নির্ভরযোগ্যতার অভাব

প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতিতে কোন নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) নেই। উদাহরণস্বরূপ, যদি একই পাঠ্যবিষয়ের উপর শিক্ষার্থী দুবার পরীক্ষা দেয় এবং একই পরীক্ষক যদি সেই দু-খানি খাতা দেখেন তবে দেখা যাবে যে সেই দুটি খাতায় দুরকম নম্বর উঠেছে। কিংবা যদি একই খাতা দুজন পরীক্ষককে পৃথকভাবে পরীক্ষা করতে দেওয়া হয় তবে দেখা যাবে যে দুজনের দেওয়া নম্বরের মধ্যে বেশ বৈষম্য রয়েছে। এই নির্ভরযোগ্যতার অভাবের কারণ অনেকগুলি, যেমন,

প্রথম, পরীক্ষার্থীর শারীরিক বা মানসিক অবস্থা সকল সময় সমান থাকে না এবং তার ফলে সময়ের বিভিন্নতা অনুযায়ী পরীক্ষার ফলও বিভিন্ন হয়ে যায়।

দ্বিতীয়, প্রচলিত পরীক্ষা রচনাধর্মী হওয়ায় একটি বিষয়ের উপর ৫।৬ টার বেশী প্রশ্ন দেওয়া সম্ভব হয় না। এর ফলে প্রশ্নপত্রে স্বভাবতই সম্পূর্ণ পাঠ্য বিষয়টির উপর সুবিচার করা যায় না। প্রদত্ত প্রশ্নগুলি যদি পরিক্ষার্থীর প্রস্তুতি-মত হয় তবে পরীক্ষার্থীর সাফল্য সুনিশ্চিত আর যদি তা না হয় তবে পরীক্ষার্থীর শত পরিশ্রম সত্ত্বেও ব্যর্থতা অপরিহার্য।

তৃতীয়, বিভিন্ন পরীক্ষক সাফল্য পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন এবং তার ফলে একই খাতা যদি একাধিক পরীক্ষককে দেখতে দেওয়া হয় তবে দেখা যাবে যে ঐ খাতার উপর যে বিভিন্ন নম্বর দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে প্রচুর বৈষম্য রয়েছে। নানা মনোবিজ্ঞানীদের পরীক্ষণ থেকে এই ঘটনাটি বহুবার প্রমাণিত হয়ে গেছে। এমন কি স্বাস্থ্য, ক্লান্তি, মানসিক অবস্থা প্রভৃতি কারণগুলিও পরীক্ষকের পরীক্ষাকার্যকে প্রভাবিত করতে পারে। ভার্ননের কথায় একই খাতা যদি পরীক্ষক মধ্যাহ্ন-ভোজনের আগে না দেখে পরে দেখেন তবে তার নম্বর বদলে যাবে।

চতুর্থ, এই নির্ভরযোগ্যতার অভাবের একটা বড় কারণ হল যে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত ধারণা, বিচার, রুচি, পছন্দ, অপছন্দ প্রভৃতি পরীক্ষা-কার্যের মধ্যে অনিবার্যরূপে হস্তক্ষেপ করে। একে এককথায় আমরা ব্যক্তিকতা (Subjectivity) বলতে পারি। প্রচলিত রচনাধর্মী পরীক্ষা-পদ্ধতিগুলিতে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস, ধারণা, সংস্কার, পছন্দ, অপছন্দ, রুচি প্রভৃতি প্রভাব বিস্তারের এত বেশী সুযোগ পায় যে পরীক্ষার্থীর প্রদত্ত উত্তরের মান-নির্ণয়ে প্রচুর বৈষম্য দেখা দেয়। ১৯১৩ সালে ষ্টার্চ্চ এবং ইলিয়ট একটি জ্যামিতির খাতা ১১৬টি উচ্চবিদ্যালয়ে পরীক্ষার জন্য পাঠান। তাতে যে সকল নম্বর ঐ খাতাটিতে দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে পার্থক্য ১৮% থেকে ৯২%র মধ্যে ছিল। উচ্চতম নম্বর উঠেছিল ৯০% এরও উপর এবং ন্যূনতম নম্বর ছিল ৩০% এরও কম। হার্টগ, রোড্‌স্‌, ব্যালার্ড, উড প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীদের বিভিন্ন গবেষণায় এই ধরনের বৈষম্যের প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

২। যাথার্থ্যের অভাব

প্রচলিত রচনা-ধর্মী পরীক্ষাগুলির যেমন নির্ভরশীলতা নেই, তেমনই তাদের যাথার্থ্য (Validity) অত্যন্ত কম। অর্থাৎ যে জ্ঞান পরিমাপের জন্য পরীক্ষাটি সৃষ্ট, অনেক সময় সে জ্ঞানটিকে বাদ দিয়ে অন্য কোন বৈশিষ্ট্য, সামর্থ্য বা গুণের পরিমাপই পরীক্ষাটির মাধ্যমে করা হয়। যেমন ইতিহাসের পরীক্ষায় কেবলমাত্র ইতিহাসের জ্ঞানেরই পরীক্ষা করা হয় যে তাই নয়, শিক্ষার্থীর ভাষাজ্ঞান, রচনাশৈলী, হস্তাক্ষর এমন কি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতারও পরিমাপ ঐ পরীক্ষার মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। অনেক সময় ইতিহাসের জ্ঞানের চেয়ে এই সকল সম্পর্কহীন সামর্থ্য বা গুণগুলি পরীক্ষকের কাছে শিক্ষার্থীর সাফল্যের পরিমাপক হিসাবে বড় হয়ে ওঠে। এ ছাড়া বহু ক্ষেত্রে প্রচলিত পরীক্ষার মাধ্যমে সুতাকার জ্ঞানের পরীক্ষা না হয়ে বহু অবান্তর বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ হয়ে থাকে, যেমন পরীক্ষার বিশেষ সহায়করূপে যে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে সাহায্য করেন তাঁর কর্মক্ষমতার বিচার, পরীক্ষকের কথাবার্তা বা হাবভাব থেকে সম্ভাব্য প্রশ্ন অনুমান করায় শিক্ষার্থীর চাতুর্য, মানসিক স্থৈর্য ইত্যাদি।

৩। প্রয়োগশীলতার অভাব

প্রয়োগশীলতা (Administrability) বলতে বোঝায় দুটি বৈশিষ্ট্য, প্রথম পরীক্ষণ মাধ্যমটির প্রয়োগ করার সুবিধা এবং দ্বিতীয়, তার স্কোরিং বা মার্কিং করার সুবিধা। প্রচলিত রচনা-ধর্মী পরীক্ষণ-মাধ্যমগুলিতে এর কোনটিই নেই। সাধারণত এই সব পরীক্ষায় প্রশ্নগুলি প্রায়ই অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট প্রকৃতির হয়ে থাকে। পরীক্ষক ঠিক কি চান এবং কতটুকু চান সেটা প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে সুনির্দিষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরীক্ষার্থীরা অস্পষ্ট ধারণা ও অনুমানের উপর নির্ভর করে উত্তর লেখে। দ্বিতীয়ত, রচনাধর্মী পরীক্ষায় উত্তরপত্রের স্কোরিং বা মার্কিং করা যে অত্যন্ত অনিশ্চিত, এবং বহু বাহ্যিক ব্যাপারের উপর নির্ভরশীল, তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। স্কোরিং তখনই নির্ভুল হবে যখন পরীক্ষণ কাজটির মধ্যে কোন রকম ব্যক্তিকতা থাকবে না অর্থাৎ প্রশ্নগুলি পুরোপুরি ব্যক্তিগত-প্রভাবশূন্য বা নৈর্ব্যক্তিক (Objective) হবে।

কিন্তু আমরা দেখেছি যে গতানুগতিক রচনাধর্মী পরীক্ষাগুলি অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যক্তিকতার দোষে দুষ্ট।

৪। সংব্যাখ্যান ও তুলনীয়তার অভাব

কোন একটি পরীক্ষাকে তখনই সত্যকারের কার্যকরী বলা হবে যখন সেটির ফলাফলকে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে এবং যখন তার ফলাফলের সঙ্গে অন্য পরীক্ষার ফলাফলের তুলনা করা যাবে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতিতে একেবারে নেই। কেননা, প্রচলিত পরীক্ষার ফল এত উৎকটভাবে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাবের দ্বারা প্রভাবান্বিত যে সেগুলির যথাযথ ব্যাখ্যা করা চলে না এবং অন্য কোন অনুরূপ পরীক্ষার ফলের সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

৫। পরিমিততার অভাব

পরিমিততা বলতে বোঝায় সময় ও অর্থের মিতব্যয়িতা। গতানুগতিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রগুলি প্রস্তুত করতে অর্থ ও সময় বিশেষ লাগে না বটে, কিন্তু সেগুলির উত্তর করতে শিক্ষার্থীদের প্রায় ক্ষেত্রে প্রচুর সময় লাগে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে একটি রচনাধর্মী প্রশ্নপত্রের উত্তর দিতে পরীক্ষার্থীদের

দীর্ঘ সময় দেওয়া সত্ত্বেও তারা সে সময়কে পর্যাপ্ত বলে মনে করে না এবং সময়ের অভাবে প্রশ্নগুলির সম্পূর্ণ উত্তর দিতে পারে না।

অন্যান্য ত্রুটি

এ ছাড়াও প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতির আরও অনেক ত্রুটি আছে। যেমন—

৬। প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতিতে শিক্ষা-ব্যবস্থাটি পুরোপুরি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রিত হয়ে ওঠে এবং পরীক্ষার চাহিদা অনুযায়ী পাঠক্রম পরিবর্তিত ও বিকৃত হয়ে যায়। পরীক্ষায় পাশ করাটাই শিক্ষার মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে এবং শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য নগণ্য হয়ে দাঁড়ায়। বিদ্যালয়ের পক্ষে শিক্ষার ব্যাপক লক্ষ্য অনুসরণ করা সম্ভব হয় না এবং জীবন-ভিত্তিক শিক্ষা দেওয়াও অসম্ভব হয়ে ওঠে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে কতকগুলি নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয়ে পরীক্ষার উপযোগী বিশেষ জ্ঞান অর্জনে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা। যে সকল বিষয় বা জ্ঞানের পরীক্ষার উপর সরাসরি কোন প্রভাব নেই, সেগুলির অন্যান্য উপকারিতা থাকা সত্ত্বেও সেগুলিকে অবহেলা করা হয়।

৭। পরীক্ষা-ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবাঞ্ছিত অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার মনোভাব এনে দেয়। এর ফলে বিদ্যালয়-পরিবেশে সহযোগিতা ও মৈত্রীর আবহাওয়া নষ্ট হয়ে যায় এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, আত্মশ্লাঘা প্রভৃতি দেখা দেয়। পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের কাছে পড়াশুনার উদ্‌বোধকরূপে কাজ করে সত্য, কিন্তু শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় পাশ করার জন্য যে পন্থা অবলম্বন করে তা মোটেই সার্থক শিক্ষার অনুকূল নয়। প্রথমত সে নিছক তথাকথিত প্রয়োজনীয় অংশগুলি মুখস্থ করে এবং দ্বিতীয়ত পরীক্ষা নিকটবর্তী না হলে পড়াশোনা করার জন্য আগ্রহবোধও করে না। আর যারা পরীক্ষার উপর গুরুত্ব দেয় তারা অতিরিক্ত পরিশ্রম করে, এবং অনেক সময় স্নায়বিক দুর্বলতার রোগী হয়ে ওঠে।

৮। পূর্বে পরীক্ষাপদ্ধতির সপক্ষে একটা বড় যুক্তি দেওয়া হত। সেটি হল যে পরীক্ষার প্রত্যক্ষ উপকারিতা থাক বা, না থাক, পরীক্ষার পরোক্ষ উপকারিতা একটা আছে। বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মানসিক শৃঙ্খলা (mental discipline) তৈরী করা হয়। কিন্তু আধুনিক নানা গবেষণার ফল থেকে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে এভাবে মানসিক ক্ষমতা বাড়ান যায় না, বা মানসিক শৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যায় না।

আধুনিক অভীক্ষা (New-Type Test)

প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতির এই সকল মারাত্মক ত্রুটি থাকায় পরীক্ষার আমূল সংস্কারের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক আন্দোলন দেখা দেয়। অনেকে বিদ্যায়তন থেকে পরীক্ষাকে একেবারে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু শিক্ষার্থীর উপরে পরীক্ষার অস্বাভাবিক চাপ কমানোর সপক্ষে সর্বজনীন সম্মতি থাকলেও আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ পরীক্ষাকে একেবারে নির্বাসিত করার পক্ষপাতী নন। তার পরিবর্তে প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতির দোষ-ত্রুটিগুলি দূর করে যাতে পরীক্ষাকে কার্যকরী করে তোলা যায় সেজন্য নানা পরীক্ষা চালান হয়েছে। তার ফলে দেখা দিয়েছে আধুনিক বিষয়াত্মক অভীক্ষা (New-type Objective Test)।

এই নবতম অভীক্ষাগুলি নানা প্রকৃতির হতে পারে। তার কতকগুলি উদাহরণ নীচে দেওয়া হল।

সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষা (Completion Test)

এই অভীক্ষায় কতকগুলি উক্তিমূলক বাক্য দেওয়া থাকে এবং সেগুলির মধ্যে মধ্যে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ শব্দ উহ্য থাকে। অভীক্ষার্থীকে সেই শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ করতে বলা হয়। অনুক্ত পদগুলি এমনভাবে নির্বাচিত করা হয় যাতে সেগুলি পূরণের দ্বারা অভীক্ষার্থীর অভীষ্ট জ্ঞানের পরিমাপ হয়। যেমন—

রবীন্দ্রনাথ——প্রথম স্কুল স্থাপন করেন। (উঃ—শান্তিনিকেতনে)

সেইরূপ

(ক) ক্যাণ্ডিডা নাটকের রচয়িতা হলেন——এবং তিনি ——সালে ——জন্মগ্রহণ করেন।

(খ) ভারতে ইংরাজরা——সালে প্রথম পদার্পণ করেন এবং বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে——কোম্পানী স্থাপন করেন।

(গ) চোখের আইরিস্ নামক অংশটি আলোর পরিমাণ বাড়া ও——র সঙ্গে——ও——।

যখন একটি মাত্র শূন্যস্থান বাক্যের শেষে থাকে তখন তাকে স্মরণ অভীক্ষা (Recall Test) বলা হয় যেমন, আমেরিকা আবিষ্কার করেন——। (উঃ—কলম্বাস্)। ত্রিভূজের তিন কোণের সমষ্টি——।

সত্য-মিথ্যা অভীক্ষা (True False Test)

এই অভীক্ষাতে কতকগুলি উক্তি বা মন্তব্য দেওয়া থাকে এবং অভীক্ষার্থীকে বলতে হয় যে ঐ উক্তিগুলি সত্য কিংবা মিথ্যা। যেমন—

ভারতের চেয়ে চীন আয়তনে বড়ঃ— সত্য মিথ্যা [উঃ—সত্য]

সেই রকম

(ক) জল ২১২° সেন্টিগ্রেডে ফোটে, ৩২° সেন্টিগ্রেডে জমে যায়	সত্য	মিথ্যা
(খ) পৃথিবীর সব চেয়ে বড় দ্বীপ হল অষ্ট্রেলিয়া	সত্য	মিথ্যা
(গ) মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের সময় ভারতে আসেন	সত্য	মিথ্যা
(ঘ) মাখনের চেয়ে দুধ হাল্কা	সত্য	মিথ্যা

উপমান অভীক্ষা (Analogy Test)

এই অভীক্ষায় প্রথমে দুটি বস্তুর মধ্যে বিশেষ একটি সম্বন্ধ দেওয়া থাকে, তারপর তৃতীয় একটি বস্তুর সঙ্গে যে বস্তুটির ঠিক অনুরূপ সম্বন্ধ সে বস্তুটির নাম অভীক্ষার্থীকে বলতে বলা হয়। যেমন,

চাঁদের সঙ্গে পৃথিবীর যে সম্বন্ধ, পৃথিবীর সঙ্গে—সে সম্বন্ধ। (উঃ—সূর্যের)

সেই রকম,

(ক) সূর্যের সঙ্গে উত্তাপের যা সম্বন্ধ, ফুলের সঙ্গে—সে সম্বন্ধ।

(খ) গাড়ীর সঙ্গে চালকের যা সম্বন্ধ, ছাত্রের সঙ্গে—সে সম্বন্ধ।

(গ) কলম লেখে, তুলি—।

বহু-নির্বাচনী অভীক্ষা (Multiple Choice Test)

এই অভীক্ষায় কতকগুলি প্রশ্ন বা অসম্পূর্ণ বাক্য দেওয়া থাকে এবং প্রত্যেকটি প্রশ্ন যা বাক্যের সঙ্গে কতকগুলি (চারটে, পাঁচটা বা ছটা) শব্দ বা বাক্যাংশ দেওয়া থাকে যেগুলির মধ্যে একটি বিশেষ শব্দ বা বিশেষ বাক্যাংশ ঐ প্রশ্নটির নির্ভুল উত্তর হবে বা ঐ অসম্পূর্ণ বাক্যটিকে নির্ভুলভাবে সম্পূর্ণ করতে পারবে। অভীক্ষার্থীকে ঐ বিশেষ শব্দ বা বাক্যাংশটি বেছে নিতে হবে। অনেকগুলি সম্ভাব্যের মধ্যে থেকে একটিকে বেছে নিতে হয় বলে এই অভীক্ষাটিকে বহু-নির্বাচনী অভীক্ষা বলা হয়। যেমন

ভারতে প্রথম নোবেল পুরস্কার পান

১। গান্ধীজী ২। রবীন্দ্রনাথ ৩। সি. ভি. রমণ ৪। জহরলাল

[উঃ—রবীন্দ্রনাথ]

সেই রকম

(ক) আকবরের পর সিংহাসনে বসেন

১। জাহাঙ্গীর ২। শাজাহান ৩। হুমায়ুন ৪। আওরঙ্গজেব

(খ) ভারতের সবচেয়ে ঘনবসতিসম্পন্ন স্থান হল

১। পশ্চিম বঙ্গ ২। কেরালা ৩। বিহার ৪। পূর্ব পাঞ্জাব

(গ) 'অ্যানা ক্রীষ্টি' নামক নাটকের রচয়িতা কে?

১। বার্নাডশ ২। গলস্‌ওয়ার্দি ৩। ইউজিন ও নীল ৪। সমরসেট মম্‌

মিলকরণ অভীক্ষা (Matching Test)

এই অভীক্ষায় দুটি স্তম্ভ বা অংশ পাশাপাশি থাকে। প্রথম স্তম্ভে থাকে কতকগুলি অসম্পূর্ণ বাক্য এবং যে যে শব্দ বা বাক্যাংশের দ্বারা এই অসম্পূর্ণ বাক্যগুলি সম্পূর্ণ করা যায় সেগুলি থাকে দ্বিতীয় স্তম্ভ বা অংশটিতে। কিন্তু সেগুলি এলোমেলো ভাবে সাজান থাকে। অর্থাৎ প্রথম বাক্যটি যে শব্দ বা বাক্যাংশের দ্বারা সম্পূর্ণ হয় সেটি হয়ত রইল তৃতীয় সারিতে, আবার তৃতীয় বাক্যটি যে শব্দ বা বাক্যাংশের দ্বারা শেষ হবে সেটি রইল দ্বিতীয় সারিতে ইত্যাদি। অভীক্ষার্থীর কাজ হল প্রথম স্তম্ভের বাক্যগুলির উপযোগী শব্দ বা বাক্যাংশগুলি দ্বিতীয় স্তম্ভ থেকে খুঁজে বার করা বা এক কথায় প্রথম স্তম্ভের বাক্যগুলির সঙ্গে দ্বিতীয় স্তম্ভের শব্দ বা বাক্যাংশগুলির মধ্যে মিল করা যেমন—

প্রথম স্তম্ভ	দ্বিতীয় স্তম্ভ
১। শিখদের স্বর্ণমন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধ হল	১। রাওয়ালপিণ্ডি
২। ইস্পাত-কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ হল	২। আমেদাবাদ
৩। পশ্চিম পাকিস্থানের রাজধানী হল	৩। অমৃতসহর
৪। বস্ত্রশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ হল	৪। লক্ষ্ণৌ
৫। ভারতের বৃহত্তম রাজ্যের রাজধানী হল	৫। টাটানগর
	৬। বোম্বাই

[উঃ—এখানে প্রথম স্তম্ভের ১ নম্বর বাক্যের সঙ্গে মিল হবে দ্বিতীয় স্তম্ভের ৩নং নামটির, ২নং বাক্যের সঙ্গে ৫নং নামটির, ৩নং বাক্যের সঙ্গে ১নং নামটির, ৪নং বাক্যের সঙ্গে ২নং নামটির এবং ৫নং বাক্যটির সঙ্গে

৪নং নামটির। একটি অতিরিক্ত বিকল্প নাম দেওয়ার কারণ হল যাতে অভীক্ষার্থী অনুমানের সাহায্য নিতে না পারে।]

সেই রকম—

(ক) ১। পেনিসিলিনের আবিষ্কর্তা হলেন — ১। উইল্‌হেল্‌ম্ রোয়েন্ট্‌জেন
২। এক্সরে'র আবিষ্কর্তা হলেন — ২। এড্‌ওয়ার্ড ফিট্‌জেরাল্ড
৩। কিণ্ডারগার্টেনের প্রবর্তক হলেন — ৩। উইলিয়াম জেমস্
৪। ওমরখৈয়ামের ইংরাজী অনুবাদ করেন — ৪। ফ্রেডারিক ফ্রয়েবেল
৫। আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং

(খ) ১। 'ওহম্ ল' হল — ১। শিখন ও তার ফলাফল সংক্রান্ত একটি সূত্র
২। 'ল অফ্ এফেক্ট' হল — ২। বিদ্যুৎপ্রবাহ ও তার পরিবাহকের প্রতিরোধ সংক্রান্ত একটি সূত্র
৩। 'মেণ্ডেলিয়ান ল' হল — ৩। বাজারে মুদ্রার প্রচলন সংক্রান্ত একটি সূত্র
৪। 'গ্রেসাম্‌স্ ল' হল — ৪। মাধ্যাকর্ষণ সংক্রান্ত একটি সূত্র
৫। বংশধারার প্রকৃতি সংক্রান্ত একটি সূত্র

(গ) ১। মাউ মাউ কি? — ১। অক্ষিপটের একটি স্থানের নাম
২। গেষ্টাণ্ট কাকে বলে? — ২। প্রাচীন গ্রীসের বাদ্যযন্ত্র
৩। ফোভিয়া (fovea কার নাম? — ৩। কেনিয়ার একটি গুপ্ত দল
৪। লায়ার (lyre) কি? — ৪। একটি মানসিক ব্যাধি
৫। সমগ্র কাঠামো বা গঠন

আদর্শায়িত বা মাননির্ণীত অভীক্ষা (Standardised Test)

কোন অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা, যাথার্থ্য ও নৈর্ব্যক্তিকতা নির্ভর করে অভীক্ষার প্রশ্ন বা সমস্যাগুলির সংগঠনের উপর। কিন্তু এই গুণগুলি থাকলেই অভীক্ষাটি নিখুঁত হয় না। আমরা দেখেছি যে সংব্যাখ্যান ও তুলনীয়তাও (Interpretation and Comparability) যে কোন উৎকৃষ্ট অভীক্ষার অপরিহার্য গুণ। অর্থাৎ অভীক্ষাটির ফলাফলের যাতে ঠিকমত ব্যাখ্যা করা যায় এবং সেই ফলাফলের সঙ্গে অন্যান্য ফলাফলের যাতে তুলনা

করা যায় সে বৈশিষ্ট্যটিও অভীক্ষাটির থাকবে। এর জন্য অভীক্ষাটির একটি বিজ্ঞানসম্মত মান বা নর্ম থাকা প্রয়োজন।

সাধারণত স্কুলে কলেজে যে সব পরীক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে সেগুলির এ ধরনের কোন বিজ্ঞানসম্মত মান নেই। ফলে এইসব পরীক্ষায় যদি কেউ ২০ বা ৬০ বা ৯০ পায় তার সেই স্কোরের কোন বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা চলে না। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত একটা পাশমার্ক (৩০ বা ৩৬) ঠিক করে দেওয়া হয়, কিন্তু সেটিও সম্পূর্ণ খেয়ালখুশীমত এবং তার কোন যুক্তিনির্ভর ভিত্তি নেই। ফলে পরীক্ষার্থীর সাফল্যের কোনরূপ প্রকৃত পরিমাপ সম্ভব হয় না এবং যে কয়জন পরীক্ষা দিয়েছে তাদের মধ্যে একটা অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ তুলনা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যই পরীক্ষার দ্বারা সিদ্ধ হয় না।

সেজন্য প্রয়োজন এমন একটি মান বা নর্মের (norm) যেটির সঙ্গে কোন বিশেষ পরীক্ষার্থীর পাওয়া স্কোরের তুলনা করে আমরা পরীক্ষার্থীর সাফল্যের ঠিকমত বিচার করতে পারি। এ ধরনের মানকে জনসাধারণের মান (Population Norm) বলা হয়ে থাকে। আর যে অভীক্ষাটির এই মান নির্ণয় করা হয়ে থাকে তাকে আদর্শায়িত বা মাননির্ণীত অভীক্ষা (Standardised Test) বলা হয়। যেমন ধরা যাক সপ্তম শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের জন্য ইতিহাসের একটি আদর্শায়িত অভীক্ষা তৈরী করা হল। অর্থাৎ দেশে যত ছেলেমেয়ে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে তাদের উপর অভীক্ষাটি প্রয়োগ করে তাদের সাফল্যের একটা মান বা নর্ম ঠিক করা হল। মনে করা যাক, এই নর্মটি হল ৪২। এখন যদি বিশেষ একটি ছেলে ঐ পরীক্ষায় ৫০ পায়, তাহলে আমরা তৎক্ষণাৎ বলতে পারি যে সারা দেশের সপ্তম-শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই ছেলেটির স্থান কোথায়। যেমন এক্ষেত্রে নর্ম হল ৪২। অতএব এই বিশেষ ছেলেটির ইতিহাসের জ্ঞান সপ্তম শ্রেণীর সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশ কিছুটা বেশী এবং কতটা বেশী তাও আধুনিক পরিসংখ্যান-পদ্ধতির সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। কোন বিশেষ পরীক্ষায় নর্ম বা মান নির্ণয় করার পন্থা হল সমস্ত অভীক্ষার্থীদের স্কোরের সমষ্টিকে অভীক্ষার্থীদের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা। এখন জনসাধারণের মান নির্ণয় করতে গেলে প্রকৃতপক্ষে সেই বিশেষ শ্রেণীভুক্ত প্রত্যেকটি ব্যক্তির উপর অভীক্ষাটির প্রয়োগ করতে হয়। অর্থাৎ সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাসের অভীক্ষাটির মান নির্ণয় করতে হলে দেশে যত সপ্তম শ্রেণীর ছেলেমেয়ে আছে তাদের সকলের উপর অভীক্ষাটি প্রয়োগ করে তাদের

সমগ্র স্কোরের যোগফলকে তাদের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হয়। কিন্তু এ প্রক্রিয়াটি বাস্তবে সম্ভব নয় বলে সপ্তম শ্রেণীভুক্ত সমস্ত ছেলেমেয়েদের একটা বাছাই করা দলের (Sample Group) উপর অভীক্ষাটি প্রয়োগ করে তাদের স্কোর থেকেই সাধারণত মান বা নর্ম নির্ণয় করা হয়ে থাকে। অবশ্য দেখতে হবে যে এই বাছাই করা দলটি যেন সমগ্র দলের প্রতিনিধিস্বরূপ হয়। অর্থাৎ সমগ্র দলেতে যত বিভিন্ন শ্রেণীর (পরিবেশ, স্কুলে শিক্ষার মান, পিতামাতার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ইত্যাদির দিক দিয়ে) ছেলেমেয়ে আছে তাদের সকলেরই কিছু কিছু এই বাছাই করা দলটিতে থাকবে। বলা বাহুল্য এই বাছাই করা (Sampling) প্রক্রিয়াটি যত নিখুঁত হবে, নর্মও তত নির্ভুল হবে। সাধারণত একটি আদর্শায়িত বা মাননির্ণীত অভীক্ষা তৈরীর সময় নীচের সোপানগুলি অনুসরণ করা হয়ে থাকে।*

(১) প্রথমে যে সব প্রশ্ন বা সমস্যাগুলি নিয়ে অভীক্ষাটি তৈরী হবে সেগুলি প্রস্তুত করতে হবে। যতগুলি প্রশ্ন বা সমস্যা অভীক্ষাটিতে থাকবে তার প্রায় দ্বিগুণসংখ্যক প্রশ্ন বা সমস্যা প্রথমে তৈরী করা দরকার।

(২) এবার যে দলটির জন্য অভীক্ষাটি তৈরী হবে তাদের একটি ছোটখাট প্রতিনিধিমূলক দলের উপর অভীক্ষাটি প্রয়োগ করে যে সব প্রশ্ন বা সমস্যাগুলি অনুপযোগী বলে প্রমাণিত হবে সেগুলিকে বাদ দেওয়া। এই পদ্ধতিকে ট্রাই-আউট (Try-out) করা বলে।

(৩) তারপর অবশিষ্ট প্রশ্নগুলি থেকে প্রয়োজনীয়সংখ্যক প্রশ্ন নিয়ে অভীক্ষাটি তৈরী করা এবং সমগ্র দলের একটি যথেষ্টসংখ্যক প্রতিনিধিমূলক দলের উপর অভীক্ষাটি প্রয়োগ করে অভীক্ষাটির নর্ম বা মান নির্ণয় করা।

(৪) এইবার পরিসংখ্যান-পদ্ধতির সাহায্যে অভীক্ষাটির নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) ও যাথার্থ্যের (Validity) মান নির্ণয় করা।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে আদর্শায়িত বা মাননির্ণীত অভীক্ষাগুলি সব দিক দিয়ে নিখুঁত এবং এগুলির সাহায্যেই পরীক্ষার্থীদের সাফল্যের প্রকৃত পরিমাপ করা সম্ভবপর।

* লেখকের 'শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান' (৩য় খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

আধুনিক অভীক্ষার গুণ ও প্রাচীন পরীক্ষার সঙ্গে তুলনা

আমরা দেখেছি যে কোন সন্তোষজনক পরীক্ষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার। সেগুলি হল নৈর্ব্যক্তিকতা (objectivity), নির্ভরযোগ্যতা (reliability), যাথার্থ্য (validity), তুলনীয়তা, (comparability) ও সংব্যাখ্যান (interpretation), পরিমিততা (economy) এবং প্রয়োগশীলতা (administrability)। আধুনিক অভীক্ষার এ সব কটি গুণই আছে এবং এ ছাড়াও আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়।

✓নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity)

আধুনিক অভীক্ষাগুলি পুরোপুরি নৈর্ব্যক্তিক। অর্থাৎ এগুলি পরীক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব থেকে মুক্ত। এগুলি প্রাচীন পরীক্ষার মত রচনাধর্মী নয়। কয়েকটি সুদীর্ঘ প্রশ্নের পরিবর্তে এতে থাকে অনেকগুলি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এবং সেগুলির উত্তর সম্বন্ধে কোনরূপ মতদ্বৈধ থাকতে পারে না। অর্থাৎ সেগুলির উত্তর একই রকমের হয়, দুরকমের হয় না। এর ফলে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাবের কাজ করার কোন অবকাশই থাকে না। সকল পরীক্ষকই একই নম্বর দিতে বাধ্য হন। সত্য কথা বলতে কি এই নতুন ধরনের অভীক্ষাগুলি প্রচলনের পর থেকে পরীক্ষকের গুরুত্ব একেবারে কমে গেছে। এই অভীক্ষাগুলির উত্তর পরীক্ষা করার জন্য কোন উচ্চ শিক্ষিত অভিজ্ঞ শিক্ষকের দরকার হয় না। নির্দিষ্ট উত্তরের ছক কাটা ষ্টেনসিলের সাহায্যে সাধারণ শিক্ষাসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তিই উত্তরের কাগজগুলি অতি অল্প সময়ে পরীক্ষা করে ফেলতে পারে।

✓নির্ভরযোগ্যতা (Reliability)

আধুনিক অভীক্ষাগুলি নির্ভরশীলতার দিক দিয়ে সন্দেহাতীত। পরীক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব থেকে মুক্ত বলে এবং ছোট ছোট সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দিয়ে গঠিত হওয়ার জন্য এই অভীক্ষাগুলি প্রাচীন পরীক্ষার তুলনায় বহুলাংশে নিখুঁত। তা ছাড়া আজকাল আধুনিক পরিসংখ্যান-পদ্ধতির সাহায্যে নির্ভরশীলতার মান(Reliability co-efficient) নির্ধারণ করার পন্থা আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে এই আধুনিক অভীক্ষাগুলির ত্রুটিহীনতা সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ আর থাকে না। কিন্তু প্রাচীন পরীক্ষাগুলি রচনাধর্মী হওয়ায় নানারূপ ত্রুটিতে পূর্ণ থাকে।

যাথার্থ্য (Validity)

সেইরূপ এগুলির যাথার্থ্য (Validity) সম্বন্ধেও কোনরূপ বিতর্কের স্থান নেই। সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের দ্বারা অভীক্ষাটি গঠিত হওয়ায় পরীক্ষণীয় বিষয়টি ছাড়া অবান্তর কোন জ্ঞান, সামর্থ্য বা গুণ এগুলির দ্বারা পরীক্ষিত হবার সম্ভাবনা থাকে না। তাছাড়া আধুনিক পরিসংখ্যান-পদ্ধতির সাহায্যে যাথার্থ্যের মান (Validity co-efficient) নির্ণয়ের পন্থা আবিষ্কৃত হওয়ায় এই আধুনিক অভীক্ষাগুলির যাথার্থ্য সম্বন্ধেও নিশ্চিত হওয়া যায়। কিন্তু প্রাচীন অভীক্ষাগুলি রচনাধর্মী হওয়াতে সেগুলির যাথার্থ্য সম্বন্ধে প্রচুর সন্দেহের অবকাশ থাকে।

তুলনীয়তা (Comparability) ও সংব্যাখ্যান (Interpretation)

আধুনিক অভীক্ষামাত্রেরই যে এই বৈশিষ্ট্যগুলি আছে তা নয়। এর জন্য প্রয়োজন অভীক্ষাটিকে আদর্শায়িত বা মাননির্ণীত (standardised) করা। সে সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। একমাত্র যে আধুনিক অভীক্ষাকে আদর্শায়িত বা মান-নির্ণীত করা হয়েছে সেটিরই যথার্থ সংব্যাখ্যান সম্ভব এবং সেটি থেকে লব্ধ ফলের মধ্যে তুলনা করা চলে।

প্রয়োগশীলতা (Administrability)

প্রাচীন পরীক্ষাগুলির তুলনায় আধুনিক অভীক্ষাগুলি প্রয়োগ করতে অনেক বেশী সময় ও কৌশল লাগে। কিন্তু প্রাচীন পরীক্ষাগুলি প্রয়োগ করা সহজ হলেও সেগুলির প্রয়োগপদ্ধতি মোটেই নিখুঁত নয়। যে সব প্রশ্ন দেওয়া হয়ে থাকে সেগুলির উত্তর দেওয়া সম্বন্ধে পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্ট নির্দেশ থাকে না, ফলে পরীক্ষার্থীরা তাদের ধারণামত উত্তর লেখে এবং উত্তরগুলির মধ্যে কোন সামঞ্জস্য থাকে না। কিন্তু আধুনিক অভীক্ষাগুলিতে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া থাকে বলে পরীক্ষার্থীদের উত্তর লিখতে কোনরূপ অসুবিধায় পড়তে হয় না।

পরিমিততা (Economy)

আধুনিক অভীক্ষাগুলির উত্তর দিতে সময় ও পরিশ্রম অনেক কম লাগে। অবশ্য আধুনিক অভীক্ষাগুলি প্রাচীন পরীক্ষাগুলির চেয়ে অনেক ব্যয়বহুল এবং বিশেষজ্ঞের সাহায্য ছাড়া প্রস্তুত করা যায় না।

অন্যান্য গুণ

আধুনিক অভীক্ষায় বহু প্রশ্ন থাকার জন্যে সম্পূর্ণ পাঠক্রমটির উপর সুবিচার করা যেতে পারে। আগে সমস্ত পাঠ্যপুস্তকটি থেকে বাছাই করে স্বল্পসংখ্যক কতকগুলি প্রশ্ন দেওয়া হত, ফলে পাঠক্রমটির অধিকাংশই পরীক্ষার গণ্ডীর বাইরে পড়ে যেত। কিন্তু এখন সমস্ত পাঠ্য-বিষয়গুলির উপর ছড়িয়ে প্রশ্ন করা সম্ভব হয়ে থাকে।

প্রচলিত পরীক্ষার কয়েকটি তথাকথিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন মুখস্থ করে গেলেই শিক্ষার্থী পাশ করতে পারত। কিন্তু এখন তা করলে আর চলে না। সমস্ত পাঠ-ক্রমটি জুড়ে প্রশ্ন করার জন্য পরীক্ষার্থীকে এখন পুরো পাঠক্রমটিই পড়তে হয় এবং নিজের চিন্তন ও বিচারকরণ শক্তিকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হয়।

প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে কোনরূপ মতদ্বৈধ না থাকার জন্য উত্তরের কাগজ পরীক্ষা করার কার্যটি অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়। ফলে এক দিক দিয়ে শিক্ষকদের সময় এবং পরিশ্রমের প্রচুর লাঘব হয়।

আধুনিক অভীক্ষার দোষ

আধুনিক অভীক্ষাগুলির অনেক গুণ থাকলেও সেগুলি একেবারে দোষমুক্ত নয়। কতকগুলি গুরুতর অসুবিধা ও অপূর্ণতা থাকার জন্য এখনও এই অভীক্ষা-গুলি পূর্ণাঙ্গ পরিমাপযন্ত্র হয়ে উঠতে পারেনি।

প্রথমত, এগুলি শ্রমবহুল ও ব্যয়সাপেক্ষ বলে সাধারণ স্কুল-কলেজে এগুলির বহুল ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। প্রচলিত রচনাধর্মী একটি প্রশ্নপত্র তৈরী করতে বা মুদ্রণ করাতে পরিশ্রম এবং অর্থ তেমন লাগে না। কিন্তু আধুনিক অভীক্ষায় একশ বা তার বেশী প্রশ্ন থাকে এবং সেগুলিকে তৈরী করে পুস্তিকার আকারে ছাপাতে সময় ও অর্থ দুয়েরই যথেষ্ট প্রয়োজন হয়।

দ্বিতীয়ত, এগুলি প্রস্তুত করতে বিশেষজ্ঞের সাহায্য লাগে। যাঁরা আধুনিক অভীক্ষার কলাকৌশল সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে জ্ঞানলাভ করেন নি, তাঁরা সহজে এগুলি তৈরী করতে পারেন না। তাছাড়া এগুলি তৈরী করতে যথেষ্ট সময়ও লাগে। এর ফলে সাধারণ বিদ্যালয়ে এগুলির ইচ্ছামত ব্যবহার করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

তৃতীয়ত, এগুলির মধ্যে এমন অনেক প্রশ্ন থাকে যেগুলির উত্তর শিক্ষার্থীর নিছক অনুমানের উত্তর নির্ভর করে দিতে পারে। অবশ্য বর্তমানে পরিসংখ্যান-পদ্ধতির সাহায্যে এই দোষ যতটা সম্ভব দূর করার ব্যবস্থা হয়েছে।

চতুর্থত, অনেক মনোবিজ্ঞানীর মতে আধুনিক অভীক্ষার মধ্যেও ব্যক্তিকতার প্রভাব যথেষ্ট দেখা যায়। তবে রচনাধর্মী অভীক্ষায় ব্যক্তিকতা থাকে উত্তরগুলিতে নম্বর দেবার সময়, আর আধুনিক অভীক্ষায় ব্যক্তিকতা থাকে প্রশ্নগুলি রচনা করার সময়। পুলিয়াস (Pulias) দেখিয়েছেন যে একই পাঠ্যাংশের উপর একাধিক অভীক্ষকের তৈরী বিভিন্ন অভীক্ষা একই ছাত্রদলের উপর প্রয়োগ করার পর প্রাপ্ত ভুলগুলির মধ্যে সহপরিবর্তনের মান ·৫ এর বেশী পাওয়া যায়নি। এতে প্রমাণিত হয় যে বিভিন্ন অভীক্ষকের দ্বারা তৈরী প্রশ্ন অভীক্ষকদের ব্যক্তিকতার দ্বারা বেশ প্রভাবিত হতে পারে। তবে পুলিয়াসের অভিযোগ সত্য হলেও অনেক ক্ষেত্রে এর চেয়ে বেশী উচ্চ সহপরিবর্তনের মানও পাওয়া গেছে।

পঞ্চমত, আধুনিক অভীক্ষার বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ প্রায়ই করা হয় যে, এই অভীক্ষাগুলি উত্তর করার সময় যে শক্তিগুলির পরিমাপ করা হয়ে থাকে সেগুলি ছাড়াও অতিরিক্ত কিছুর পরিমাপ করা হয়ে থাকে এবং যদিও এই অতিরিক্ত কিছুর কোনরূপ শিক্ষামূলক গুরুত্ব নেই তবুও অভীক্ষার ফলাফল এর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। বস্তুত কোন আধুনিক অভীক্ষার উত্তর দিতে গেলে দেখা যাবে যে, কেবলমাত্র প্রশ্নের উত্তরটি আমাদের জানা থাকলেই চলে না, অভীক্ষায় প্রদত্ত নির্দেশ ও প্রশ্নের সংগঠন অনুযায়ী উত্তর দিতে গেলে অন্যান্য মানসিকশক্তি প্রয়োগ করারও রীতিমত প্রয়োজন। আধুনিক অভীক্ষার সংগঠনের অভিনবত্ব থেকেই এই দোষটি জন্মলাভ করেছে। অভীক্ষা রচনার সময় যথেষ্ট যত্ন নিলে এবং অভীক্ষার্থীকে নতুন অভীক্ষার সঙ্গে পূর্ব থেকে পরিচিত করে দিলে এই দোষের প্রভাব খুব বেশী দেখা যায় না।

সবশেষে, আধুনিক অভীক্ষাগুলির একটি অপূর্ণতা হল যে এগুলির দ্বারা সকল প্রকার মানসিক প্রক্রিয়া পূর্ণভাবে পরিমাপ করা এখনও সম্ভব হয়ে ওঠে নি। সাধারণভাবে বলতে গেলে তথ্য বা জ্ঞানের অর্জন সম্পর্কে যত রকমের পরিমাপ সম্ভব সবই এই আধুনিক অভীক্ষাগুলির দ্বারা করা যেতে পারে। যেমন কোন বিশেষ তথ্য বা জ্ঞান কতটুকু অর্জিত হল, বা কত বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান অর্জিত হল এই সব বিষয় খুব ভালভাবেই এই আধুনিক অভীক্ষাগুলির দ্বারা পরিমাপ করা যায়। অর্থাৎ কোন বিষয়বস্তু বুঝতে পারা (comprehension), শেখা (learning), সংরক্ষণ (retention), সম্পর্ক-নির্ণয়ন (relational thinking) ইত্যাদি মানসিক প্রক্রিয়াগুলি পরিমাপ করার পক্ষে এই বিষয়াত্মক অভীক্ষাগুলি যে বিশেষ কার্যকরী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু কতকগুলি মানসিক

প্রক্রিয়া আছে যেগুলি এই আধুনিক অভীক্ষার দ্বারা এখনও পূর্ণভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। যেমন কোন ভাবমূলক কবিতা বা গদ্যাংশের সৌন্দর্য উপলব্ধি (appreciation), কল্পনাশক্তির প্রয়োগ (imagination), তুলনামূলক বিচার (comparison), বর্ণনা (description), রচনাকুশলতা, ভাষাব্যবহারের উৎকর্ষ ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলি সন্তোষজনকভাবে পরিমাপ করার মত আধুনিক অভীক্ষা এখনও উন্নত হয়ে ওঠেনি। অথচ বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় এইসকল গুণগুলি শিক্ষার্থীর পক্ষে অর্জন করা একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়ে থাকে। এই গুণগুলি পরিমাপ করার জন্যই রচনাধর্মী অভীক্ষাকে এখনও শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ নির্বাসিত করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে রচনাধর্মী অভীক্ষায় উপরে বর্ণিত গুণগুলির পরিমাপ করা গেলেও সে পরিমাপ একান্তই ত্রুটিপূর্ণ এবং অতিরিক্ত ব্যক্তিকতা দোষে দুষ্ট হওয়ায় সে পরিমাপ একেবারেই নির্ভরযোগ্য নয়। আধুনিক বিষয়াত্মক অভীক্ষার দিন দিন এত দ্রুত উন্নতি হচ্ছে যে অদূর ভবিষ্যতে এই সব গুণগুলিরও সন্তোষজনক পরিমাপ এই অভীক্ষাগুলির দ্বারা করা সম্ভব হয়ে উঠবে।

রচনাধর্মী অভীক্ষার উন্নতকরণ

অতএব দেখা যাচ্ছে যে রচনাধর্মী প্রশ্ন নানা কারণে পরীক্ষা ব্যবস্থা থেকে বর্তমানে একবারে বাদ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সেইজন্য আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ নানা উপায়ে রচনাধর্মী প্রশ্নগুলিকে উন্নত ও অধিকতর ত্রুটিহীন করার চেষ্টা করেছেন। যে যে উপায়ে রচনাধর্মী অভীক্ষাকে উন্নত করা যায় তার কয়েকটি পন্থার নীচে বর্ণনা করা হল।

(১) প্রথমে প্রশ্নকারক দেখবেন যে পরীক্ষণীয় বিষয়বস্তুটির মধ্যে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রগুলি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু রচনাধর্মী অভীক্ষায় বেশী প্রশ্ন দেওয়া যায় না সেহেতু প্রশ্নকারক অতি প্রয়োজনীয় অভীক্ষাগুলি বেছে নেবেন ও সেগুলি থেকে প্রশ্ন করবেন।

(২) এমন প্রশ্ন করা হবে না যেগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিলে যায়, কেননা তার ফলে পরীক্ষার্থীকে একই জিনিষ দুবার লিখতে হয়।

(৩) প্রশ্নের সংখ্যা যতটা বাড়ানো যাবে ততই অভীক্ষাটির নির্ভরশীলতা বাড়বে। তবে প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে যতখানি সময় ন্যায়সঙ্গতভাবে লাগা

উচিত তার হিসাব করে উত্তরদানের কাল নির্ধারিত করে দিতে হবে, যাতে নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষার্থীকে কমও লিখতে না হয় বেশীও না লিখতে হয়।

(৪) কোন্ ধরনের রচনাধর্মী প্রশ্ন বেশী নির্ভরশীল এই নিয়ে অনেক অনুসন্ধান করা হয়েছে। দেখা গেছে যেগুলির মধ্য দিয়ে একটা নির্দিষ্ট সমস্যা উপস্থাপিত করা হয় এবং কি চাওয়া হয় সেটাও নির্দিষ্ট করে বলা থাকে, সেই ধরনের ছোট ছোট আলোচনামূলক প্রশ্নই সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য। কিন্তু যে সব প্রশ্ন অস্পষ্ট ধরনের অথচ শিক্ষার্থীদের উত্তর লেখায় যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকে, সে সব প্রশ্ন ছাত্রদের প্রিয় হলেও নির্ভরশীলতার দিক দিয়ে বেশ নিকৃষ্ট।

(৫) প্রত্যেকটি প্রশ্ন সহজ ভাষায় রচিত ও সম্পূর্ণ দ্ব্যর্থহীন হবে যাতে সকল পরীক্ষার্থীই প্রশ্নটির একই অর্থ ধরতে পারে। এর ফলে উত্তরের মধ্যেও বিশেষ বিভিন্নতা থাকবে না।

(৬) প্রশ্নের উত্তর-পরীক্ষা একজনের বেশী পরীক্ষকের দ্বারা করান হলে ভাল হয়। চার-পাঁচজন পরীক্ষক গঠিত কোন বোর্ডের দ্বারা পরীক্ষা করলে সব চেয়ে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

(৭) প্রশ্নের উত্তরে নম্বর দেওয়ার সময় একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা করে নেওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে যে সব সাধারণী পরীক্ষায় একই বিষয়ের খাতা বহু পরীক্ষক দেখেন, সেখানে এই ধরনের নম্বর দেওয়ার একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা অপরিহার্য। এই পরিকল্পনায় প্রশ্নটির সম্ভাব্য উত্তরটিকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে নিয়ে প্রত্যেকটি অংশের জন্য নম্বর নির্দিষ্ট করে রাখা হয়। এইবার পরীক্ষার্থীর উত্তর ঐ অংশগুলির সঙ্গে যতটুকু মেলে সেইভাবে তাকে নম্বর দেওয়া হয়। এই পন্থা অনুসরণ করলে বিভিন্ন পরীক্ষকের নম্বরের মধ্যে অসমতা অনেক কম হয়।

(৮) রচনাধর্মী অভীক্ষার সাহায্যে যখন কোন সাধারণ গুণ যেমন ভাল হাতের লেখা, রচনাকৌশল, ভাষা-ব্যবহারের দক্ষতা ইত্যাদি পরিমাপ করা হয় তখন গুণ-পরিমাপক স্কেলের পদ্ধতি (Quality Scale Method) ব্যবহার করা উচিত। এই পদ্ধতিতে প্রথমেই ঐ বিশেষ গুণটির (ধরা যাক হাতের লেখার) উৎকর্ষের বিভিন্ন মাত্রার পরিচায়ক নমুনাগুলিকে একটি স্কেলের আকারে সাজিয়ে নেওয়া হয়। এইবার বিশেষ কোন পরীক্ষার্থীর হাতের লেখা ঐ স্কেলের সঙ্গে তুলনা করে স্কেলের কোনখানে ঐ অভীক্ষার্থীর স্থান তা নির্ণয় করা যায়। এইভাবে গুণ-পরিমাপক স্কেলের সাহায্যে বিভিন্ন সাধারণ গুণের পরীক্ষা করা সম্ভব। অবশ্য এই

সময় যত্ন নিতে হবে যে একটি গুণের পরীক্ষা করতে গিয়ে অন্য কোন গুণের দ্বারা পরীক্ষক যেন প্রভাবিত না হন।

(৯) উত্তর পরীক্ষার সময় মনে রাখতে হবে যে কেবলমাত্র পরীক্ষার্থীদের প্রদত্ত উত্তরের গুণাগুণ বিচার করেই তাদের মান ঠিক করা হবে, অন্য কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্যের বিচারে নয়। উত্তরপত্র পরীক্ষা করার সময় প্রত্যেকটি প্রশ্নের সমস্ত পরীক্ষার্থীদের দেওয়া উত্তরগুলি আগে দেখে নিতে হবে, অপর কোন প্রশ্নের উত্তর দেখতে সুরু করার আগে।

(১০) উত্তরগুলিকে কতকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করে ফেলতে হবে। এই শ্রেণীগুলির সংখ্যা যেন দশটির বেশী না হয় ও তাদের মধ্যে ব্যবধান যেন সমান হয়। যেমন মোট নম্বর যদি একশত হয়, তবে ০—৯, ১০—১৯, ২০—২৯, ইত্যাদি—এই ভাবে দশটি শ্রেণী আমরা তৈরী করে নিতে পারি। এখানে প্রত্যেকটি শ্রেণীর বিস্তার দশ। এইবার উত্তরগুলিকে পরীক্ষা করে আমরা এই দশটি শ্রেণীর মধ্যে ভাগ করে দিতে পারি। দেখতে হবে যে প্রত্যেকটি শ্রেণীতে উত্তরের সংখ্যা এমন হয় যাতে বণ্টনের আকৃতিটি স্বাভাবিক রেখার (Normal Curve) রূপ ধারণ করে। তারপর প্রয়োজন হলে প্রত্যেকটি শ্রেণীর উত্তরগুলিকে সাজিয়ে সেগুলিকে স্বতন্ত্র নম্বর দেওয়া যেতে পারে। আধুনিক কালে নম্বর দেওয়ার পরিবর্তে শ্রেণীবিভাগ রাখাই অনেকে বাঞ্ছনীয় মনে করেন ও শ্রেণীর সংখ্যাও দুই, তিন ও চারের বেশী করা হয় না—যেমন প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণী বা পাশ ও ফেল ইত্যাদি।

ধারাবাহিক পরিমাপ-পত্র

এ ছাড়া শিক্ষার্থীর অগ্রগতির ধারাবাহিক পরিমাপ-পত্র (Cumulative Record Card) সংরক্ষণের প্রথা আধুনিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রবর্তিত হয়েছে। এই পরিমাপ-পত্রে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বিষয়ে দৈনিক কতটা অগ্রগতি হল তার একটা বিবরণী লিপিবদ্ধ করা হয়। বিভিন্ন বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ তাঁদের দৈনন্দিন বিচার বা পরিমাপের সাহায্যে এই লিপিবদ্ধ করার কাজটি করেন। সেই বিবরণী থেকে যে কোন সময়ের জন্য শিক্ষার্থীটির বিভিন্ন বিষয়ে অগ্রগতির একটা সমষ্টিগত ছবি পাওয়া যায়। তা ছাড়া এই বিবরণী থেকে শিক্ষার্থীর কেবলমাত্র পাঠ্যবিষয়গুলিতে কৃতকার্যতার পরিচয়ই পাওয়া যায় যে তা নয়, তার

ব্যক্তিসত্তার বহুমুখী বিকাশের বিভিন্ন দিকেরও একটা বাস্তব ছবি পাওয়া যায়। এইজন্য এই বিবরণীকে শিক্ষার্থীর ক্রমবিকাশের রেখাচিত্র বলে বর্ণনা করা যায়। সাধারণত এই ধরনের একটি ধারাবাহিক পরিমাপ-পত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে ঃ

(১) শিক্ষার ইতিহাস

(২) গৃহপরিবেশের বিবরণ

(৩) ব্যক্তিগত গুণাবলী, যেমন—সামাজিকতা, উৎসাহ, মনোযোগ ইত্যাদি

(৪) বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ে সাফল্য

(৫) বুদ্ধি ও বুদ্ধির ক্রমবিকাশ

(৬) সহ-পাঠক্রমিক কার্যাদির বিবরণ

(৭) আগ্রহ, হবি ও অন্যান্য কার্যাদি

(৮) দৈহিক বিবরণ, স্বাস্থ্যের প্রকৃতি ইত্যাদি

(৯) ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ

এই ধারাবাহিক পরিমাপ-পত্র আধুনিক কালে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং সব দেশের শিক্ষাবিদ্‌গণ এর কার্যকারিতা সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। তবে এতেও দৈনিক অগ্রগতির বিবরণী অনেক ক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ করা হয় শিক্ষক-শিক্ষিকার ব্যক্তিগত পরিমাপনের সাহায্যে। এই পরিমাপনের সময় যদি যথেষ্ট সতর্কতা নেওয়া না হয় তাহলে এই বিবরণীটিও ব্যক্তিকতা (subjectivity) দোষে দুষ্ট হতে বাধ্য। তবে বর্তমানে শিক্ষণ-পরিমাপনের নানা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ায় এই আশঙ্কা অনেক কমে এসেছে। এ ছাড়া দৈনন্দিন অগ্রগতির পরিমাপ-পদ্ধতিও যতটা সম্ভব আধুনিক বিষয়াত্মক অভীক্ষার (Objective Test) উপর নির্ভরশীল হয় ততই ভাল।

বহু আধুনিক বিদ্যালয়ে এক শ্রেণী থেকে আর এক শ্রেণীতে উন্নয়নের জন্য প্রচলিত বাৎসরিক পরীক্ষা পদ্ধতি উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার পরিবর্তে সারা বৎসরে পরীক্ষার্থীর অগ্রগতির ধারাবাহিক বিবরণী এই ভাবে সংরক্ষণ করা হয় এবং সেই ফলাফলের উপর নির্ভর করে শিক্ষার্থীর উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নত হবার যোগ্যতার বিচার করা হয়।

আভ্যন্তরীণ ও বহিরনুষ্ঠিত বা সাধারণী পরীক্ষা

সাধারণত সকল দেশের শিক্ষাব্যবস্থাতেই দু'প্রকারের পরীক্ষা-পদ্ধতির প্রচলন দেখা যায়। প্রথমত, বৎসরের মধ্যে যে ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক ইত্যাদি কিংবা বৎসরের শেষে যে বার্ষিক পরীক্ষাগুলি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজেরাই শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য করে থাকেন, সেগুলিকে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা (Internal examination) নাম দেওয়া যেতে পারে। এগুলি একাধারে যেমন শিক্ষার্থীর সাফল্যের পরিমাপক, তেমনই আবার বিদ্যালয়ের অগ্রগতিরও মাপকাঠি। দ্বিতীয়ত, বিদ্যালয়ের বাইরের কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ যখন শিক্ষার্থীদের সাফল্য পরিমাপ করার জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করে থাকেন, তখন তাকে বহিরনুষ্ঠিত পরীক্ষা (External examination) বলা হয়। এই পরীক্ষাগুলিতে একসঙ্গে অনেকগুলি স্কুল বা কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সাফল্যের পরিমাপ করা হয় বলে এগুলিকে সাধারনী পরীক্ষা (Public examination) বলা হয়।

এই সাধারণী পরীক্ষাগুলি কোন বিশেষ বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যেমন আমাদের দেশে মাধ্যমিক বোর্ড তার অধীনস্থ সমস্ত স্কুলগুলির জন্য স্কুল-ফাইনাল বা হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার অনুষ্ঠান করে থাকে। এই পরীক্ষায় শিক্ষার্থী পাশ করতে পারলেই সে কলেজে যোগ দেবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। সেই রকম ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা, ডিগ্রী পরীক্ষা, ডাক্তারী পরীক্ষা প্রভৃতির আয়োজন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে করা হয়ে থাকে। এগুলি সবই সাধারণী পরীক্ষা।

বহিরনুষ্ঠিত বা সাধারণী পরীক্ষার ত্রুটি

যদিও সাধারণী পরীক্ষা গ্রহণের প্রথা বর্তমানে পৃথিবীর সব দেশেই প্রচলিত আছে তবু এ প্রথা যে নানাদিক দিয়ে গুরুতরভাবে ত্রুটিপূর্ণ এমন কি অনেক দিক দিয়ে ক্ষতিকরও সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সাধারণভাবে পরীক্ষা প্রথা মাত্রেরই যে সব দোষ ও অসম্পূর্ণতা আছে সেগুলির প্রত্যেকটিই সাধারণী পরীক্ষাতেও তীব্রমাত্রাই বর্তমান। এগুলি সম্পর্কে ১৬২—১৬৬ পাতায় বিশদ-ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এখানেও সেগুলির আর একবার উল্লেখ করা হল।

সাধারণী পরীক্ষাগুলির প্রধান দোষ হল যে এগুলি রচনাধর্মী এবং তার ফলে এগুলিতে নীচের গুরুতর ত্রুটিগুলি থাকতে বাধ্য। যেমন—

১। নির্ভরযোগ্যতার অভাব

২। যাথার্থ্যের অভাব

৩। প্রয়োগশীলতার অভাব

৪। সংব্যাখ্যান ও তুলনীয়তার অভাব

৫। মিতব্যয়িতার অভাব

এগুলি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা ১৬২—১৬৫ পাতায় দ্রষ্টব্য।

তাছাড়া সাধারণভাবে পরীক্ষাগ্রহণ-পদ্ধতি মাত্রেরই যে সব দোষ থেকে থাকে সেগুলিও সাধারণী পরীক্ষায় বর্তমান। যেমন—

৬। শিক্ষাব্যবস্থাটি পুরোপুরি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রিত হয়ে ওঠে। পরীক্ষায় পাশ করাই প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, প্রকৃত শিক্ষা হয় গৌণ এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পাঠক্রম, শিক্ষণব্যবস্থা, এমন কি সমস্ত শিক্ষাপরিকল্পনাটিও বিকৃত হয়ে ওঠে।

৭। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর মনোভাব এনে দেয়। বিদ্যালয়ের পরিবেশে অবাঞ্ছনীয় রেষারেষি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবহাওয়া সৃষ্টি হয়। ফলে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশ ব্যাহত হয়।

৮। বিদ্যা অর্জনের আদর্শকে বড় না করে ডিগ্রী ডিপ্লোমা অর্জন করার সংকীর্ণ লক্ষ্যকে শিক্ষার্থী বড় করে। তার ফলে শিক্ষার্থী সত্যকারের শিক্ষাকে ভালবাসতে শেখে না এবং শিক্ষার নৈতিক ও কল্যাণকর প্রভাব অনুভব করতে পারে না। তার কাছে শিক্ষার মাধ্যমে পাওয়া পার্থিব সাফল্যটাই বড় হয়ে দাঁড়ায়।

৯। সাধারণী পরীক্ষা প্রথায় আর একটি ত্রুটি হল যে প্রশ্নকারকেরা পরীক্ষার্থীদের জ্ঞান পরীক্ষা করার জন্য পরীক্ষণীয় বিষয়টি থেকে প্রায়ই অপ্রয়োজনীয় ও গুরুত্বহীন ছোটখাট ব্যাপারের উপর প্রশ্ন করে থাকেন। তাঁদের ধারণা যে শিক্ষার্থী যদি অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি আয়ত্ত করে থাকে তবে প্রয়োজনীয় অংশগুলি সে নিশ্চয়ই আয়ত্ত করেছে। কিন্তু এ যুক্তি নিতান্তই ভুল এবং এর ফলে হয়েছে যে পরীক্ষার্থীরা বাধ্য হয়ে পাঠ্যবস্তুটির অপ্রয়োজনীয় অংশগুলিও প্রয়োজনীয় অংশগুলির সঙ্গে সমান গুরুত্ব দিয়ে পড়তে বাধ্য হয়। এতে অযথা সময় ও শক্তির অপচয় ঘটে।

১০। সাধারণী পরীক্ষায় অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও নীতির আয়ত্তীকরণের প্রতি জোর না দিয়ে বেশী জোর দেওয়া হয় তথ্য আহরণের উপর। তার ফলে

শিক্ষার্থীকে পুরোপুরি নির্ভর করতে হয় যান্ত্রিক মুখস্থ করণের উপর এবং তার বিচারকরণ, উপলব্ধিকরণ ইত্যাদি প্রক্রিয়ার কোনরূপ চর্চাই হয় না।

আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা অর্থাৎ যেগুলি স্কুল-কলেজে কর্তৃপক্ষরা নিজেরাই অনুষ্ঠিত করে থাকেন, সেগুলির চেয়ে এই বহিরনুষ্ঠিত বা সাধারণী পরীক্ষাগুলি আরও অনেক বেশী ক্ষতিকর। সাধারণী পরীক্ষার ক্ষেত্রে নীচের ত্রুটিগুলি বিশেষ করে দেখা যায়।

(১১) পরীক্ষা ও পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকার ফলে পরীক্ষা কার্যটি যেমন ত্রুটিপূর্ণ হয় তেমনই পরীক্ষার্থীদের মধ্যে একটা অহেতুক ভীতি, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। আভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় শিক্ষকেরাই পরীক্ষক। ফলে তাঁরা শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী প্রশ্ন করতে পারেন এবং শিক্ষার্থীদেরও মধ্যে ততটা ভয় বা অবিশ্বাসের কারণ থাকে না।

(১২) পরীক্ষকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের অভাবে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন ধারণা করতে পারে না। ফলে পাশ করার সহজ উপায়রূপে তারা অন্ধভাবে মুখস্থ করার আশ্রয় গ্রহণ করে। আনুমানিক কতকগুলি প্রশ্ন বেছে নিয়ে অপরের প্রস্তুত উত্তরগুলি কণ্ঠস্থ করে পরীক্ষার খাতায় সেগুলি তার হুবহু ঢেলে দিয়ে আসে। এর ফলে শিক্ষার মান ভীষণভাবে নেমে যায়।

(১৩) বহিরনুষ্ঠিত পরীক্ষা পরীক্ষার্থীদের মনের উপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে। বহু ছাত্রছাত্রীকে এই পরীক্ষা দেবার সময় মানসিক স্বাস্থ্য ও সাম্য হারিয়ে ফেলতে দেখা গেছে। ফলে পরীক্ষায় যতটুকু সাফল্য লাভ করা তার আয়ত্তাধীন প্রকৃতপক্ষে সে তার অনেক কম করতে পারে।

ত্রুটি সংশোধনের উপায়

বহিরনুষ্ঠিত পরীক্ষার এই সকল মারাত্মক ত্রুটি থাকার জন্য আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ এই পদ্ধতি একেবারে উঠিয়ে দেবার পক্ষপাতী। সাধারণ স্কুল-কলেজের পাঠ সমাপনের চরম নির্ণায়ক রূপে বর্তমানে বহিরনুষ্ঠিত বা সাধারণী পরীক্ষা পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্তু স্কুল-কলেজের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফল শিক্ষকের পরিমাপন, শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির ধারাবাহিক পরিমাপ-পত্র ইত্যাদির উপর নির্ভর করে শিক্ষার্থীর পাঠ-সমাপনের বিচার করা উচিত। আধুনিক বহু প্রগতিশীল দেশের স্কুল-কলেজের চরম পরীক্ষা আভ্যন্তরীণ কর্তৃপক্ষরাই অনুষ্ঠিত করে, থাকেন। কিন্তু যেহেতু এখনও সাধারণী পরীক্ষা পদ্ধতিটি সম্পূর্ণরূপে উঠিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি সেহেতু সাধারণী পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সতর্কতা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

১। প্রশ্নপত্র রচনার সময় পরীক্ষক পরীক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয়তা ও সামর্থ্য সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন। প্রশ্নগুলি এমন হওয়া চাই যাতে শিক্ষার্থীদের বিদ্যার সত্যকারের পরিমাপ হয়। পরীক্ষার্থীকে জব্দ করার জন্য প্রশ্ন করায় পরীক্ষকের চাতুর্য প্রমাণিত হতে পারে, কিন্তু বিচক্ষণতা প্রমাণিত হয় না।

২। শিক্ষক ছাড়া অন্য কেউ পরীক্ষক হতে পারবেন না। অভিজ্ঞ ও সফল শিক্ষকগণের মধ্যে থেকে যত্ন সহকারে পরীক্ষকের নির্বাচন করতে হবে। শিক্ষকেরা প্রশ্নকারক ও পরীক্ষক হলে ছাত্রদের প্রস্তুতি ও জ্ঞানার্জনের মানের প্রতি সুবিচার করতে পারেন।

৩। পরীক্ষা এবং শিক্ষণের মধ্যে যেন কোন অস্বাভাবিক ব্যবধান গড়ে তোলা না হয়। শিক্ষার্থীরা যদি পরীক্ষাকে শিক্ষণেরই একটা অঙ্গ বলে ধরে নেয় তবে তাদের মধ্যে অহেতুক ভয় বা অবিশ্বাস থাকবে না। এই জন্যই আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা কম ক্ষতিকর।

৪। পরীক্ষা সংখ্যায় যত কমান যায় ততই ভাল। কোন বিশেষ পাঠস্তরের শেষে সাধারণী পরীক্ষা অনুষ্ঠান করা চলতে পারে। কিন্তু মধ্যবর্তীকালে কোন সাধারণী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত না করা উচিত।

৫। সাধারণী পরীক্ষাগুলি রচনাধর্মী হওয়ায় যে সব দোষ দেখা যায় সেগুলি দূর করতে হলে দুটি উপায় অবলম্বন করতে হবে। প্রথম, যতদূর সম্ভব সাধারণী পরীক্ষায় বিষয়াত্মক প্রশ্নের প্রবর্তন করতে হবে। আর দ্বিতীয়, যেখানে যেখানে রচনাধর্মী প্রশ্নের প্রবর্তন করা অপরিহার্য, সেখানে সেখানে উন্নততর ও যতটা সম্ভব ব্যক্তিকর্তা-দোষশূন্য প্রশ্ন দিতে হবে। কি কি উপায় অবলম্বন করলে রচনাধর্মী প্রশ্নকে উন্নত করা যায় তার সম্পর্কে ১৭৭ পাতায় বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the merits and demerits of public examination. Can examination be improved? (B.A. '57,58, B.T. '58,59,61)

Ans. (পৃঃ ১৮১—পৃঃ ১৮৩)

2. What are the defects of the existing system of examination? How would you bring about reforms in the system? (B. A. 1959)

Ans. (পৃঃ ১৬২—পৃঃ ১৮০)

3. Critically examine the influence of public examination on teaching. (B. A. 1961, 1962)

Ans. (পৃঃ ১৮১—পৃঃ ১৮৪)

প্রগতিশীল বা শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা

বিংশ শতাব্দীকে শিক্ষাজগতে শিশু-জাগরণের যুগ বলা চলে। শিশু নিজে শিক্ষাপ্রক্রিয়ার প্রধানতম উপকরণ হলেও প্রাচীনকাল থেকেই শিক্ষার প্রকৃতি নির্ধারণে সেই শিশুকেই সম্পূর্ণ অবহেলা করে আসা হয়েছে। শিশুর নিজস্ব চাহিদা, সামর্থ্য, আগ্রহ, পছন্দ-অপছন্দ এ সমস্তকেই উপেক্ষা করে সেগুলির জায়গায় বড় করা হয়ে এসেছে পিতামাতা, সমাজনায়ক, ঐতিহ্য, সামাজিক রীতি-নীতি ইত্যাদির দাবীকে। শিশুর স্বাধীনতা ও নিজস্ব কর্মপ্রচেষ্টায় কোনও স্থানই ছিল না এই গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায়। কেন শিশু শিখবে, কি শিখবে, কি ভাবে শিখবে, কখন শিখবে এ সবেরই সর্বময় নিয়ন্ত্রক ছিলেন বয়স্কেরা। মনোবিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি না হওয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষা-পদ্ধতি কতকগুলি কাল্পনিক ও ভ্রমাত্মক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং শিশুর মানসিক প্রক্রিয়া ও শিখনক্ষমতার প্রতি একেবারেই মনোযোগ দেওয়া হত না।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার ইতিহাস

এই গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থা যে বিশেষভাবে ত্রুটিপূর্ণ এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধনে নিতান্তই অসমর্থ এ কথা প্রাচীনকাল থেকেই বিচক্ষণ শিক্ষাবিদেরা উপলব্ধি করে এসেছেন এবং প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সংশোধন যে একান্ত প্রয়োজন তাও তাঁরা জানিয়েছেন।

কুইন্টিলিয়ান

এ প্রসঙ্গে আমরা প্রথমেই প্রাচীন রোমান শিক্ষাবিদ কুইন্টিলিয়ানের (Quintilian) নাম করতে পারি। তাঁর লেখায় শিশুর শিক্ষা সম্পর্কে অনেক আধুনিক ভাবধারার সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, তিনি শিশুর দৈহিক শাস্তিদানের বিরোধী ছিলেন, বিভিন্ন শিশুর সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষাদানের প্রস্তাব করেন এবং গৃহে শিক্ষাদানের চেয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানকে অধিকতর কার্যকরী বলে মনে করতেন। তাছাড়া তাঁর মতে শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের উপযোগী মনোভাব তৈরী করা, শিক্ষার্থীর মানসিক বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করা এবং শিক্ষাকে

শিশুর কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা সুশিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য। বলা বাহুল্য এই মতবাদগুলির প্রত্যেকটিই আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ইরাসমাস

পঞ্চদশ শতাব্দীর সূত্রপাতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলিতে প্রাচীন পুঁথি সর্বস্ব ধর্মভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন দেখা দেয় এবং নতুন মানবতা-বাদী শিক্ষার উদ্ভব হয়। এই মানবতাবাদী শিক্ষকদের মধ্যে ইরাসমাসের (Erasmus) নাম উল্লেখযোগ্য। যদিও তাঁর শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক ও ধর্মমূলক শিক্ষার উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল তবু তিনি প্রচলিত বর্বরোচিত পন্থায় শৃঙ্খলারক্ষার প্রথার তীব্র বিরোধিতা করেন, এবং অধিকতর আকর্ষণীয় পন্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। তাছাড়া তিনি শিশুকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করা, শিক্ষায় খেলায় এবং অঙ্গসঞ্চালনের ব্যবস্থা রাখা এবং বাস্তবজীবনের সঙ্গে শিক্ষার নিকট সম্পর্ক স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই মানবতাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত হয় বাস্তবতাবাদী আন্দোলন। এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হল শিক্ষাকে কতকগুলি অবাস্তব ও কাল্পনিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপকরণরূপে না রেখে তাকে শিশুর বাস্তব চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা পূরণের সহায়ক করে তোলা।

কমেনিয়াস

বাস্তবতাবাদী শিক্ষাবিদগণের মধ্যে কমেনিয়াসের (Comenius) নাম প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। ইনিই সর্বপ্রথম শিশু শিক্ষার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তাঁর মতে শিশুকে শেখানোর পদ্ধতি হবে স্বাভাবিক। শিশুকে যা শেখাতে হবে তা তার সামনে সরাসরি উপস্থাপিত করতে হবে, কোন প্রতীকের মধ্যে দিয়ে নয়; তা যেন তার দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করা যায় এবং যেন সহজ ও সোজাসুজি পন্থায় শেখান হয়। শিক্ষার বিষয়বস্তুর সাধারণ নীতিগুলি প্রথমে শিশুর সামনে উপস্থিত করতে হবে, পরে সেটি বিশদভাবে শেখান যেতে পারে। কমেনিয়াস তাঁর এই পদ্ধতির নাম দিয়েছিলেন প্রকৃতির পদ্ধতি (Method of Nature) এবং এই পদ্ধতির উপর ভিত্তি করেই তিনি প্রথম শিশুদের জন্য বিজ্ঞানসম্মত পাঠ্যপুস্তক তৈরী করেন।

রুশো

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিক্ষাজগতে আর এক নতুন ভাবধারার প্রবাহ দেখা দেয় এর নাম প্রকৃতিবাদ। প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক রুশোকে (Rousseau) এই নতুন মতবাদের প্রধান হোতা বলে বর্ণনা করা হয়। রুশো ছিলেন আদর্শবাদী, মানবধর্মে পরমবিশ্বাসী, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উদগ্র সমর্থক। তীব্র আবেগময় সমালোচনার প্রচণ্ড আঘাতে তিনি গতানুগতিক সঙ্কীর্ণ আদর্শভ্রষ্ট শিক্ষাধারার জরাজীর্ণ সৌধটি ধূলিসাৎ করে দিলেন। তিনি জানালেন যে শিশুকে যথার্থ শিক্ষা দিতে হলে তাকে দূষিত সমাজের আবহাওয়া থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে প্রকৃতির সহজ স্বচ্ছন্দ পরিবেশে রাখতে হবে। তাঁকে দিতে হবে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, কোনরূপ কৃত্রিম শিক্ষাব্যবস্থা তার উপর চাপান চলবে না। শিশুর অন্তর্প্রকৃতি নির্ধারিত করবে তার শিক্ষার স্বরূপ এবং বহিপ্র্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করবে তার শিক্ষার প্রক্রিয়া। সক্রিয়তা, বাধাহীন অঙ্গসঞ্চালন এবং অনিয়ন্ত্রিত আত্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে শিশুর শিক্ষা এগিয়ে যাবে। শিক্ষক থাকবেন পাশে নিছক সহায়করূপে, সর্বশক্তিমান নিয়ন্ত্রকরূপে নন। শৃঙ্খলা নিজে থেকেই আসবে, কৃত্রিম উপায়ে তার উপর চাপানো হবে না। বর্তমান প্রগতিশীল শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার যতগুলি বৈশিষ্ট্য আমরা আজ দেখতে পাই তার প্রায় সব কটিরই বীজ উপ্ত ছিল রুশোর প্রচারিত শিক্ষার নতুন আদর্শে। এই দিক দিয়ে রুশোকে আমরা শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার জনক বলে বর্ণনা করতে পারি।

রুশো কিন্তু নিজে স্রজক ছিলেন না। প্রগতিশীল শিক্ষার নবীন ভাব প্রবাহের শৈলকারার রুদ্ধদ্বার চূর্ণ করে তার মুক্তি ঘটিয়েই তাঁর কাজ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সেই মুক্ত প্রবাহকে কঠিন মাটিতে পথ করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দুরূহ কাজ পড়ল তার অনুগামী ভক্ত ও অনুরাগীদের উপর। তাঁদেরই অসীম শিক্ষানুরাগ, কঠিন সাধনা ও শ্রমবহুল পরীক্ষণের ফল থেকে জন্ম নিয়েছে আজকের শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার আদর্শ। রুশোর এই প্রগতিশীল ভাবধারার নতুন আদর্শকে যে সব বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন তাঁদের কয়েকজনের সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করা হল।

বেসৃডো

রুশোর সমকালীন বেসডোর (Basedow) কথাই প্রথমে বলতে বলতে হয়। তিনি জার্মান সহর ডেসো'তে রুশোর আদর্শে প্রথম একটি বিদ্যালয় স্থাপন করলেন।

শিশুকে প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়াই হল এই প্রতিষ্ঠানটির প্রধান লক্ষ্য। খেলা, আত্ম-সক্রিয়তা, ইন্দ্রিয়ভিত্তিক শিক্ষা প্রভৃতি রুশোর মতবাদগুলি তিনি প্রয়োগ করলেন তাঁর শিক্ষাব্যবস্থায়। গতানুগতিক স্কুলের কৃত্রিম আড়ম্বর, নিয়মনিষ্ঠা ও কঠোর বিধিনিষেধকে তাঁর বিদ্যালয় থেকে নির্বাসিত করে দিলেন। ব্যক্তিগত অযোগ্যতার জন্য বেসডো'র বিদ্যালয় বেশীদিন চলেনি। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা পরবর্তী যুগের শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় যথেষ্ট অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।

শিশুকে সার্থক শিক্ষা দিতে হলে তাকে ভাল করে জানাটা আগে দরকার, এই নীতিটি রুশোর মতবাদের অন্যতম। এই নীতি থেকেই জন্ম নিয়েছে শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানভিত্তিক করার আন্দোলন। এই আন্দোলনের পুরোগামী রূপে আমরা তিনজনের নাম করতে পারি। পেষ্টালৎসী (Pestalozzi), হার্বার্ট (Herbart) ও ফ্রয়েবেল (Froebel)। এই তিনজন শিক্ষাবিদের চিন্তা, প্রয়াস ও প্রতিভার অবদানে শিক্ষার যে নবতম ভিত্তি গড়ে উঠেছিল তার উপর আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বর্তমান সৌধটি প্রতিষ্ঠিত।

পেষ্টালৎসী

পেষ্টালৎসী ছিলেন সুইজারল্যাণ্ডবাসী। তিনি রুশোর আদর্শে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাঁরই আদর্শের অনুসরণে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার একটি বিদ্যালয় খোলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে তিনি কেবলমাত্র লেখাপড়ার মধ্যে শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ না রেখে, সুতো কাটা, বোনা চাষবাস করা ইত্যাদি নানা রকম কার্যাবলীকেও শিক্ষার অঙ্গীভূত করেছিলেন। পেষ্টালৎসীর মতে শিশুর সামর্থ্য ও শক্তিগুলির স্বাভাবিক ও সুষম বিকাশ হল শিক্ষা। পেষ্টালৎসীই হলেন প্রথম শিক্ষক যিনি শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন। শিশুর অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলি আবিষ্কার করাই হল তাঁর মতে শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য। পদ্ধতির দিক দিয়ে মূর্ত বস্তুর মধ্যে দিয়ে সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়সংযোগে শিক্ষালাভ করাতেই পেষ্টালৎসী বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতে শৃঙ্খলা শাসনের মধ্যে দিয়ে আসবে না, আসবে সহানুভূতি ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিতর দিয়ে। পেষ্টালৎসীর এই মতবাদগুলির সব কটিই আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা-পরিকল্পনার অবিসংবাদিত মৌলিক নীতি বলে গৃহীত হয়েছে।

হার্বার্ট

পেষ্টালৎসীর পরে আসেন প্রসিদ্ধ জার্মান শিক্ষাবিদ্ জোয়ান হার্বার্ট। ইনিই প্রথম শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাকে সত্যকারের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ আত্মবীক্ষণের তত্ত্বটি (Theory of Apperception) বলতে গেলে শিক্ষার প্রথম মনোবৈজ্ঞানিক সংব্যাখ্যান। এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তিনি তার বহুল প্রচারিত শিক্ষাদানের পাঁচটি ধাপের (Five steps) উদ্ভাবন করেন। তাছাড়া হার্বার্টই প্রথম শিক্ষায় শিশুর আগ্রহের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। আগে শিক্ষকেরা মনে করতেন শিশুর আগ্রহ থাকুক না থাকুক উপযুক্ত প্রচেষ্টা করলে শিশুকে সবই শেখানো সম্ভব। হার্বার্টই প্রথম বললেন যে বিনা আগ্রহে কোন শিক্ষা সম্ভব নয়।

ফ্রয়েবেল

হার্বার্টের সময়েই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার আর একজন খ্যাতনামা প্রবর্তক জন্মান। তাঁর নাম ফ্রেডরিক ফ্রয়েবেল। ইনিও জার্মান। ফ্রয়েবেলই কিণ্ডার গার্টেন (Kindergarten) নামে প্রসিদ্ধ শিশুশিক্ষাব্যবস্থার উদ্ভাবন করেন। পেষ্টালৎসীর মত তিনিও কেবলমাত্র বইপড়া বা জ্ঞান অর্জনকে শিক্ষা বলে মনে করতেন না। তাঁর মতে প্রকৃত শিক্ষা হল আত্মবিকাশ এবং তা আসবে সক্রিয়তা ও সামাজিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে। সেইজন্য তাঁর কিণ্ডারগার্টেন প্রথায় খেলা, গান, সৃজনমূলক প্রচেষ্টা, যৌথ কর্ম ইত্যাদিই হল শিক্ষার প্রধান মাধ্যম।

পেষ্টালৎসী, হার্বার্ট ও ফ্রয়েবেল—শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার এই তিনজন সংগঠকের আদর্শ ও ভাবধারা দেখতে দেখতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ল। বহুস্থানে প্রগতিপন্থী শিক্ষাবিদেরা পরীক্ষণমূলকভাবে নানারূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন এবং সেগুলির মধ্যে দিয়ে শিক্ষার এই নবীন ভাবধারাকে বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা করলেন। যদিও শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার অন্তর্নিহিত মৌলিক ভাবসম্পদটি উনবিংশ শতাব্দীতেই পেষ্টালৎসী, হার্বার্ট ও ফ্রয়েবেল প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে প্রথম বাস্তবরূপ লাভ করে, তবু বিংশশতাব্দীর শিক্ষাবিদগণের হাতেই এই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার রূপটি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এমন কি শিশুকেন্দ্রিক কথাটিরও প্রচলনও হয় এই সময় থেকে।

ফ্রান্সিস্ পার্কার

আমেরিকার ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে প্রগতিশীল শিক্ষার (Progressive Education) আন্দোলন স্বরু হয়। এই আন্দোলনের জনক ছিলেন ফ্রান্সিস্ পার্কার (Francis Parker)। তার প্রবর্তিত বিদ্যালয়ে তিনি শিশুদের সৃজনমূলক প্রচেষ্টা, সামাজিক মেলামেশা এবং স্বাধীন ও স্বতঃপ্রবৃত্ত কাজের উপর বিশেষ করে জোর দিলেন। পুরোনো পন্থায় কৃত্রিম শৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রথা উঠিয়ে দিলেন এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশ যাতে সমাজধর্মী হয়ে ওঠে তার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিলেন। পদ্ধতির মধ্যেও পার্কার অনেক অভিনবত্ব আনলেন। হার্বার্টের শিক্ষাতত্ত্বের অনুসরণে তিনি অনুষঙ্গ পদ্ধতির সাহায্যে শেখানোর ব্যবস্থা করলেন। পার্কারের নতুন শিক্ষা-প্রণালীর পেছনে ফ্রয়েবেলের প্রভাবও যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যায়।

জন ডিউই

পার্কারের পর অমেরিকার শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার আন্দোলনের কর্ণধার হয়ে আসেন জন ডিউই। ডিউই ছিলেন পার্কারের বন্ধু এবং গুণমুগ্ধ সমর্থক। আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাকে সুপরিণত ও সুসংহত করার পেছনে জন ডিউইর অবদানই সবচেয়ে বেশী। শিক্ষাকে তাঁর পুরাতন সংকীর্ণ অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তিনি শিক্ষাকে জীবনযাপনের সঙ্গে সমার্থক করে তুললেন শিক্ষার পদ্ধতি, উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু এ সকল সম্বন্ধে বহুশতাব্দীর প্রচলিত পুরাতন ধারণাগুলিকে ডিউই তীক্ষ্ণ যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা ভুল বলে প্রমাণ করলেন এবং মনোবিজ্ঞান-সম্মত ও দর্শনভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করলেন। তিনি বিদ্যালয়, সমাজ শৃংখলা, আগ্রহ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক ইত্যাদি বিভিন্ন শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির নবতম সংব্যাখ্যান দিলেন এবং শিশুর ব্যক্তিসত্তার সর্বাঙ্গীন পূর্ণবিকাশ করতে সমর্থ এমন একটি সার্থক ও কার্যকরী শিক্ষার পরিকল্পনা সকলের সামনে তুলে ধরলেন।

ডিউইর এই নব শিক্ষা-পরিকল্পনা পৃথিবীর সব দেশেরই শিক্ষানেতারা স্বীকার করে নিলেন এবং আধুনিক শিশুকেন্দ্রকি শিক্ষার স্বরূপ নির্ধারণে তাঁরই সিদ্ধান্তগুলি প্রধানতম পথনির্দেশকরূপে বর্তমানে সর্বত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কিলপ্যাট্রিক

ডিউইর আদর্শে অনুপ্রাণিত একদল নবীন শিক্ষাবিদ্ ১৯১৯ সালে প্রগতিশীল শিক্ষা সংস্থা (Progressive Education Association) নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন এবং এঁদেরই প্রচেষ্টা ও উৎসাহে আমেরিকায় শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার দ্রুতপ্রসার লাভ করে। এই সময় আমেরিকার শিক্ষাজগতে উইলিয়াম কিলপ্যাট্রিক (William Kilpatrick) নামে আর একজন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ দেখা দেন। ইনি ডিউইর শিষ্য, অনুরাগী সমর্থক ও তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের ভাষ্যকারক। ডিউইর নবতম শিক্ষাতত্ত্বকে ইনিই জনসমাজে প্রচারিত করেন। ডিউইর শিক্ষাপদ্ধতির উপর ভিত্তি করে কিলপ্যাট্রিক প্রজেক্ট মেথড্ (Project Method) নামে একটি নতুন শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবন করেন, সক্রিয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত কিলপ্যাট্রিক এই পদ্ধতিটি আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রধানতম পদ্ধতি বলে গৃহীত হয়েছে।

মির্নস্, কোলম্যান ও কাউণ্টস্

আধুনিককালে আমেরিকায় শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা সম্পর্কে নতুন নতুন ভাবধারা ও পদ্ধতি নিয়ে বহু শিক্ষাবিদ গবেষণা চালাচ্ছেন। হাজেস মির্নসের (Hughes Mearns) সৃজনমূলক শিক্ষা (Creative education), মিসেস কোল্‌ম্যানের (Mrs. Colemn) সৃজনধর্মী সঙ্গীতের মাধ্যমে শিক্ষা, জর্জ কাউণ্টসের (George Counts) সামাজিক শিক্ষা ইত্যাদি নতুন ধরনের পরিকল্পনাগুলির নাম এ প্রসঙ্গে করা যায়। এই সামাজিক শিক্ষার আন্দোলন থেকেই আমেরিকায় আর একটি নতুন ধরনের স্কুলের সৃষ্টি হয়েছে। এগুলিকে কমিউনিটি স্কুল (Community School) বলা হয়। শিক্ষার মধ্যে দিয়ে সুসংবদ্ধ সমাজ-জীবনগঠনই এই বিদ্যালয়গুলির প্রধানতম লক্ষ্য।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার নব আদর্শের আন্দোলন-প্রবাহ কেবলমাত্র আমেরিকাতেই শিশুশিক্ষার প্রচলিত ব্যবস্থাকে বিধ্বস্ত করে সেখানে নতুন শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার সৌধ যে গড়ে তুলেছিল তা নয়, ইউরোপের অন্যান্য দেশের তটভূমিতেও তার স্রোতবেগ বেশ উল্লেখযোগ্য ভাবেই অনুভূত হয়েছিল এবং সে সব দেশেও নতুন পরিকল্পনা ও ভাবাদর্শে শিশুশিক্ষাকে পুনর্গঠিত করার চেষ্টা হয়েছিল।

মারিয়া মণ্টেসরী

ইটালীর শিক্ষাবিদ্ মারিয়া মণ্টেসরী (Maria Montessori) আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার একজন প্রধানতম সমর্থক এবং শিশুশিক্ষার এক নবতম পদ্ধতির উদ্ভাবক। তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থার মূলনীতি হল যে শিশুকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হবে, কোনরূপ বাধানিষেধ তার উপর থাকবে না এবং শিশুর শিক্ষা হবে স্বয়ংশিক্ষণ (auto-education) পদ্ধতিতে অর্থাৎ যা শিক্ষণীয় শিশু তা নিজের আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় শিখবে। মণ্টেসরীর শিক্ষণ পদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের অনুশীলন ও উৎকর্ষসাধন। মণ্টেসরী শিক্ষাপদ্ধতি বর্তমানে পৃথিবীর বহুদেশে সমাদরে গৃহীত হয়েছে।

জ্যান্ লিগথার্ট

হল্যাণ্ডের জ্যান লিগ্থার্ট (Jan Ligthort) হলেন ও দেশের শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার জনক। তাঁকে হল্যাণ্ডের পেষ্টালৎসী বলা হয়। তিনিও মণ্টেসরীর মত শিশুর অবাধ স্বাধীনতা ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতে নির্মুক্ত পরিবেশে সৃজনমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে শিশুরা শিক্ষালাভ করবে এবং শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে মিশিয়ে ফেলতে হবে।

ওভাইড্ ডেক্রলি

বেলজিয়ামের শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার কর্ণধার ছিলেন ওভাইড্ ডেক্রলি (Ovide Decroly)। ইনি আধুনিক মনস্তত্ত্বের উপর শিশুশিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং ব্যক্তিগত বৈষম্য, আগ্রহ, সক্রিয়তা, ও ব্যক্তিসত্তার সর্বাঙ্গীন বিকাশ প্রভৃতি প্রগতিশীল ভাবধারাকে কেন্দ্র করে তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিকে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষণ পদ্ধতি বর্তমানে ডেক্রলি পদ্ধতি (Dereoly Method) নামে পরিচিত। এই পদ্ধতিতে শিশুর প্রকৃত চাহিদার সঙ্গে শিক্ষাকে গ্রন্থিবদ্ধ করা হয় এবং তার বিভিন্ন বয়সের আগ্রহের বিশেষ বিশেষ কেন্দ্র অনুযায়ী তার পাঠক্রমটিকে গড়া হয়।

কুসিনে, অটো ও গারলিট

ফ্রান্সে শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার প্রচার করেন রোজার কুসিনে (Roger Cousinet) নামে একজন শিক্ষাবিদ্। ইনি শিশুদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান ও যৌথ কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেবার পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। জার্মানীতে বার্টহোল্ড অটো (Berthold Otto) এবং লুডউইগ গ্যার্লিটের (Ludwig Gurlitt) নাম কর যেতে পারে ও দেশের শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রবর্তকরূপে।

সেসিল রেডিড

ইংলণ্ডে শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার আদর্শে প্রথম স্কুল স্থাপন করেন সেসিল রেডিড (Cecil Reddie) অ্যাবট্‌স্‌হোম (Abbotsholme) নামে। রেডিড শিশু-শিক্ষার প্রচলিত প্রথার তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় স্বাধীনতা, দেহমনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ, সৃজনমূলক কার্যাদি প্রভৃতি ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য। দেখতে দেখতে রেডিডর অনুসরণে ইংলণ্ডে শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার বহু বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। তাদের মধ্যে ব্যাডলের (Badley) প্রতিষ্ঠিত বিডেল্‌সের (Bedales) নাম উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজী

ভারতে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার আন্দোলনের ঢেউ বেশ দেরীতে এসে পৌছলেও এখানে দুটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের শিক্ষাপরিকল্পনার আমরা নাম করতে পারি। প্রথম রবীন্দ্রনাথের "পাঠভবন", দ্বিতীয় গান্ধিজীর "বুনিয়াদি বিদ্যালয়"। নিজের ছাত্রজীবনে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্কীর্ণতা ও কৃত্রিমতা রবীন্দ্রনাথের কবি মনকে বিশেষভাবে বিচলিত করে। পরবর্তী জীবনে স্বাভাবিক ও সার্থক শিশুশিক্ষার এক নতুন আদর্শে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে "পাঠভবন" গড়ে তুললেন। তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য হল স্বাধীনতা, প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক, মুক্তস্থানে সূর্যালোকে শরীর সঞ্চালন, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সম্মেলন প্রভৃতির মাধ্যমে শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুষম বিকাশ। গান্ধিজীর প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনাটি ভারতীয় সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক-পরিবেশে অগণিত গ্রামবাসী ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে তৈরী করা। এই শিক্ষাব্যবস্থায় সৃজনমূলক শিল্প (craft) ও যৌথকর্মের মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষা

দেওয়া হয়। স্বাবলম্বন পারস্পরিক সহযোগিতা, শ্রমের মর্যাদাদান ইত্যাদি মানসিক গুণগুলির উন্নতির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় এই শিক্ষায়।

আধুনিক ভারতে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বেশ প্রচলন হয়েছে। ফ্রয়েবেলের কিণ্ডারগার্টেন প্রথা ও মণ্টেসরী পদ্ধতি শিশুশিক্ষার মাধ্যমরূপে সর্বত্রই বহুল প্রবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার মৌলিক নীতিগুলির মর্মার্থ বোঝার কোন চেষ্টা করা হয় না, নিছক বাহ্যিক আকার ও শুষ্ক পদ্ধতিটিকেই বড় করা হয়ে থাকে।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় বিভিন্ন ভাবধারা

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একটা জিনিষ পরিষ্কার দেখা যায় যে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার আন্দোলনটি একটি বিচ্ছিন্ন একক আন্দোলন-রূপে জন্মলাভ করেনি, বরং অনেকগুলি বিভিন্নধর্মী ভাবধারা একসঙ্গে মিলিত হয়ে এই আন্দোলনটির রূপ দিয়েছে। এই ভাবধারাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এর মধ্যে প্রধানত দর্শনমূলক, মনোবিজ্ঞানমূলক, জীবতত্ত্বমূলক ও সমাজ-তত্ত্বমূলক ভাবধারাগুলিই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার আন্দোলনকে পুষ্টিলাভে সাহায্য করেছে।

দর্শনমূলক চিন্তাধারা থেকে এসেছে শিশুর স্বাধীনতার ধারণাটি। শিশুর অন্তঃসত্তা অবিকশিত রূপে থাকে শিশুর মধ্যে এবং তাকে বিকশিত করাই হল শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য। তার পন্থা হল শিশুর অবাধ স্বাধীনতা, পদ্ধতি হল সক্রিয়তা। ফ্রয়েবেলের কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির মূলমর্মও এই যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। শিশু-শিক্ষায় সক্রিয়তা যে অপরিহার্য এই মতবাদের সপক্ষে জন ডিউই নতুন একটি দর্শনমূলক যুক্তি দিয়েছেন। তাঁর মতে সত্যকারের জ্ঞান আসে একমাত্র সক্রিয়তার মাধ্যমে, নিষ্ক্রিয়ভাবে বইপড়া বা বক্তৃতা শোনার মধ্যে দিয়ে নয়। অতএব শিশুর সমস্ত শিক্ষাই হবে সক্রিয়তার মাধ্যমে। স্বাধীনতার এই নতুন মতবাদ থেকে জন্ম নিয়েছে শৃঙ্খলার আধুনিক আদর্শটি। শৃঙ্খলা শিশুর উপর জোর করে আরোপিত হবে না, তা আসবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিশুর মধ্যে থেকে। এর নাম দেওয়া হয়েছে আভ্যন্তরীণ বা মুক্ত শৃঙ্খলা (Internal or free discipline) শিশু যখন কোন সৃজনমূলক কাজ করে তখন এই শৃঙ্খলা নিজে নিজেই দেখা দেয়। ব্যক্তিসত্তার সর্বাঙ্গীন বিকাশও আধুনিক দর্শনমূলক ভাবধারা থেকে এসেছে। প্রাচীন দার্শনিকগণ কেবলমাত্র মানসিক উন্নতির উপর

জোর দিতেন কিন্তু আধুনিক দার্শনিকগণ ব্যক্তির দৈহিক মানসিক সামাজিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিকগুলির সুষম বিকাশকে শিশুর শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য বলে মনে করেন।

আধুনিক প্রয়োগবাদী (Pragmatist) দার্শনিকদের মতবাদগুলি আধুনিক শিশুশিক্ষাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। এঁদের মতে শিশুর শিক্ষার কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। শিক্ষা হল শিশুর বৃদ্ধির সঙ্গে সমার্থক। শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া এবং অভিজ্ঞতার নিত্য পরিবর্তন পরিবর্ধনেরই মধ্যে দিয়ে এ শিক্ষা আসে। অতএব স্বাধীনতা, সক্রিয়তা, যৌথকর্ম, খেলাধূলা, সৃজনধর্মী প্রচেষ্টা, সামাজিক মেলামেশা ইত্যাদিই হবে পাঠক্রমের বিষয়বস্তু।

আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বৃদ্ধি ও প্রসারে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে সাম্প্রতিক কালের বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিশ্বপ্লাবী বিস্তার এবং সেইসঙ্গে মনোবিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতি। শিক্ষায় এতদিন একাধিপত্য করে এসেছে এমন বহু ধারণা আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের বহুমুখী গবেষণার অকাট্য সিদ্ধান্তে অচল হয়ে গেছে এবং শিশুশিক্ষাকে একেবারে নতুন করে মনোবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলার আন্দোলন দেখা দিয়েছে। শিশুর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা গুলিকে পূর্ণভাবে বিকাশ করতে হলে তাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে, শিক্ষাকে সত্যকারের কার্যকরী করতে হলে তাকে শিশুর নিজের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করতে হবে, শিশুর আগ্রহের দ্বারা শিক্ষার বিষয়বস্তুর প্রকৃতি নির্ধারিত করতে হবে এবং শিশুর শিখনের পদ্ধতি সম্পূর্ণ মনোবিজ্ঞানসম্মত হবে। এই নতুন ভাবধারাগুলি হল আধুনিক শিশু-শিক্ষার উন্নতিতে মনোবিজ্ঞানের অবদান। প্রাচীনকালের মানসিক শৃংখলার তত্ত্বটি গবেষণার ফলে বাতিল বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্ধারিত হবে শিশুর চাহিদা, আগ্রহ ও ক্ষমতার দ্বারা। মানসিক শক্তি, প্রক্ষোভ, প্রবৃত্তি, ইত্যাদি সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ায় ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতিটির গুরুত্ব উপলব্ধি করা গেছে এবং তার ফলে পাঠক্রমের মধ্যে বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা আনাটা অপরিহার্য বলে সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছে। শাস্তি ও পুরস্কারের প্রথা নিতান্ত ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং যাতে শিক্ষায় শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ আসতে পারে তার চেষ্টা করাই শিক্ষকের প্রধানতম কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যেও মনোবিজ্ঞান প্রচুর পরিবর্তন এনেছে। মনোযোগ দেওয়া, ভুলে যাওয়া, চিন্তন, শিখন, মুখস্থ করা প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে নানা আধুনিক তথ্য হস্তগত হওয়ায়

প্রাচীন শিক্ষণ পদ্ধতিকে বাতিল করে আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি সর্বত্র অনুসৃত হচ্ছে।

এ যুগের শিশুশিক্ষার স্বরূপ নিয়ন্ত্রণে ফ্রয়েড প্রবর্তিত মনঃসমীক্ষণ নামক মনোবিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। শিশুর মানসিক চাহিদা, বিভিন্ন ভাবধারার সংঘাত, কামনার অবদমন, প্রক্ষোভ, কমপ্লেক্স মানসিক তৃপ্তিদায়ক নানারকম আচরণ, শিশু-যৌনতা ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা প্রয়োজনীয় তথ্য আবিষ্কৃত হওয়াতে শিশুশিক্ষার পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। বিশেষ করে শিশুঘটিত যে কোন সমস্যার সমাধান এই নবলব্ধ তত্ত্বগুলির প্রয়োগের মাধ্যমেই করা হয়ে থাকে।

শিশুশিক্ষার নীতিগঠনে আধুনিক জীবতত্ত্বমূলক চিন্তাধারার যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। স্পেন্সার, ডারউইন প্রভৃতি বিবর্তনবাদীদের গবেষণার ফলে শৈশব ও শিশুর আচরণের একটা নতুন সংব্যাখ্যান পাওয়া গেছে। ক্রমবিকাশমান শিশু তার বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন আচরণের মধ্যে দিয়ে তার পূর্বপুরুষদের প্রধান প্রধান আচরণগুলিকেই অনুসরণ করে। এই তত্ত্বটির নাম কৃষ্টি-যুগের তত্ত্ব (Cultural Epoch Theory)। অতএব জাতিগতভাবে মানবের প্রধান প্রধান অভিজ্ঞতাগুলিই হবে শিশুর শিক্ষার বিষয়বস্তু। খেলাধূলা, মাটি, বালি, খড়পাতা দিয়ে বাড়ী তৈরী করা, কাঠের জিনিস তৈরী করা, শিল্পকাজ করা, সামাজিক সংগঠন গড়তে শেখা ইত্যাদি যে সব অতি প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাগুলি সুদীর্ঘ বিবর্তনের পথে মানবজাতির জীবনে একের পর এক দেখা দিয়েছিল সেগুলিই হবে শিশুশিক্ষার বিষয়বস্তু।

জীবতত্ত্বমূলক চিন্তাধারা থেকে শিশুশিক্ষার আর একটি মূল্যবান তত্ত্বের জন্ম হয়েছে। তার নাম বিলম্বিত শৈশবের তত্ত্ব (Theory of delayed infancy)। এ তত্ত্ব অনুযায়ী যে প্রাণীর শৈশব যত দীর্ঘ তার শিক্ষাও তত দীর্ঘ ও বৈচিত্র্যময় হবে। ফলে সে প্রাণী স্বল্পস্থায়ী-শৈশবসম্পন্ন প্রাণীর চেয়ে অনেক বেশী উন্নত ও জীবনসংগ্রামে অধিকতর পটু হয়ে ওঠে। এই জন্যই অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানবশিশুর শৈশব অনেক বেশী দীর্ঘ হওয়াতে সে আজ অধিকতর উন্নত ও বৈচিত্র্যময় শিক্ষার অধিকারী এবং পরিবেশের বিভিন্ন শক্তিকে স্ববশে এনে সুনিশ্চিত ও সমৃদ্ধতর জীবনযাপনে সমর্থ।

সমাজতত্ত্বমূলক চিন্তাধারা শিশুর শিক্ষাকে সমাজের চাহিদার সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ করে বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে যে কৃত্রিম ব্যবধান ছিল তা দূর করার চেষ্টা করেছে। শিশুর সামাজিক দিকটিকে পূর্ণভাবে বিকশিত করা, তাকে সমাজের

বিভিন্ন কাজ ও দায়িত্বের সঙ্গে পরিচিত করা, তাকে আধুনিক গণতন্ত্রসম্মত আদর্শে সুনাগরিকরূপে গঠন করা ইত্যাদি মতবাদগুলি আধুনিক শিক্ষার সমাজতত্ত্বমূলক চিন্তাধারার দান। এই শ্রেণীর চিন্তাবিদদের মতে বিদ্যালয়কে একটি বাইরের সমাজের প্রতিচ্ছবি করে তুলতে হবে এবং দেখতে হবে যে শিশু যে পরিবেশে মানুষ হবে সেটি যেন সম্পূর্ণভাবে সমাজধর্মী হয়। তাহলেই শিশুর কাজে স্বাভাবিক আগ্রহ ও উৎসাহ আসবে, আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা দেখা দেবে এবং শিশুর শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠবে।

গতানুগতিক ও আধুনিক শিক্ষার মধ্যে তুলনা

আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা নানা দিক দিয়ে প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা থেকে প্রচুর পরিমাণে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থাতে সব দিক দিয়ে শিক্ষকের প্রাধান্য থাকায় তাকে শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষা বলা যেতে পারে। নীচে উভয় প্রকার শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দেওয়া হল।

গতানুগতিক বা শিক্ষক-কেন্দ্রিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

(১) গতানুগতিক শিক্ষায় নিছক জ্ঞান-অর্জনের উপর জোর দেওয়া হত। প্রাচীন শিক্ষাবিদেরা শিক্ষা বলতে বুঝতেন কেবলমাত্র মানসিক উৎকর্ষসাধন এবং সেইজন্য শিশুর সমস্ত শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল কতকগুলি তথ্য নির্ভুলভাবে আয়ত্ত করার মধ্যে। অধিকাংশক্ষেত্রেই পদ্ধতি ছিল মুখস্ত করা এবং বারবার চর্চা, পুনরাবৃত্তি ও ঘন ঘন পরীক্ষাগ্রহণ ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলি শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠে ছিল। এককথায় শিক্ষা ছিল অপূর্ণ, যান্ত্রিক ও নিরানন্দময়।

(২) গতানুগতিক শিক্ষায় শিশুর ব্যক্তিসত্তার অন্যান্য দিকগুলিকে সম্পূর্ণ অবহেলা করা হত এবং ফলে তার দৈহিক, প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক দিকগুলি অপরিণত থেকে যেত। এককথায় শিশুর ব্যক্তিসত্তার সর্বাঙ্গীন ও সুষম বিকাশ হত না।

(৩) শিক্ষার মধ্যে সক্রিয়তার কোন স্থান ছিল না। বই পড়া, লেখা, শিক্ষকদের পঠন শোনা ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মধ্যেই সম্পূর্ণ শিক্ষা প্রক্রিয়াটিই সীমাবদ্ধ থাকত। শিশুর খেলাধুলা বা সক্রিয়তাকে শিক্ষার বিরোধী বলে মনে করা হত এবং

ক্লাসে শান্ত, শিষ্ট ও চুপচাপ থাকাটাকেই শিক্ষার্থীর পক্ষে আদর্শ আচরণ বলে বর্ণনা করা হত।

(৪) গতানুগতিক শিক্ষায় শিশুর স্বাধীনতা বলে কোন বস্তুই ছিল না। কি পড়তে হবে, কখন পড়তে হবে, কি ভাবে পড়তে হবে সবই শিক্ষক আগে থেকে নির্ধারিত করে দিতেন এবং শিশুকে সে নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হত। তার নিজস্ব মতামত, চাহিদা, পছন্দ অপছন্দর কোনরূপ মূল্য দেওয়া হত না। এর ফলে একদিকে যেমন শিশুর প্রাণশক্তির স্বাভাবিক অভিব্যক্তি খর্ব হয়ে যেত তেমনই তার সৃজনীমূলক কর্মক্ষমতা আত্মপ্রকাশের অভাব নষ্ট হয়ে যেত।

(৫) শিশুর নিজস্ব চাহিদার প্রতি একেবারেই দৃষ্টি দেওয়া হত না। শিক্ষার লক্ষ্য, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি সবই নিয়ন্ত্রিত হত শিক্ষক পিতামাতা প্রভৃতি বয়স্কদের চাহিদার দ্বারা। ফলে শিক্ষার প্রতি শিশু কোন স্বাভাবিক আকর্ষণ অনুভব করত না।

(৬) শিশুর চাহিদার সঙ্গে শিক্ষার সাক্ষাৎ যোগাযোগ না থাকার ফলে শিশুর বর্তমান জীবনের সঙ্গেও শিক্ষা সম্পর্ক হারিয়েছিল। বয়স্কদের চাহিদার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় শিক্ষা শিশুর প্রকৃত জীবন অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নিত না, এবং ফলে শিশুর কাছে শিক্ষা হয়ে দাঁড়াত অস্পষ্ট, সুদূর, অপরিচিত এবং অর্থহীন কতকগুলি অভিজ্ঞতার সমষ্টি মাত্র।

(৭) শিক্ষা কৃত্রিম ও যান্ত্রিক হওয়ায় শৃঙ্খলা অন্তর্জাত হত না। ফলে বহির্জাত শৃঙ্খলার সাহায্য নিতে হত এবং শাস্তি-পুরস্কার নিন্দা-প্রশংসা ইত্যাদি কৃত্রিম প্রক্রিয়ার সাহায্যে শৃংখলা বজায় রাখতে হত।

(৮) এই শিক্ষায় শিক্ষকই প্রধানতম অংশ গ্রহণ করতেন। সেখানে তিনি ছিলেন সক্রিয়তার প্রতিমূর্তি। তাঁর সমুন্নত ব্যক্তিত্বের ছায়াতে শিক্ষার্থীরা বর্ধিত হত। তাঁর কর্তৃত্ব, পাণ্ডিত্য, বাচন, আচার, ব্যবহার প্রকৃতি শিক্ষাকে পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করত। শিক্ষার্থীরা অন্ধভাবে তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করত, তাদের নিজস্ব সক্রিয়তা বা অভিব্যক্তির কোনও স্থান ছিল না। শিক্ষকই পাঠ্য বিষয়-বস্তুটির সংগঠন ও উপস্থাপন করতেন, তাদের প্রশ্ন করে প্রত্যাশিত উত্তর আদায় করতেন, পুনরাবৃত্তি করাতেন, পরীক্ষা নিতেন এবং ভাল মন্দ নম্বর দিতেন। শিক্ষার্থীরা কেবল যন্ত্রের মত তাঁকে অনুসরণ করেই যেত।

(৯) শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্কটি ছিল শাসক-শাসিতের সম্পর্ক। শিক্ষকের কথা ছিল আদেশের নামান্তর এবং অলঙ্ঘনীয়। শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীর মনোভাবে শ্রদ্ধার চেয়ে বেশী ছিল ভীতি।

(১০) বাধ্যতা, আনুগত্য, অন্ধ অনুসরণ ইত্যাদি ছিল শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে আদর্শ গুণাবলী। নিয়ম ছিল যে শিক্ষকের নির্দেশ ও উপদেশকে বিনা বিচারে মেনে নিতে হবে, ব্যক্তিগত মত প্রকাশ বা বিচারের কোন অধিকার কারও ছিল না।

(১১) গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর সামাজিক বিকাশের দিকটিকে একেবারেই অবহেলা করা হত। স্কুলের আভ্যন্তরীণ পরিবেশটিও ছিল পুরোপুরি অসমাজধর্মী। ফলে বাইরের বিরাট সমাজ এবং তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত থেকে শিশু বড় হয়ে উঠত এবং যখন পরিণতবয়সে তাকে সমাজে প্রবেশ করতে হত তখন দেখা যেত যে তার শিক্ষা-দীক্ষা, আচরণ মনোভাব সবই সে সমাজের পক্ষে অনুপযোগী।

(১২) গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার আর একটি প্রধান ত্রুটি ছিল যে এতে যে সব পদ্ধতির অনুসরণ করা হত সেগুলির অধিকাংশই ছিল মনোবিজ্ঞান-বিরোধী। সে সময় মনোবিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি না হওয়ায় শিক্ষকেরা তাদের অনুমান, কল্পনা, ও ধারণার উপর নির্ভর করে শিক্ষণের নানা পদ্ধতির উদ্ভাবন করতেন। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানের গবেষণার ফলে সেগুলি আজ ভুল, অকেজো এমন কি বহুক্ষেত্রে ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়েছে।

(১৩) ব্যক্তিগত বিশেষ শক্তি ও ক্ষমতার প্রতি কোনরূপ দৃষ্টি দেওয়া হত না। একটি পূর্বনির্ধারিত সাধারণ মান অনুযায়ী সকলকে একই ধরনের কাজ করতে বাধ্য করা হত। ফলে বিভিন্ন শিশুর বিভিন্ন কর্মক্ষমতা ও সৃজনী-প্রতিভাকে অবহেলা করা হত এবং তাদের মধ্যে যারা বিশেষধর্মী শক্তি নিয়ে জন্মেছে তাদের সে শক্তির কোনরূপ বিকাশ হত না।

(১৪) গতানুগতিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষার্থীর নিজের বাড়ী এবং পরিবারের কোন সম্পর্ক ছিল না। পিতামাতাদেরও শিশুর শিক্ষার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা ছিল না। শিক্ষা ছিল বিদ্যালয়ের একচেটিয়া, শিক্ষকদের কুক্ষিগত। ফলে গৃহের অভিজ্ঞতা ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যে বিরাট এক কৃত্রিম ব্যবধান রয়ে যেত।

(১৫) শিক্ষাকে প্রধানত বয়স্কজীবনের জন্য প্রস্তুতি বলে মনে করা হত। কিন্তু শিশুর কাছে শিক্ষার এ ধরনের লক্ষ্য ছিল অবাস্তব, অস্পষ্ট ও সুদূর এবং তার বর্তমান জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সে শিক্ষার কোন যোগাযোগ থাকত না।

প্রগতিশীল বা শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

(১) আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল স্বাধীনতা। বহু বৎসরের কঠোর বিধিনিষেধের শৃংখল থেকে মুক্তি পেয়ে শিশু আজ নিজের ইচ্ছা ও পছন্দমত কাজকর্ম করার স্বাধীনতা পেয়েছে। তার উপর কোনরূপ বাইরের শক্তির নিয়ন্ত্রণ বা উৎপীড়ন আজ আর নেই এবং তার স্বাধীন কাজকর্মে কোন রূপ বাধার সৃষ্টি করা হয় না। প্রগতিশীল বিদ্যালয়গুলিতে দেখা যায় যে ছেলে-মেয়েরা ইচ্ছামত চলাফেরা, পছন্দমত দলগঠন করা, পাঠ্যবস্তু নির্ধারণ, নানাবিধ বস্তু নিয়ে নাড়াচাড়া করা, স্কুলের শাসনতন্ত্রে অংশগ্রহণ করা, সমবায় সমিতি গঠন করা, ব্যাঙ্ক, পোষ্ট অফিস চালান ইত্যাদি নানারূপ কাজ করার স্বাধীনতা ভোগ করে।

(২) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল সক্রিয়তা। প্রাচীনপন্থী বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা ছিল পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় ও পুঁথি-ভিত্তিক। সেখানে সক্রিয়তার কোনরূপ স্থান ছিল না। বরং সেখানে সক্রিয়তাকে তাঁরা শিক্ষার বিরোধী বলে মনে করতেন। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাবিদেরা নানা কারণে সক্রিয়তাকে শিক্ষার অপরিহার্য মাধ্যম বলে মনে করেন। জন ডিউই'র মতে সক্রিয়তা ছাড়া সত্যকারের কার্যকরী জ্ঞান আহরণ করাই যায় না। সে জন্যই 'কাজের মধ্য দিয়ে শেখাই' হয়ে দাঁড়িয়েছে আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার মূলনীতি। কিলপ্যাট্রিকের প্রজেক্ট মেথড জন্মলাভ করেছে এই নীতি থেকে। এই নীতি থেকে জন্মেছে কর্মভিত্তিক শিক্ষার (Activity-centerd education) প্রচলন। গান্ধীজীর প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা হল শিল্প-কেন্দ্রিক (Craft centered) শিক্ষা এবং এটি কর্মভিত্তিক শিক্ষারই প্রকারভেদ। আজকের শিক্ষার্থী নিষ্ক্রিয়ভাবে কেবলমাত্র কানে শুনে বা বই পড়ে শেখে না, সক্রিয়ভাবে বাস্তব পরিস্থিতিতে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে সে শিক্ষালাভ করে। আধুনিক বিদ্যালয়ে জ্ঞান অর্জনকে শিক্ষার লক্ষ্য বলে মনে করা হয় না, পরিবেশের সঙ্গে সন্তোষজনক সঙ্গতিবিধানের একটি প্রয়োজনীয় উপকরণরূপে জ্ঞান বা বিদ্যাকে গণ্য করা হয়। পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিবিধানের জন্য যে সব অভিজ্ঞতা

একান্ত প্রয়োজনীয় সেগুলিই প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার বিষয়বস্তু। অর্থাৎ এককথায় সক্রিয়তা ছাড়া প্রকৃত শিক্ষা সম্ভব নয়।

(৩) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় এইজন্য বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই সর্বপ্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে। শিশু যে সমাজ থেকে এসেছে এবং যে সমাজে সে বড় হয়ে নিজের স্থান করে নেবে সেই সমাজের বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতাগুলি শিশুর পাঠক্রমের প্রধান বিষয়বস্তু হবে। শিশুকে সমাজের উপযোগী করে তোলা—এক কথায় যার নাম দেওয়া হয়েছে সামাজিকীকরণ (Socialisation)—হল আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার একটি প্রধান লক্ষ্য। এইজন্যই আধুনিক বিদ্যালয়কে সমাজের প্রতিচ্ছবি বলে বর্ণনা করা হয়। স্কুলের পরিবেশটি পূর্ণভাবে সমাজধর্মী করে তোলা হয় যাতে শিশুরা সেখানে বাস্তবজীবনের বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতাগুলির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করে। স্কুল ব্যাঙ্ক, স্কুলের ডাকঘর, স্কুলের সমবায় সমিতি, স্কুলের সংবাদপত্র, ক্লাব, খেলার দল, কৃষ্টিমূলক সংঘ, স্কুল পরিচালনায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিশুদের সমাজের উপযোগী করে তোলা হয়।

(৪) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে এখানে শৃংখলা পুরোপুরি অন্তর্জাত, বহির্জাত নয়। শাসন, নিন্দা, প্রশংসা, পুরস্কার, ভীতিপ্রদর্শন ইত্যাদি কৃত্রিম পন্থার সাহায্যে এখানে শৃংখলা রাখা হয় না। শৃংখলা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিশুদের স্বাধীন আচরণের মধ্যে দিয়ে দেখা দেয়।

(৫) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় সৃজনীমূলক প্রচেষ্টাকে সর্বপ্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে। বাঁধাধরা সুনির্দিষ্ট কর্মধারার মধ্যে শিশুর প্রচেষ্টাকে সীমাবদ্ধ না রেখে যাতে বিভিন্ন কর্মপ্রয়াসের মধ্যে দিয়ে তার আভ্যন্তরীণ সৃজনীস্পৃহা অভিব্যক্ত হতে পারে তার জন্য যথেষ্ট সুযোগ ও উপকরণের আয়োজন শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। কাঠের জিনিস তৈরী করা, ছবি আঁকা, মাটি বা প্ল্যাষ্টিসিন দিয়ে জিনিস গড়া, কার্ডবোর্ড দিয়ে ঘরবাড়ী তৈরী করা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে শিশুর সৃষ্টিপ্রচেষ্টাকে মূর্ত হবার সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে।

(৬) গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর মানসিক দিকটির উৎকর্ষ-সাধনের উপরই জোর দেওয়া হত, তার ব্যক্তিসত্তার অন্যান্য দিকগুলোকে অবহেলা করা হত। কিন্তু শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর ব্যক্তিসত্তার যতগুলি দিক আছে সব কটির সুষম বিকাশের প্রতি সমান দৃষ্টি দেওয়া হয়ে থাকে। এক কথায়

অপরিণত, অবিকশিত ও অসম্পূর্ণ মানবশিশু যাতে সম্পূর্ণ শিশু (whole child) রূপে গড়ে উঠতে পারে সেইটিই হল শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য।

(৭) আধুনিক শিশুশিক্ষা একদিকে যেমন সুচিন্তিত দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত তেমনই অপরদিকে সাম্প্রতিক গবেষণালব্ধ বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানের তথ্যের সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে পরিকল্পিত। উদাহরণস্বরূপ আধুনিক মনোবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি। এই নীতির অনুসরণে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাকে এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজের নিজের সামর্থ্য ও সম্ভাবনাকে পূর্ণভাবে বিকাশিত করার সুযোগ পেয়ে থাকে। তাছাড়া শিক্ষণ (learning), পরিণমন (maturation), মনে রাখা (retention) ভুলে যাওয়া (forgetting), প্রবৃত্তি (instinct), প্রক্ষোভ (emotion) প্রভৃতি বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে নবলব্ধ মনোবৈজ্ঞানিক তথ্যের প্রচুর সাহায্য নেওয়া হয়েছে আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায়।

(৮) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় অনুসৃত পদ্ধতিগুলিও সম্পূর্ণ মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিক। এখানে শিশুর মানসিক প্রক্রিয়াগুলির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে শিক্ষণ-পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে হয়ে থাকে।

(৯) শিশুকেন্দ্রিক-শিক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক সহজ, স্বচ্ছন্দ ও প্রীতিময়। শিক্ষক আজ আর শিক্ষারাজ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিপতি নন। তিনি এখন কেবল-মাত্র শিক্ষার্থীর সহকর্মী, সহায়ক, হিতৈষী পথ-প্রদর্শক মাত্র।

(১০) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা আজ সম্পূর্ণভাবে শিশুর তিনটি বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত যথা, চাহিদা (need), আগ্রহ (interest) ও সামর্থ্য (ability)। গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিশু ছিল অবহেলিত, শিক্ষকই ছিলেন সর্বময় অধিশাসক। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর স্থান পুরোভাগে। এই নতুন শিক্ষা পরিকল্পনার প্রাণ হল শিশুর চাহিদা, তার অবয়ব হল শিশুর সক্রিয় অভিজ্ঞতা এবং শিশুর আগ্রহ ও সামর্থ্য হল তার সংগঠক শক্তি।

(১১) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাবকে প্রশ্রয় না দিয়ে সহযোগিতার মনোভাবকে উৎসাহ দেওয়া হয়ে থাকে। প্রতিযোগিতার মনোভাবের মধ্যে শিশুরা বেড়ে উঠলে হিংসা, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা, নীচতা ইত্যাদি অবাঞ্ছিত ও অসামাজিক বৃত্তিগুলি সবল হয়ে ওঠে। সহযোগিতার মনোভাব তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব, ভালবাসা ও সঙ্ঘবদ্ধতা এনে থাকে।

(১২) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় বিদ্যালয় এবং শিশুর পরিবারের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে। শিশুর কোন সমস্যা সমাধানের সময় বা তার সম্পর্কে কোন বিশেষ সিদ্ধান্ত নেবার সময় তার পিতামাতার অভিমত ও পরামর্শ গ্রহণ করাটা আজকাল সব প্রগতিশীল বিদ্যালয়ের নিয়ম।

(১৩) পূর্বে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি বলে মনে করা হত। এর মূলে ছিল একটা ভুল ধারণা যে শিশু ও বয়স্কের মধ্যে কেবল আকৃতির পার্থক্য ছাড়া অন্য কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু এখন শিশুকে শিশু বলেই মনে করা হয়। তার অভিজ্ঞতা, চাহিদা, বিকাশোন্মুখতা ইত্যাদি সমস্তই বয়স্কদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সেজন্য বর্তমানে শিক্ষাকে জীবনধারণের সঙ্গে অভিন্ন বলে বর্ণনা করা হয়। অর্থাৎ শিক্ষা জীবনের জন্য প্রস্তুতি নয়, শিক্ষাই জীবন।

প্রশ্নাবলী

1. Write an essay on—Child-centric education. (B. T. 1957)

Ans. (পৃঃ ১৯৪—পৃঃ ২০৩).

2. Explain what is meant by the saying that modern education is child-centred. (B. T. 1958)

Ans. (পৃঃ ১৯৪—২০৩)

3. Explain what is meant by 'child-centred education' and consider the place of the teacher in modern education. (B. A. 1958)

Ans. (পৃঃ ১৯৪—পৃঃ ২০৩+পৃঃ ১৪৯—১৫১)

4. Compare the features of the modern progressive education with those of the traditional education.

Ans. (পৃঃ ১৯৭—পৃঃ ২০৩)

5. What are the characteristic features that mark off New Teaching from the Old? (B. A. 1960)

Ans. (পৃঃ ১৯৭—পৃঃ ২০৩)

6. What do you understand by child-centred education? Discuss in this connection the place of teacher in modern education. (B. A. 1961)

Ans. (পৃঃ ১৯৪—পৃঃ ২০৩+পৃঃ ১৪৯—পৃঃ ১৫১)

সতের

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী (Co-curricular Activities)

অতি প্রাচীনকাল থেকেই শিক্ষাব্যবস্থায় মানসিক প্রক্রিয়ার চর্চাকেই প্রধান স্থান দিয়ে আসা হয়েছে। সকল প্রকার দৈহিক চর্চা বা শারীরিক সক্রিয়তাকে শিক্ষার পরিবেশ থেকে সযত্নে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই মনোভাবের জন্য মূলত দায়ী ছিল দেহ ও মন সম্বন্ধে প্রচলিত দার্শনিক সংব্যাখ্যান।

প্লেটো ও অ্যারিষ্টলের দর্শন অনুযায়ী যা কিছু জাগতিক তাই অবাস্তব। একমাত্র ভাব বা চিন্তাই বাস্তবতার দাবী করতে পারে। ভারতীয় দর্শনেও প্রায় একই ধারণার প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই। চিন্তা বা অনুভূতিই একমাত্র সত্য এবং পার্থিব অস্তিত্ব মাত্রেই নশ্বর। এই ধরনের দার্শনিক সংব্যাখ্যান থেকে জন্মাল মনের সম্বন্ধে একটা উৎকর্ষবোধ এবং দেহের সম্বন্ধে অনুৎকর্ষের ধারণা। শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রচুর প্রভাব দেখা গেল। বিদ্যায়তনে চিন্তন, মনন, বিচারকরণ প্রভৃতি মানসিক শক্তির চর্চার উপর গুরুত্ব দেওয়া হল এবং সকল প্রকার দৈহিক কার্যকলাপকে শিক্ষায়তনের পরিপার্শ্ব থেকে একেবারে নির্বাসিত করা হল।

দৈহিক সঞ্চালন সম্পর্কে এই নিম্নধারণার জন্যই খেলাধূলাকে অত্যন্ত হেয়জ্ঞান করা হত। খেলাকে অযথা সময়ের অপব্যবহার, নিছক চাপল্যের অভিব্যক্তি ও কর্মনাশা প্রক্রিয়া বলেই শিক্ষাবিদেরা মনে করতেন। অনেক ইউরোপীয় ধর্মযাজকগণ ত খেলাকে শয়তানের প্রভাব বলে মনে করতেন। নৃত্যগীত, অভিনয়,সাংস্কৃতিক সম্মেলন ইত্যাদিকেও নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় ও মূল্যহীন বলে মনে করা হত।

শিক্ষার মৌলিক তত্ত্বগুলির সংস্কার ও ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাবিদেরা এই ভ্রমাত্মক শিক্ষানীতির অপকারিতা উপলব্ধি করতে সুরু করলেন। কেবলমাত্র মনের বিকাশকেই শিক্ষা বলে না, শিক্ষা ব্যক্তির জীবনসত্তার সমস্ত দিকগুলিকেই ঘনিষ্ঠভাবে স্পর্শ করে। অতএব সার্থক শিক্ষার পাঠক্রমে কেবলমাত্র মনের শক্তিগুলিরই উৎকর্ষসাধনের ব্যবস্থা থাকবে না, থাকবে ব্যক্তির দেহ, অনুভূতি, সামাজিক আচরণ প্রভৃতি সমস্ত দিকগুলির সমানভাবে উন্নতিসাধন করার আয়োজন। এই যুক্তির প্রভাবে বিদ্যালয়ের কার্যাবলীর মধ্যে লিখন, পঠন ছাড়াও খেলাধূলা, সভা-সমিতি, অভিনয়, ভ্রমণ ইত্যাদি নানা কাজ ধীরে

ধীরে স্থান পেতে সুরু করল। এগুলি প্রথম প্রথম বিদ্যালয়ের নির্ধারিত পাঠক্রমের বহির্ভূক্ত ছিল বলে এগুলিকে বহিপাঠক্রমিক (extra-curricular) কার্যাবলী নাম দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল শিক্ষাবিদেরা ততই এই কাজগুলির মূল্য ও সার্থকতা উপলব্ধি করতে সুরু করলেন। এগুলিকে তাঁরা আর বহিপাঠক্রমিক নাম দিয়ে অপাঙক্তেয় করে রাখার পক্ষপাতী রইলেন না। সেইজন্য এই কাজগুলির এবার নাম দেওয়া হল সহ-পাঠক্রমিক (co-curricular) কার্যাবলী। এর অর্থ হল যে এই কাজগুলিকে আর বিদ্যালয়-অনুমোদিত পাঠক্রমের বাহিরের কোন বস্তু বলে মনে করা হবে না। এগুলিকে অন্যান্য পাঠক্রমের সমগোত্রীয় অতিপ্রয়োজনীয় পাঠ্যবস্তু বলেই মনে করা হবে। এককথায় বই পড়া, লেখা, অঙ্ক করা ইত্যাদি কাজগুলি সম্পন্ন করা যেমন শিক্ষার্থীর পক্ষে অপরিহার্য, তেমনি খেলাধূলা, সভা-সমিতি, ভ্রমণ ইত্যাদি কাজ-গুলিও সম্পন্ন করা তার পক্ষে সমানভাবেই অবশ্য কর্তব্য। এই নতুন নাম দেওয়াতে এই কাজগুলিকে বিদ্যালয়ের প্রচলিত পাঠক্রমের সঙ্গে সমান মর্যাদা দেওয়া হল। আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাবিদেরা এই নতুন নামকরণেও সন্তুষ্ট নন। তাঁরা বলেন যে একাজগুলিকে সহপাঠক্রমিক বলাতে এগুলির মূল্য ও গুরুত্ব স্বীকার করা হল বটে কিন্তু পাঠক্রমের সমগোত্রীয় বলায় এগুলিকে যথার্থ পাঠক্রমের অঙ্গ বলে বর্ণনা করা হল না। অতএব তাঁরা এগুলিকে বিদ্যালয়ের সাধারণ পাঠক্রমেরই অন্তর্ভুক্ত বলেই ধরে নিয়ে থাকেন। তবে প্রচলিত শ্রেণীর মধ্যে অনুষ্ঠিত পাঠক্রমের সঙ্গে শ্রেণীর বাইরে অনুষ্ঠিত এই কাজগুলির পার্থক্য বজায় রাখার জন্য তাঁরা এগুলিকে বহিশ্রেণীগত (extra-class) কাজ বলে অভিহিত করে থাকেন।

সহপাঠক্রমিক কাজের প্রকারভেদ

বর্তমানে সহপাঠক্রমিক কাজগুলি সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে এত বিস্তার লাভ করেছে যে তাদের পূর্ণাঙ্গ একটা তালিকা দেওয়া এখন শক্ত, তবে আধুনিক স্কুল কলেজে যে কাজগুলি সাধারণত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হল।

১। খেলা-ধূলা

ক) মুক্ত পরিবেশে খেলাধূলা, যেমন ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, ব্যাড্‌মিণ্টন ইত্যাদি এবং অন্তর্গৃহ খেলাধূলা, যেমন ক্যারাম, টেবিল বিলিয়ার্ড ইত্যাদি।

(খ) দৌড়-ঝাপ, বক্সিং, কুস্তি, সাইকেল রেস, লাঠিখেলা প্রভৃতি ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা।

২। সভা ও সম্মেলন

সাহিত্য-সভা, সামাজিক সম্মেলন, বিতর্কসভা, শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি ;

৩। নৃত্য-গীত অভিনয়

নাট্যাভিনয়, নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান, আবৃত্তি, বর্ষামঙ্গল, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি কৃষ্টিমূলক উৎসবানুষ্ঠান।

৪। যৌথ-উদ্যোগ

শিক্ষামূলক এবং কৃষ্টিমূলক প্রদর্শনী, মেলা ইত্যাদির আয়োজন, উদ্যান-গঠন, সৃজনমূলক কর্মপ্রচেষ্টা, প্রজেক্ট ইত্যাদি।

৫। সমাজ-কল্যাণকর কার্যাবলী

জনস্বাস্থ্যের রক্ষণ ও উন্নতির প্রচেষ্টা, জনশিক্ষা-প্রসারের উদ্যোগ, কুসংস্কার-দূরীকরণ, গ্রামোন্নয়নে অংশগ্রহণ ইত্যাদি।

৬। বিদ্যালয় পরিশাসন

বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য নির্বাহ, সমবায় সমিতি পরিচালনা, প্রাচীরপত্র, সংবাদপত্র বা মাসিক পত্রিকা প্রকাশন ইত্যাদি।

৭। ভ্রমণ ও প্রকৃতি-বীক্ষণ

ঐতিহাসিক বা সংস্কৃতিমূলক স্থান পরিভ্রমণ, চড়ুইভাতি, স্কাউটিং গার্লস্ গাইড ইত্যাদি।

সহপাঠক্রমিক কাজগুলির উপকারিতা

এই সহপাঠক্রমিক কাজগুলির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আজ আর কেউ সন্দেহ পোষণ করেন না। এগুলির ক্রমবর্ধমান সমাদর এবং ক্রমস্ফীয়মান অবয়বই এগুলির সার্থকতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পাঠক্রমভুক্ত কাজগুলি অপেক্ষা এগুলি যে কোন্ দিক দিয়ে একটুও কম মূল্যবান নয় একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত এবং আজ সব দেশের শিক্ষাব্যবস্থাতেই এগুলি অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী শিশুর শিক্ষায় কেন অপরিহার্য তার কয়েকটি কারণ নীচে দেওয়া হল।

১। এগুলির মাধ্যমে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনা হয়, ফলে শিক্ষার্থীর দৈহিক বিকাশ পূর্ণতা লাভ করে এবং তার স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয়। মনের স্বাস্থ্য দেহের স্বাস্থ্যের উপর নির্ভরশীল এবং সুস্বাস্থ্য সুশিক্ষার অপরিহার্য উপকরণ।

২। এই কার্যগুলি শিক্ষার্থীর বিকাশোন্মুখ প্রক্ষোভ (emotion) গুলিকে অভিব্যক্ত হবার সুযোগ দিয়ে সেগুলির মধ্যে সংহতি আনে। ফলে শিক্ষার্থীর অনুভূতিগত সমন্বয় সাধিত হয় এবং মানসিক সাম্য অক্ষুণ্ণ থাকে।

৩। শিক্ষার্থীর মধ্যে নিহিত বিশেষ বিশেষ শক্তি এবং সম্ভাবনাগুলি এই কার্যগুলির মধ্যে দিয়ে আবিষ্কৃত হবার সুযোগ পায় এবং শিক্ষক সেইমত শিক্ষার্থীকে তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে যথাযথ পরিচালনা করতে পারেন।

৪। এই কার্যগুলি শিক্ষার্থীকে বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতাগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত করে দেয় এবং তার ফলে শিক্ষার্থী তার জীবনকে সম্পূর্ণভাবে জানতে পারে।

৫। এই কার্যগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সহজাত সৃজনীস্পৃহা তৃপ্তিলাভ করে এবং নিজের সার্থকতাবোধের ঈপ্সা ও আত্ম-প্রতিষ্ঠালাভের প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হয়।

৬। এগুলি শিক্ষার্থীকে দলগতভাবে কাজ করতে প্ররোচিত করে যেমন একদিকে তার মধ্যে সামাজিক সচেতনতা, সহযোগিতা, স্বার্থহীনতা, সহানুভূতি প্রভৃতি গুণগুলি জাগিয়ে তোলে তেমনই তাকে বাস্তবক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানে প্রবৃত্ত করে তার মধ্যে দায়িত্ববোধ, আত্মবিশ্বাস, বিচারশক্তি, চিন্তনশক্তি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিকশিত করে তোলে।

৭। শিক্ষার্থীকে বহু নতুন এবং কার্যকরী জ্ঞান ও কৌশল আয়ত্ত করতে সাহায্য করে। কেবল লিখন পঠনের মধ্য দিয়েই যে জ্ঞান অর্জন হয় তা ভাবা ভুল। সহপাঠক্রমিক কাজগুলির মধ্য দিয়েও শিক্ষার্থী বহু প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও কৌশল আয়ত্ত করতে পারে।

৮। এগুলির মধ্যে প্রচুর বৈচিত্র্য ও নতুনত্ব থাকার জন্য এগুলি শিক্ষার্থীর নিকট পরম আনন্দদায়ক হয়। বৈচিত্র্যহীন গতানুগতিক লিখন-পঠনের মাঝে মাঝে এগুলিকে বণ্টন করে দিলে লিখন-পঠনের কাজও যেমন ত্বরায়িত হয় তেমনই শিক্ষার্থীর মানসিক ক্লান্তিও কম হয়।

৯। ভ্রমণ, স্কাউটিং, পিকনিক প্রভৃতি কাজগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থী বিভিন্ন লোকেদের সঙ্গে পরিচিত হয়, ফলে তার মনের সঙ্কীর্ণতা দূর হয়ে যায় এবং

দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারণ ঘটে। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর সংস্পর্শে আসার ফলে শিক্ষার্থীর কল্পনা শক্তি ও সৌন্দর্যবোধ বিকশিত হবার সুযোগ পায়।

১০। ডিউইর মতে কোন প্রকৃত জ্ঞানই সত্যকার সক্রিয়তার মাধ্যম ছাড়া অর্জন করা যায় না। অর্থাৎ তাঁর ভাষায় শিখন আসবে কাজ করার মধ্যে দিয়ে এই সহপাঠক্রমিক কাজগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলি পুরোপুরি সক্রিয়। অতএব এগুলি যে প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের প্রকৃষ্ট সোপান সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ডিউইর মতে এগুলিই পাঠক্রমের প্রধানতম উপাদান।

এক কথায় বলা যেতে পারে যে সহপাঠক্রমিক কাজ শিক্ষার্থীর ব্যক্তি-সত্তার সর্বাঙ্গীন বিকাশের পরম সহায়ক, তার জ্ঞান আহরণের কার্যকরী মাধ্যম এবং তার মানসিক তৃপ্তির একটি বড় উপকরণ।

এই সকল কারণের জন্যই আজ সব দেশেরই শিক্ষাব্যবস্থাতে এই সহপাঠ-ক্রমিক কাজগুলির স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং এগুলিকে বাদ দিয়ে যে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা-পরিকল্পনা গড়ে তোলা যায় না তাও সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত সত্য।

প্রশ্নাবলী

1. Write a short essay on co-curricular activities.

(B. T. 1951, 59. B. A. 1951, 55)

Ans. (পৃঃ ২০৪—পৃঃ ২০৮)

2. Describe the utility of extra-curricular activities in schools. Why are these activities now-a-days called co-curricular activities ?

Ans. (পৃঃ ২০৪—পৃঃ ২০৮) (B. T. 1958)

3. Write an essay on the place of extra-curricular activities in educational institution.

Ans. (পৃঃ ২০৪—পৃঃ ২০৮) (B. A. 1959)

4. Why are extra-curricular activities now generally called co-curricular ? Cite some types of such pursuits that can be introduced in our schools.

Ans. (পৃঃ ২০৪—পৃঃ ২০৮) (B. A. 1960)

আঠার

জিন জ্যাকুই রুশো (Jean Jacques Rousseau)

মাঝে মাঝে মানব ইতিহাসে এমন এক এক জন মনীষী জন্মগ্রহণ করেন যাঁদের চিন্তা ও ভাবধারা পরবর্তীকালের মানব জাতির বহুবর্ষ পোষিত আদর্শ মতবাদ ও প্রথা-পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করে দেয়। রুশো ছিলেন এই শ্রেণীর একজন মনীষী। রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে সম্পর্কের যে নতুন ব্যাখ্যা রুশো দিয়ে ছিলেন তার সাক্ষাৎ প্রতিক্রিয়ারূপে দেখা দিয়েছিল প্রসিদ্ধ ফরাসী গণবিপ্লব এবং আমেরিকার স্বাধীনতা প্রাপ্তির আন্দোলন। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে তাঁরই দেওয়া গণ-স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শের উপরই প্রতিষ্ঠিত আজকের গণতন্ত্রের মূলভিত্তিটি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মত শিক্ষাবিজ্ঞানকেও রুশোর প্রতিভার সোনার কাঠি স্পর্শ করে গেছল। বহু শতাব্দীর প্রচলিত শিক্ষার নীতি ও পদ্ধতিগুলির বিকৃত রূপ তাঁর অনুভূতিপ্রবণ মনের কাছে প্রথম দৃষ্টিতেই ধরা পড়েছিল এবং সেগুলির অপূর্ণতা ও অন্তঃসারশূন্যতা উদ্ঘাটিত করার জন্য রুশো কলম তুলে নেন। তাঁর লেখা 'এমিল' (Emile) নামে বইটিতে তিনি যে কেবল প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছেনই যে তা নয় তার সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন শিক্ষা-পরিকল্পনাও উপস্থাপিত করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাচীনপন্থী চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে রুশোর বৈপ্লবিক আদর্শ ও মতবাদ নিতান্ত অবাস্তব বলেই মনে হয়েছিল এবং সে সময়কার শিক্ষাবিদেরা তাঁর নবপরিকল্পনার কোন রূপ মূল্যই দেন নি। কিন্তু সময়ের অতিবাহনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশের নবীন শিক্ষাবিদেরা রুশোর চিন্তাধারার মধ্যে নিহিত সুসমৃদ্ধ ভাবসম্পদটির সন্ধান পান এবং গত একশ বছর ধরে সারা পৃথিবীর শিক্ষার ইতিহাসে রুশোর বিভিন্ন ভাবধারাকে বিভিন্ন পন্থায় বাস্তব রূপ দেবার প্রচেষ্টাই একটা বড় অংশ অধিকার করে আছে। আজকের প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির অধিকাংশই পাওয়া যায় রুশোর শিক্ষাপরিকল্পনায় বীজের আকারে যদিও সেগুলিকে যথাযথ জলসিঞ্চন করে অঙ্কুরে এবং অঙ্কুর থেকে মহীরুহতে পরিণত করার কৃতিত্ব পরবর্তীযুগের রুশোর অনুগামী সমর্থকগণেরই।

অসাধারণ প্রতিভা, সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সুতীক্ষ্ণ অনুভূতির অধিকারী হলেও রুশোর লেখার মধ্যে প্রচুর অসামঞ্জস্য ও আত্মবিরোধিতা দেখা যায়। শিক্ষার নতুন পরিকল্পনা রচনা করতে গিয়ে তিনি প্রচলিত প্রথা ও তত্ত্বমাত্রকেই বিনা বিচারে ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন। যা কিছু এতদিন মানা হয়ে এসেছে সবই ভুল। সবই নতুন করে গড়তে হবে। পুরাতনের মধ্যে কোন ভাল নেই, গ্রহণ-যোগ্য কিছু নেই। পুরাতন মানেই ভুল, অকেজো ও ক্ষতিকর। প্রচলিতের প্রতি রুশোর এই যে চরম মনোভাব এর দুটি কারণ আছে। প্রথমত, রুশোর সময়ে শিক্ষাব্যবস্থা কৃত্রিমতা ও সঙ্কীর্ণতার দিক দিয়ে চরমে উঠেছিল। মধ্যযুগীয় যাজক শিক্ষকগণের হাতে সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল আকার-সর্বস্ব বিতর্কধর্মী ও অন্তঃসারশূন্য। শিক্ষার নামে কেবলমাত্র কতকগুলি কৃত্রিম বাক্‌চাতুর্য ও তর্ককুশলতাই শেখান হত। প্রকৃত শিক্ষার আদর্শ থেকে সে শিক্ষা সরে এসেছিল অনেক দূরে। শিক্ষার এই কৃত্রিমতা ও বিকৃতি রুশোর অনুভূতি-প্রবণ মনকে এতই ক্ষুব্ধ করেছিল যে তিনি প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে মন্দ ছাড়া আর কিছুই দেখেন নি।

দ্বিতীয়ত রুশোর ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতা ও সামাজিক অসাফল্যও তাঁর এই চরম মনোভাবের জন্য অনেকটা দায়ী। শারীরিক অসুস্থতা, অতিরিক্ত উচ্ছাসপ্রবণতা ও পার্থিব সাফল্যলাভের অযোগ্যতা ইত্যাদি কারণ রুশোর ব্যক্তিগত জীবনটি আশাভঙ্গের ব্যথা ও নৈরাশ্যে ভরে দিয়েছিল। এই ব্যর্থতাই সমাজ ও সভ্যতার যা কিছু প্রচলিত ও অনুমোদিত তারই বিরুদ্ধে তাঁর মনকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। তাঁর সেই পরাজয়কে পূরণ করার প্রচেষ্টারূপেই দেখা দিয়েছিল প্রচলিত ও প্রবর্তিত সমস্ত ব্যবস্থা ও রীতির বিরুদ্ধে তাঁর এই ক্ষমাহীন নিরঙ্কুশ জেহাদের ঘোষণা। এই সব কারণে অনেকে রুশোর মতবাদের যথার্থ মূল্য দিতে চান না। কিন্তু অসামঞ্জস্য, অতিরঞ্জন ও চরমতাকে বাদ দিয়ে রুশোর ভাবধারাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে প্রকৃতপক্ষে আধুনিক শিক্ষার মৌলিক আদর্শগুলির অধিকাংশই রুশোর পরিকল্পনায় বর্তমান এবং পরবর্তীযুগের বিভিন্ন দেশের শিক্ষানায়কগণ রুশোর এই সুসমৃদ্ধ ভাবসম্পদকে ভিত্তি করে নিজের নিজের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। এই জন্য বিনাদ্বিধায় আমরা রুশোকে আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার জনক বলে বর্ণনা করতে পারি।

রুশো ১৭১২ সালে জন্মগ্রহণ করেন জেনেভা নামক সহরে। রাষ্ট্রনীতির

উপর তাঁর প্রথম বুই বেরোয়। ১৭৬২ সালে সোশ্যাল কনট্রাক্ট (Social Contract) নামে এবং ঐ বৎসরেই শিক্ষানীতির উপর তিনি 'এমিল' (Emile) নামে বইখানি লেখেন। তাঁর এই দুটি বইতে যথাক্রমে রাষ্ট্রনীতি ও শিক্ষানীতি সম্পর্কে তাঁর বৈপ্লবিক মতবাদ প্রকাশিত হয়। এছাড়া তিনি আরও অনেক বই লেখেন। ১৭৭৮ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

রুশোর শিক্ষাতত্ত্ব

রুশো মূলত দার্শনিক ছিলেন। তিনি শিক্ষার মৌলিক তত্ত্বগুলি নতুন আদর্শে পুনর্গঠন করার চেষ্টা করেছিলেন। শিক্ষক বলতে যা বুঝি রুশো কোনদিনই তা ছিলেন না। কোনও স্কুল তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন নি, কোনদিন শিক্ষকতাও তিনি করেন নি। সেইজন্য শিক্ষার পদ্ধতি বা ব্যবহারিক দিকটা সম্বন্ধে রুশোর অবদান অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু শিক্ষাতত্ত্বের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে রুশো সুচিন্তিত অভিমত এবং সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সমাধান দিয়ে গেছেন। আমরা সেগুলির এখানে আলোচনা করব।

রুশোর প্রকৃতিবাদ

রুশোর শিক্ষামূলক মতবাদকে প্রকৃতিবাদ (Naturalism) নাম দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতিবাদ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দার্শনিক মতবাদ নয়। এটি শিক্ষার সংগঠন ও সমস্যাগুলিকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ দিয়ে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা মাত্র। দার্শনিক মতের দিক দিয়ে রুশো নিঃসংশয়ে ভাববাদী (Idealist) ছিলেন। তিনি আর সব ভাববাদীদের মতই সর্বাধিনায়ক এবং সর্বজনীন এক আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

রুশোর প্রকৃতিবাদকে একটিমাত্র বাক্যে প্রকাশ করা যায়, শিশুর শিক্ষা হবে প্রকৃতি অনুযায়ী (according to Nature)। কথাটি শুনতে যদিও সহজ ও সাধারণ বলে মনে হয় তবু বাক্যটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা রুশোর মতবাদের গভীরতা ও গুরুত্বের পরিচয় পাব।

"এমিল" ও প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষা

রুশো তার 'এমিল' বইটিতে এমিল নামে একটি ছেলের বাল্যকাল থেকে শিক্ষা কি রকম হওয়া উচিত তার পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন। এমিল বইটি অর্ধ উপন্যাস অর্ধ আলোচনামূলক। এমিলকে তার পিতামাতার কাছ থেকে সরিয়ে এনে এবং

সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গিয়ে তাঁকে এক আদর্শ-শিক্ষকের হাতে তুলে দেওয়া হল। প্রকৃতির সৌন্দর্য ও ভাবসম্পদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগের মধ্যে দিয়ে এমিল সেখানে তার শিক্ষা লাভ করল এবং সে শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে হল প্রকৃতি অনুযায়ী।

'এমিল' বইটির সুরুর পংক্তি কয়েকটিতে রুশোর প্রকৃতিবাদের মৌলিক তত্ত্বটির পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে। "প্রকৃতির স্রজকের হাত থেকে যা কিছু আসে তাই ভাল কিন্তু মানুষের হাতে সব কিছুই বিকৃত হয়ে যায়।" আমরা শিক্ষালাভ করি তিনটি উৎস থেকে—প্রকৃতির কাছ থেকে, মানুষের কাছ থেকে এবং বস্তুর কাছ থেকে। এই তিন শ্রেণীর শিক্ষার মধ্যে যদি পূর্ণ সামঞ্জস্য না দেখা দেয় তবে ব্যক্তির শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ থেকে যায়। যে ব্যক্তির মধ্যে এই তিন প্রকারের শিক্ষা মিলে যায় তার শিক্ষাকেই সার্থক শিক্ষা বলা চলে। মানুষের কাছ থেকে যে শিক্ষালাভ করা যায়, সেগুলির উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা আছে কিন্তু প্রকৃতির কাছ থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। অতএব মানুষ এবং বস্তুজগতের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষাকে প্রকৃতির কাছে পাওয়া শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নিতে হবে আমাদের এবং সে সামঞ্জস্য আনবে মানুষ ও বস্তুর কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষাকে প্রকৃতির শিক্ষার অধীনস্থ করে। এক কথায় প্রকৃতির শিক্ষা অনুযায়ী শিশুর আর সব শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। কিন্তু গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় ঠিক তার বিপরীতটি করা হয়। পিতামাতা, শিক্ষক, সমাজব্যবস্থা, প্রচলিত প্রথা ইত্যাদির কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষাকেই বড় করে তোলা হয়, প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষাকে অবহেলা করে, তাকে অবদমিত করে।

'প্রকৃতি'র তিন অর্থ

রুশোর মতে প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষাই হল আদর্শ ও সার্থক শিক্ষা। কিন্তু প্রকৃতি কথাটিকে রুশো তার 'এমিল' বইতে প্রচলিত সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেন নি। তিনটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থে তিনি প্রকৃতি কথাটির ব্যবহার করেছেন। যেমন

(ক) মনোবৈজ্ঞানিক প্রকৃতি (Psychological Nature)

(খ) জীবতত্ত্বমূলক প্রকৃতি (Biological Nature)

(গ) বস্তুজাগতিক প্রকৃতি (Physical Nature)

রুশোর মতে শিশুর শিক্ষা এই তিন রকম প্রকৃতি অনুযায়ী হবে।

মনোবৈজ্ঞানিক প্রকৃতি বলতে বোঝায় শিশু যে সমস্ত প্রকৃতিগত শক্তি, সম্ভাবনা, চাহিদা, পছন্দ, অপছন্দ, আবেগ ইত্যাদির অধিকারী সেগুলিকে। রুশোর মতে শিশুর শিক্ষা এই প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে পরিকল্পিত হবে। সাধারণত শিশু একটু বড় হলেই পিতামাতা, শিক্ষক, সমাজব্যবস্থা ইত্যাদির চাপে তার এই প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলির স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে যায় এবং তাকে কতকগুলি কৃত্রিম আচরণ ও অভ্যাস শিখতে বাধ্য করা হয়। সেজন্য শিশু যাতে প্রকৃতিগত চাহিদা ও সামর্থ্য, পছন্দ ও আগ্রহ মত শিখতে পারে তার ব্যবস্থা করাই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। এইজন্যই রুশো বলেছেন, 'একমাত্র অভ্যাস যা শিশুকে আহরণ করতে দেওয়া যেতে পারে তা হচ্ছে অভ্যাস আহরণ না করার অভ্যাস।'

জীবতত্ত্বমূলক প্রকৃতি বলতে রুশো বোঝাচ্ছেন সেই প্রকৃতিকে যা ব্যক্তিগত প্রাণীরূপে মানুষ সঙ্গে নিয়ে জন্মেছে। রাষ্ট্র, সমাজ, ইত্যাদি সৃষ্টি হবার আগে মানুষ বাস করত যে অবস্থায় রুশো তার নাম দিয়েছেন প্রাকৃতিক অবস্থা (Natural State) এবং সে মানুষের নাম দিয়েছেন প্রাকৃতিক মানুষ (Natural Man)। এই প্রাকৃতিক মানুষই রুশোর মতে অবিকৃত ও বিশুদ্ধ প্রকৃতির অধিকারী ছিল। কিন্তু সমাজ ইত্যাদি সৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গে তার এই বিশুদ্ধ প্রকৃতি বিকৃত ও কলুষিত হয়ে যায়।

তেমনই শিশু যখন জন্মায় তখনও তার এই জীবতত্ত্বমূলক প্রকৃতি থাকে অবিকৃত ও বিশুদ্ধ অবস্থায়। কিন্তু যে মুহূর্তেই সে সমাজের সংসর্গে আসে সেই মুহূর্ত থেকেই তার সেই প্রকৃতিও বিকৃত ও কলুষিত হতে সুরু করে। অতএব শিশুর শিক্ষাকে তার এই জীবতত্ত্বমূলক প্রকৃতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করার অর্থ হল যে শিশুকে সরিয়ে আনতে হবে সমাজের সংসর্গ থেকে, তার অন্তর্বাসী এই সহজাত যথার্থ প্রকৃতিকে ভাল করে জানতে হবে এবং তার শিক্ষাকে পূর্ণরূপে পরিচালিত হতে দিতে হবে এই প্রকৃতির চাহিদার দ্বারা, অন্য কোন বাইরের শক্তি বা অনুশাসনের দ্বারা নয়।

রুশোর এই জীবতত্ত্বমূলক প্রকৃতির ধারণা থেকেই জন্মেছে তার মতবাদের সমাজবিরোধী অংশটুকু। সেইজন্য যথার্থ শিক্ষা দেবার জন্য এমিলকে সমাজের পরিবেশ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। এ থেকে অবশ্য এ সিদ্ধান্ত

করা ভুল হবে যে রুশোর শিক্ষাপরিকল্পনা পুরোপুরি সমাজবিরোধী। তিনি তদনীন্তন কলুষিত ও নীতিবিধ্বস্ত সমাজ যে শিক্ষার সম্পূর্ণ অনুপযোগী সে কথাই বলতে চেয়েছেন এবং শিশুর জীবনের প্রথম বৎসরগুলো সমাজের প্রভাবমুক্ত করে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার শেষে তাকে সমাজ-জীবনের জন্য প্রস্তুত হবারও পরিকল্পনা রুশো দিয়েছেন। অতএব রুশোর শিক্ষা-তত্ত্ব বাহ্যত সমাজ-বিরোধী হলেও প্রকৃতপক্ষে সমাজবিরোধী নয়।

প্রকৃতির তৃতীয় অর্থ টি হল বস্তুজাগতিক প্রকৃতি। গাছপালা, নদী, পাহাড়, আকাশ-বাতাস, রোদ-জল, পশু-পক্ষী ইত্যাদি দিয়ে যে বস্তুজগতের মূর্ত প্রকৃতি সেই প্রকৃতি অনুযায়ী হবে শিশুর শিক্ষা। এর অর্থ হল শিশুকে সুযোগ দিতে হবে যাতে সে প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসতে পারে। খোলা মাঠে মুক্ত হাওয়ায় ঘুরে ফিরে, রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, পশু পক্ষীর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশে সে যেন প্রকৃতির প্রশান্ত প্রভাব অনুভব করতে পারে। তার প্রাথমিক শিক্ষায় জীবনের অপরিহার্য অভিজ্ঞতাগুলি আহরণে প্রকৃতিই হবে তার প্রথম ও প্রধান শিক্ষক। এই চিন্তাধারায় স্বাভাবিক ভাবেই পল্লীজীবনকে নগরজীবনের চেয়ে অনেক উঁচুতে স্থান দেওয়া হয়েছে। রুশোর মতে সহর হল মানবজাতির কবর স্থান।

এই হল রুশোর মতে শিশুর ত্রিবিধ প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষার সংক্ষিপ্ত সংব্যাখ্যান। এই শিক্ষাপরিকল্পনা থেকে স্বাভাবিক ভাবেই কতকগুলি অতি-গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্পূর্ণ অভিনব সিদ্ধান্ত গঠন করা যায়। সেগুলি হল এই।

নেতিবাচক শিক্ষা (Negative Education)

প্রাচীনকালে মনে করা হত যে শিশু যে প্রকৃতি নিয়ে জন্মায় সে প্রকৃতি স্বভাবতই অসৎ। এই অসৎ আদিম প্রকৃতিকে নির্মূল করে তার জায়গায় ঈপ্সীত প্রকৃতি স্থাপন করাই হল শিক্ষার মুখ্য কাজ। অতএব প্রথম থেকেই কঠোর শৃঙ্খলা ও সুনিয়ন্ত্রিত শাসনের মধ্যে শিশুকে রাখতে হবে। কিন্তু রুশোর মতে আদিম প্রকৃতি ত অসৎ নয়ই, বরং সে প্রকৃতি অকলুষিত, অবিকৃত এবং পূর্ণ ভাবে সৎ। অতএব শিশুর প্রথম জীবনের শিক্ষা হবে নেতিবাচক শিক্ষা (Negative Education)। রুশোর মতে এই শিক্ষাকালে শিশুকে কোন সত্য বা সদ্‌গুণ শেখান হবে না, কেবল তার মন যাতে কোন মন্দের দিকে না যায় বা কোন ভুল না করে সেদিকে পাহারা দিতে হবে। তাঁর সমস্ত শিক্ষাই আসবে

তার প্রকৃতি, তার বিভিন্ন শক্তি এবং তার স্বাভাবিক আগ্রহের বাধাহীন বিকাশের মধ্য দিয়ে।

রুশোর নেতিবাচক শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল শিশুর সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতা। সে তার চাহিদামত কাজ করবে, কোন বাধা তাকে দেওয়া হবে না। কোন কৃত্রিম উপায়ের সাহায্যে তাকে কিছু শেখান হবে না, তার পছন্দমত জিনিস শেখবার তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। শিশুকে জোর করে শেখাবার চেষ্টা করেই শিক্ষকেরা হিংসা, বিরক্তি, রাগ ইত্যাদি কুবৃত্তিগুলিই তার মধ্যে সৃষ্টি করে এসেছেন। শিশুকে প্রকৃত শিক্ষা দেবার একমাত্র পন্থা হল তাকে কিছু না শেখান। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় রুশোর নেতিবাচক শিক্ষা বুঝি শিক্ষার অভাবকেই বোঝাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। নেতিবাচক শিক্ষার মধ্যেও প্রচুর শিক্ষা আছে, তবে গতানুগতিক অর্থে শিক্ষা বলতে আমরা যা বুঝি, এ শিক্ষা সে শিক্ষা নয়। রুশো নিজেই বলেছেন যে নেতিবাচক শিক্ষা বলতে আলস্যের কালকে বোঝায় না। বরং ঠিক তার বিপরীত। এ সময়ে শিশু কোন জ্ঞান লাভ করে না বটে কিন্তু জ্ঞানলাভের উপকরণ যে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় সেগুলি সুগঠিত হয়, কোন যুক্তি বা বিষয় সে শেখে না বটে কিন্তু তার জন্য তার মন প্রস্তুত হয়ে ওঠে। শিশু এই শিক্ষাকালে কোন সদ্‌গুণ অর্জন করে না বটে কিন্তু মন্দ গুণ থেকে তার মনকে মুক্ত রাখে। সে কোন সত্য আহরণ করে না বটে কিন্তু কোনও মিথ্যাও তার মনে প্রবেশ করতে পারে না। যখন সে বড় হয়, যখন তার ইন্দ্রিয় সব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এবং যখন তার বোঝার মত বয়স হয় তখন সে জ্ঞান, সত্য ও সৎকে নিজে থেকেই চিনে নিতে পারে, সেগুলিকে ভালবাসতে শেখে এবং তাদের পথেই স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে যায়।

প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্ত্ব (Theory of Natural Consequence)

এই নেতিবাচক শিক্ষার মতবাদের দিক দিয়ে শিশুর শারীরিক শিক্ষা হবে মুক্ত প্রকৃতির পরিবেশে অবাধ সঞ্চালন, তার মানসিক বা জ্ঞানমূলক শিক্ষা বলতে কিছুই থাকবে না, কেননা রুশোর মতে 'শৈশব হল বিচারবুদ্ধির ঘুমন্ত অবস্থা।' তবে নৈতিক শিক্ষাতেও মানুষের কোনও হস্তক্ষেপ থাকবে না। সেখানেও প্রকৃতি হবে একমাত্র শিক্ষক। রুশো এ তত্ত্বটির নাম দিয়েছেন প্রাকৃতিক ফলাফলের (Natural Consequence) তত্ত্ব। এর অর্থ হল যে শিশুর কাজের ভাল মন্দ বিচার করে পুরস্কার শাস্তি যা দেবার তা প্রকৃতিই দেবে, মানুষ দেবে না। রুশোর

মতে ভাল মন্দ কাজের বিচার প্রকৃতি নিজেই করে থাকে এবং সেই মত তাকে পুরস্কৃত বা শাস্তিদান প্রকৃতিই করে থাকে। যেমন, বেড়াতে যাবার সময় শিশু পোষাক পরতে দেরী করছে, তাকে বাড়ীতে রেখে যাওয়া হোক। জলে বেশী ভিজছে, তার ঠাণ্ডা লাগবে এবং তখন সে ঘরের মধ্যে বন্ধ থাকতে বাধ্য হবে। যদি সে বেশী খায় তার স্বাভাবিকভাবেই শরীর খারাপ হবে। এককথায় সমস্ত কাজেরই স্বাভাবিক ফলাফল শিশু ভোগ করুক এবং সেইভাবেই কোন্ কাজটা ভাল, কোন্ কাজটা মন্দ তা সে শিখুক।

রুশোর এই প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্ত্বটি পরে প্রসিদ্ধ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) বিশেষভাবে সমর্থন করেন। কিন্তু নানা দিক দিয়ে দেখা যায় যে এ তত্ত্বটি পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমত প্রকৃতির দেওয়া শাস্তি সব ক্ষেত্রেই যে অপরিহার্য তা নয়। অনেকক্ষেত্রে এই শাস্তি এত পরে আসে যে শিশু অপরাধ এবং শাস্তির মধ্যে কোনরূপ কার্যকারণের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না। দ্বিতীয়ত অপরাধ এবং প্রাকৃতিক ফলের মধ্যে আনুপাতিক সম্বন্ধও ঠিক থাকে না। অর্থাৎ লঘুপাপে গুরুদণ্ড এবং গুরুপাপে লঘুদণ্ডের দৃষ্টান্ত প্রকৃতিতে প্রায়ই দেখা যায়। তৃতীয়ত অনেক ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ফলাফলের উপর নির্ভর করাটা বিপজ্জনকও হতে পারে, যেমন, শিশুকে জলে ভেজা থেকে নিবৃত্ত না করা হলে তার নিউমোনিয়া হতে পারে এবং জীবন সংশয়ও হবার সম্ভাবনা থাকে।

বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা

রুশো এমিলের শিক্ষাকে তার বয়স অনুযায়ী কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন এবং প্রত্যেকটি পর্যায়ের শিক্ষার স্বরূপ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন—

এক থেকে পাঁচ বৎসর বয়সের বয়সের শিক্ষা

এ সময়ে শিক্ষা হবে প্রধানত শরীরমূলক। পিতা হলেন স্বাভাবিক শিক্ষক, মা স্বাভাবিক ধাত্রী। শিশুর প্রথম শিক্ষা আসবে এঁদের কাছ থেকেই। সাধারণ প্রচলিত যে সমস্ত বাধা বা বিধিনিষেধ শিশুর উপর আরোপ করা হয়ে থাকে সেগুলি থেকে তাকে মুক্ত করাই হবে এই শিক্ষার মূলমর্ম। শিশুকে আঁটসাট জামা পরিয়ে তার সহজ অঙ্গসঞ্চালনকে খর্ব করা, তার স্বাধীন চলাফেরাকে নানা নিষেধ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করা, তাকে বদ্ধ ঘরের মধ্যে আটকে রাখা, তার স্বাভাবিক চাহিদা ও প্রবণতাকে তৃপ্ত হতে না দেওয়া এবং কাজের ভালমন্দ বোঝার আগেই তাকে শাস্তি দেওয়া—ইত্যাদি যে সব অসংখ্য বাধা ও নিষেধ

শিশুর উপর আরোপ করা হয়ে থাকে সেগুলি থেকে তাকে মুক্ত রাখাই হচ্ছে এ সময়ের শিক্ষার একমাত্র কর্মসূচী। শিশুর স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া এবং শরীরকে সবল করাই হচ্ছে এ পর্যায়ের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। রুশোর মতে শরীর যত বলবান হবে ততই শরীর মনের অনুগত হবে। দুর্বলতা থেকেই আসে যত দুর্নীতি। শিশু দুর্বল বলেই মন্দ হয়। তাকে সবল করে তোলা হোক, সে সৎও হয়ে উঠবে।

এককথায় পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা হবে নিছক শরীরমূলক। এ সময় তার মানসিক এবং নৈতিক বিকাশের দিকে কোনরূপ মনোযোগ দেবার প্রয়োজন নেই। এমন কি শিশু যাতে বেশী কথা বলতে না শেখে তাও দেখতে হবে। কেননা অধিক কথা শেখা হল চিন্তা করতে শেখার পরিপন্থী।

রুশোর এ শিক্ষা পরিকল্পনা যে অনেকাংশে ত্রুটিপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিশেষ করে কথা বলতে শেখা যে শৈশবকালে উন্নত চিন্তা করার পক্ষে অপরিহার্য এ মনোবৈজ্ঞানিক সত্যটি রুশোর জানা ছিল না।

পাঁচ থেকে বার বৎসর বয়সের শিক্ষা

এ সময়ের শিক্ষা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং দুটি নীতির দ্বারা শিশুর এ পর্যায়ের শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হবে। প্রথম নেতিবাচক শিক্ষা ও দ্বিতীয় প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্ত্ব।

এই বয়সে শিশুকে কিছু শিক্ষা না দেওয়াই হবে তার প্রকৃত শিক্ষা। গতানুগতিক প্রথায় শিশুর উপর নানারূপ ভাবধারা, আচরণ, বিশ্বাস চাপিয়ে দেওয়ার সনাতন প্রথার তীব্র বিরোধিতা করে রুশো বলেছেন যে শিশুর মনকে তার সহজ স্বচ্ছন্দ বিকাশের পথে এগিয়ে যেতে দিতে হবে। তাকে কিছু পড়াতে বা শেখাতে হবে না। সে যা শেখে তা নিজে থেকেই এবং নিজের চাহিদা অনুযায়ীই শিখবে। প্রকৃতি চান যে শিশু মানুষ হয়ে ওঠার আগে যেন শিশুই থাকে।

এক কথায় এ পর্যায়ের শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকবে নিছক ইন্দ্রিয় ও মানসিক বৃত্তি-গুলির অনুশীলন ও চর্চার মধ্যে। সে কিছু শিখবে না বটে, কিন্তু কি করে শিখতে হয় তাই শিখবে। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি ও ঘটনার সংস্পর্শে এসে শিক্ষার বিভিন্ন মৌলিক নীতিগুলির সঙ্গে সে পরিচিত হবে। এই হল রুশোর নেতিবাচক শিক্ষার মূল কথা। আর এ সময়ে শিশুর নৈতিক শিক্ষা হবে

প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্ত্বের সাহায্যে। নৈতিক নিয়মকানুন ভাঙার জন্য মানুষের আরোপিত শাস্তি তার উপর প্রযোজ্য হবে না, প্রকৃতি নিজে তার বিচার করবেন এবং সেইমত তাকে শাস্তি দেবেন।

বার থেকে পনেরো বৎসর বয়সের শিক্ষা

এ সময় থেকে স্থরু হবে শিশুর অস্থিবাচক শিক্ষা (Positive Education)। এতদিন শিশু তার জ্ঞান আহরণের মাধ্যমগুলিকে তৈরী করেছে। এখন থেকে স্থরু হবে তার সত্যকারের জ্ঞান আহরণের কাজ।

কিন্তু সত্যকারের প্রয়োজনীয় ও মূল্যসম্পন্ন জ্ঞান কোন্‌টি তা কিসের দ্বারা বোঝা যাবে? এ বিষয়ে শিশুর কৌতূহলই হবে একমাত্র পথনির্দেশক। যা শিখতে এবং জানতে শিশু স্বাভাবিক কৌতূহল অনুভব করবে সেইটি শেখা এবং জানা হবে শিশুর পক্ষে সব দিক দিয়ে কাম্য। বিজ্ঞতা বা পাণ্ডিত্য লাভ করার ইচ্ছা থেকে শিশু জ্ঞান আহরণ করবে না, তার নিজস্ব উন্নতিবোধের স্পৃহাই হবে তার জ্ঞান আহরণের মূলে শক্তি।

গতানুগতিক শিক্ষায় প্রচলিত পাঠক্রমে এমন অনেক কিছু থাকে যা শিশুর স্বাভাবিক রুচি-বিরোধী এবং যা তার কৌতূহল-প্রসূত নয়। রুশোর এই মতবাদ অনুযায়ী সে সবগুলিকে পাঠক্রম থেকে বাদ দিয়ে দিতে হবে। রুশো এ পর্যায়েও বিশেষ কোনও বই পড়ার নির্দেশ দেন নি। তার মতে 'রবিনসন ক্রুসো' হল একমাত্র বই যা শিশুকে পড়তে দেওয়া যেতে পারে। আত্মনির্ভরতা, প্রকৃতি অনুযায়ী জীবনযাপন, প্রচলিত জ্ঞানের অসারতা ইত্যাদি বিষয়গুলি এই বই থেকে শিশু শিখতে পারবে।

নিছক জ্ঞান আহরণ করারও রুশো তীব্র সমালোচনা করেছেন। জ্ঞান মাত্রেই সত্য নয়, আবার প্রয়োজনীয়ও নয়। এমন অনেক জ্ঞান আছে যা ভুলে ভরা। ফলে যত বেশী জ্ঞান আহরণ করা যায় তত বেশী ভুলও আহরণ করা হয়। আবার সত্যমাত্রেই প্রয়োজনীয় নয়। কেবলমাত্র সেই সব সত্য যা শিশুর কাছে প্রয়োজনীয় তাই শিশু শিখবে।

এ সময়ে শিশু কোনও একটা শিল্পও শিখবে। এই শিল্প শেখাটির অর্থ উপার্জনের জন্য নয় বা জ্ঞানলাভের জন্যও নয়। শ্রমমূলক কাজের প্রতি সাধারণের যে বিরূপ মনোভাব আছে তা দূর করাই হল এর প্রকৃত উদ্দেশ্য।

পনেরো থেকে কুড়ি বৎসর বয়সের শিক্ষা

এতদিন এমিলের শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিক ও আত্ম-সীমিত। তার দেহ, ইন্দ্রিয় ও মস্তিষ্কেরই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এবার সুরু হবে তার হৃদয়ের শিক্ষা। এতদিন কেবলমাত্র নিজের চাহিদাতৃপ্তি, নিজের উন্নতি, নিজের বিকাশসাধনই ছিল তার শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য, কিন্তু এখন থেকে সুরু হল সমাজের আর দশজনের সঙ্গে তার সম্পর্কের শিক্ষা এবং এ শিক্ষায় অপরের প্রতি ভালবাসাই হবে প্রধানতম শক্তি।

দেখা যাচ্ছে যে রুশোর শিক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী সামাজিক শিক্ষার সুরু হবে পনেরো বৎসর বয়স থেকে। এর আগের শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ ব্যক্তিমুখী—শিশুর নিজস্ব চাহিদা ও আগ্রহ অনুযায়ী। কিন্তু পনেরো বছর বয়স থেকে তাকে সমাজের উপযোগী করে তোলার জন্য সমাজমূলক শিক্ষা দেওয়া সুরু হবে। অতএব রুশোর শিক্ষা-পরিচালনাকে সমাজ-বিরোধী বলা চলে না। তাঁর শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে শিশুকে সমাজমূলক শিক্ষা দেবার সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাই আছে।

শিশুর প্রক্ষোভের সুষম বিকাশই হবে এ পর্যায়ে শিক্ষার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। যা ছিল আত্মপ্রেম, তা এখন অপরের প্রতি ভালবাসা ও অনুরাগে পরিবর্তিত হবে। ফলে প্রথম দেখা দেবে বিবেক, ভালবাসার পাশাপাশি উদয় হবে ঘৃণার এবং তা থেকে জন্ম নেবে শিশুর ভাল-মন্দর জ্ঞান। এই ভাবে সুরু হবে শিশুর নৈতিক শিক্ষা।

এই নৈতিক শিক্ষা ধর্মমূলক শিক্ষার সঙ্গে একযোগে দেওয়া হবে। শিশু সহানুভূতি ও প্রক্ষোভমূলক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সামাজিক একতা শিখবে। নিছক কথার মধ্যে দিয়ে নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার কোন মূল্য নেই। ব্যক্তিগত সংযোগ, সুদৃষ্টান্ত ইত্যাদি বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে শিশুর প্রকৃত নৈতিক শিক্ষা আসবে। রুশোর মতে সব নৈতিক শিক্ষাই কাজ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে অর্জন করা যায়। সেইজন্য শিশুকে ভাল কাজ করতে উৎসাহ দিতে হবে যাতে সে ভাল মন্দ নিজে থেকে চিনতে পারে।

মেয়েদের শিক্ষা

পুরুষদের শিক্ষা সম্বন্ধে রুশোর অভিমত যথেষ্ট প্রগতিশীল হলেও মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে রুশোর মতবাদ সেই পুরাতনপন্থীই। তাঁর মতে মেয়েদের জন্মই হল পুরুষদের জীবনসঙ্গিনী হবার জন্য, অতএব তার শিক্ষাও হবে সেই লক্ষ্যের সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে। শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী তার শিক্ষা হবে—শিক্ষা সম্বন্ধে রুশোর এই যে মৌলিক নীতি তা কোনরূপেই এখানে প্রযোজ্য হচ্ছে না।

রুশোর শিক্ষানীতির সার-সংক্ষেপ

শিক্ষা সম্পর্কে রুশোর যে অভিনব চিন্তাধারার সঙ্গে আমরা পরিচিত হলাম সেগুলিকে বিশ্লেষণ করলে স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত রূপে আমরা নীচের শিক্ষানীতি-গুলি গঠন করতে পারি।

(ক) শিক্ষা হবে **শিশুর প্রকৃতি অনুযায়ী**—প্রকৃতি বলতে এখানে বোঝাচ্ছে শিশুর মনের স্বাভাবিক ইচ্ছা, আগ্রহ আর প্রকৃতিদত্ত মানসিক শক্তি-সামর্থ্য, তার পছন্দ অপছন্দ, তার সহজাত প্রক্ষোভ, প্রবৃত্তি, আবেগ অনুভূতি ইত্যাদি। যা প্রকৃতিগত তাই শিশুর শিক্ষার পক্ষে মঙ্গলকর, যা কৃত্রিম তাই তার পক্ষে ক্ষতিকর।

(খ) শিক্ষা একটি স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া, তা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট করা যায় না। শিক্ষা হল প্রকৃতপক্ষে শিশুর সহজ, আভ্যন্তরীণ বিকাশ অতএব বাইরে থেকে শাসনশৃঙ্খলার সাহায্যে তা তার উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। তার স্বাভাবিক আগ্রহ ও প্রকৃতিগত শক্তিগুলির সক্রিয়তার মধ্যে দিয়ে শিক্ষা দেখা দেয়, শিক্ষকের বা অন্য কোন বহির্শক্তির চাপে দেখা দেয় না।

(গ) শিক্ষা নিছক তথ্য বা জ্ঞান অর্জন নয়। শিক্ষা প্রকৃতিদত্ত শক্তিগুলির পুষ্টি ও উৎকর্ষসাধন। শিশুর বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, মানসিক শক্তি ও প্রক্রিয়াগুলির পরিপূর্ণ বিকাশই হল যথার্থ শিক্ষা।

(ঘ) শিশুর শিক্ষার প্রকৃতি নির্ধারিত হবে শিশুর নিজের চাহিদা ও ইচ্ছার দ্বারা, পিতামাতা, শিক্ষক প্রভৃতির চাহিদার দ্বারা নয়;

(ঙ) শিশুর প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষা দিতে হলে শিশুকে শ্রদ্ধা করতে হবে এবং যেহেতু প্রকৃতির দিক দিয়ে শিশুতে শিশুতে পার্থক্য রয়েছে সেহেতু শিশুর নিজস্ব ব্যক্তিসত্তাকেও শ্রদ্ধা করতে হবে। শিশু এবং তার স্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা করাটাই রুশোর শিক্ষাতত্ত্বের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।

(চ) প্রত্যেক শিক্ষকেরই শিক্ষা দেবার আগে শিশুকে ভাল করে জানা উচিত। রুশোর মতে শিশুকে ভাল করে না জেনে কোন কিছুই তাকে শেখান উচিত নয়।

(ছ) শারীরিক সক্রিয়তা ও সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা শিক্ষার কর্মসূচীর প্রধানতম অঙ্গ।

(জ) শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারিত হবে শিশুর কৌতূহল ও আগ্রহের দ্বারা। ভাষামূলক ও সাহিত্যধর্মী শিক্ষার পরিমাণ কমিয়ে ইন্দ্রিয়ভিত্তিক ও বাস্তবধর্মী শিক্ষার পরিমাণ বাড়াতে হবে।

(ঝ) প্রকৃত শিক্ষা আসবে শিশুর জীবন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে, নিছক বই পড়ে বা শিক্ষকের বক্তৃতা শুনে নয়। রুশো বলেন, যে আমাদের প্রথম শিক্ষক হল আমাদের হাত পা আর চোখ। এদের পরিবর্তে বইকে শিক্ষক করার অর্থ হল আমাদের অপরের বিচার বুদ্ধি ব্যবহার করতে শেখান। এইজন্য শিশুর শিক্ষাকে ব্যাপক এবং বহুমুখী করতে হবে যাতে সে সকল প্রকারের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে এবং যাতে তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলি পূর্ণ বিকাশলাভের সুযোগ পায়।

শিক্ষায় রুশোর অবদান

রুশোর মতবাদের মধ্যে স্ববিরোধিতা, অতিরঞ্জন এবং বহুবিধ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তিনি যে শিক্ষার ক্ষেত্রে সত্যকারের একটা বিপ্লব এনে গেছেন এ বিষয়ে কোনরূপ দ্বিমত থাকতে পারে না। বর্তমানে আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষা বলতে আমরা যা বুঝি তার বিভিন্ন ভাবধারার গঙ্গোত্রী যে রুশোর নতুন মতবাদ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং তাঁরই ভাবসম্পদকে আশ্রয় করে পরবর্তী যুগের শিক্ষাবিদেরা গড়ে তুলেছিলেন আধুনিক শিক্ষার সুরম্য সৌধটি।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞান, এই উভয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নীতি ও পদ্ধতির নিরূপণে পরবর্তী যুগে রুশোর মতবাদ অতুলনীয় প্রভাব বিস্তার করেছিল।

রুশোর শিক্ষাতত্ত্বের মূলকথা ছিল মানুষের ত্রিবিধ প্রকৃতি অনুযায়ী তার শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। তার মনোবৈজ্ঞানিক প্রকৃতি অর্থাৎ তার সহজাত প্রবৃত্তি, প্রবণতা, প্রকৃতিদত্ত শক্তি, সামর্থ্য ইত্যাদির বাধাহীন বিকাশই হবে প্রকৃত শিক্ষা। তার ফলে শিশুর এই অন্তঃপ্রকৃতিকে ভাল করে জানতে হবে, তার চাহিদা পছন্দ আগ্রহ ইত্যাদির সঙ্গে ভাল করে পরিচিত হতে হবে। রুশোর এই মতবাদ থেকে জন্ম নিয়েছিল যাকে আমরা বলতে পারি শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক আন্দোলন। তাঁর চিন্তাধারার এই শাখাটির উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছিল পরবর্তী যুগে পেষ্টালৎসী, ফ্রয়েবেল ও হার্বার্টের শিক্ষাপ্রচেষ্টা।

বহির্জাগতিক প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষার আদর্শ থেকে থেকে দেখা দিয়েছে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাকৃতিক ঘটনা ও তথ্যাবলীকে শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু করে তোলার ব্যাপক আয়োজন। প্রকৃতিকে কেবলমাত্র কতকগুলি জড়বস্তু এবং প্রাণীর সমষ্টি মনে করলেই চলবে না, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত সর্বজনীন সূত্রগুলিকে আবিষ্কার এবং বিশ্লেষণ করাই হল প্রকৃতিকে সত্যকারের জানা। রুশোর দেওয়া প্রকৃতির এই নতুন সংব্যখ্যান পরবর্তীযুগের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও গবেষণার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল এবং শিক্ষার কর্মসূচীর মধ্যে প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণকে অপরিহার্য অঙ্গরূপে অন্তর্ভূক্ত করেছিল।

রুশোর প্রাকৃতিক মানুষের তত্ত্ব থেকে দেখা দিয়েছে শিক্ষায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মতবাদ। মানুষের আদিম প্রকৃতি, তার প্রকৃতিদত্ত অনুভূতি ও নীতিবোধ, তার আত্মসচেতনতা ইত্যাদিকে অবিকৃত রাখতে হবে সমাজে প্রচলিত কৃত্রিম শিক্ষা ও নিয়ন্ত্রণের প্রভাব থেকে। এই ভাবধারা থেকে জন্ম নিয়েছে রুশোর সমাজ-বিরোধী শিক্ষার পরিকল্পনা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রুশোর শিক্ষাদর্শ সমাজবিরোধী নয়। তিনি এমন একটি সমাজব্যবস্থার পরিকল্পনা করেছিলেন যেখানে প্রীতি, সহানুভূতি দয়া, পারস্পরিক সহযোগিতা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পূর্ণভাবে বিকশিত হবে।

রুশোর এই বিভিন্ন ভাবসম্পদকে ভিত্তি করে নানাস্থানে নানা প্রকৃতির প্রগতিশীল শিক্ষা প্রচেষ্টা জন্ম নিল। জার্মানীতে বেসডো, স্যালজম্যান (Salzmann) এবং ক্যাম্পে(Campe) পরীক্ষণমূলকভাবে বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। পরবর্তীযুগে পেষ্টালৎসী, ফ্রয়েবেল ও হার্বার্ট আরও ব্যাপকভাবে রুশোর নতুন

ভাবধারাগুলি শিক্ষায় প্রয়োগ করতে চেষ্টা করলেন এবং তার ফলে নতুন নতুন শিক্ষাব্যবস্থা ও পদ্ধতি গড়ে উঠতে লাগল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশশতাব্দীর সুরুতে রুশোর নতুন মতবাদের মূল্য ও গুরুত্ব শিক্ষাবিদেরা আরও বেশী করে উপলব্ধি করতে লাগলেন এবং ইংলণ্ড, ইটালি, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে নতুন নতুন প্রগতিশীল বিত্থালয় গড়ে উঠতে লাগলো।

বর্তমানে যাকে শিশুকেন্দ্রিক (Child-centred) শিক্ষা নাম দেওয়া হয়েছে তার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলির প্রত্যেকটি কোন না কোন রূপে রুশোর মতবাদে নিহিত ছিল এবং মণ্টেসরি, ফ্রান্সিস্ পার্কার, জন ডিউই, কিলপ্যাট্রিক প্রভৃতি শিক্ষাবিদগণের দীর্ঘ সাধনা ও প্রচেষ্টার ফলে আজ সেই সুপ্ত বীজগুলি এক একটি বিরাট মহীরুহের আকার ধারণ করেছে।

প্রশ্নাবলী

1. Describe in brief the major educational ideas of Rousseau and their influence on the development of education in later period.

Ans. (পৃঃ ২১১—পৃঃ ২২৩)

2. Critically estimate Rousseau's contribution to education.

Ans. (পৃঃ ২২০—পৃঃ ২২৩)

3. Rousseau is the father of modern education—how far do you support this statement ?

Ans. (পৃঃ ২২০—পৃঃ ২২৩)

4. Describe after Rousseau the education of the child in different stages. Comment on his concept of Negative Education.

Ans. (পৃঃ ২১৬—পৃঃ ২১৯)

উনিশ

জোহান হিনরিক পেষ্টালৎসী (Johann Heinrich Pestalozzi)

শিক্ষাজগতে নতুন প্রগতিশীল ভাবধারার জন্ম দেবার পূর্ণ কৃতিত্ব রুশোর হলেও সেগুলিকে বাস্তবে রূপ দেবার মত শক্তি বা পরিকল্পনা তাঁর ছিল না। রুশো নিজে সৃজনধর্মী ছিলেন না এবং তাঁর সংগঠনমূলক কোন গুণও ছিল না। সেজন্য রুশোর বৈপ্লবিক মতবাদগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন করার দায়িত্ব পড়েছিল তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত অনুগামীদের উপর। রুশোর ঠিক পরেই যে কয়জন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ রুশোর আদর্শে গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে পেষ্টালৎসীই প্রথম। শিশুকে কিছু শেখাতে হলে তাকে আগে ভালো করে জানতে হবে রুশোর এই মতবাদ থেকেই জন্ম নিয়েছিল শিক্ষায় মনোবৈজ্ঞানিক আন্দোলন, এই আন্দোলনের অর্থ হল যে শিশুর শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিক করে তুলতে হবে। পেষ্টালৎসীকেই সাধারণত এই আন্দোলনের জনক বলে মনে করা হয়। পরবর্তীকালে পেষ্টালৎসীর অনুগামী আরও দুজন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ফ্রয়েবেল এবং হার্বার্ট এই আন্দোলনের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। একটা কথা এখানে মনে রাখা দরকার যে পেষ্টালৎসীর সময়ে মনোবিজ্ঞানের উন্নতি বা প্রসার খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। পেষ্টালৎসী নিজে মোটেই উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন না। তিনি গর্ব করে বলতেন যে গত কুড়ি বৎসরের মধ্যে তিনি কোন বই স্পর্শ করেননি। মুনষ্টারবার্গের (Munsterberg) মতে পেষ্টালৎসী মনোবিজ্ঞানের অ-আ-ক-খও জানতেন না। মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট ও পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও গভীর অন্তর্দৃষ্টি, সহানুভূতি এবং সু-সমৃদ্ধ সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে পেষ্টালৎসী শিক্ষার পদ্ধতি ও সংগঠনের প্রচুর উন্নতি সাধন করেন এবং তাঁর সেই শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিক করার অপরিণত ও অসম্পূর্ণ আন্দোলনই পরবর্তী যুগের নবীন শিক্ষা পরিকল্পনায় একটি বিরাট শক্তি রূপে পরিগণিত হয়েছিল।

১৭৪৬ সালে ইউরোপের জুরিখ নামক শহরে পেষ্টালৎসীর জন্ম হয়। তিনি প্রথম জীবন থেকেই রুশোর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। রুশোর আত্মবিরোধী

আবেগপ্রবণ উক্তিগুলির মধ্যেও যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে—একথা পেষ্টালৎসী ভালভাবেই বুঝেছিলেন। তিনি প্রথমে রুশোর এমিল (Emile) বইতে বর্ণিত শিক্ষার আদর্শ অনুযায়ী তাঁর একটি ছেলেকে মানুষ করতে স্থরু করলেন। পরে ১৭৭৪ সালে নিউহফ্ নামক একটি জায়গায়, দরিদ্র ও অবহেলিত ছেলেমেয়েদের জন্য পেষ্টালৎসী একটি স্কুল খুললেন। অর্থের অভাবে তাঁর স্কুল না চললেও তিনি শিক্ষার উপর পর পর অনেকগুলি বই লেখেন। এই বইগুলিতে তিনি তাঁর শিক্ষাসংক্রান্ত মতবাদগুলিকে সবিস্তারে বর্ণনা করেছিলেন। তাছাড়া পেষ্টালৎসী পচিশ বৎসরের উপর ধরে স্থইজারল্যাণ্ডের বিভিন্ন শহরে শিক্ষকতা করে কাটিয়েছিলেন। স্থদীর্ঘ শিক্ষকতা এবং তাঁর প্রগতিশীল শিক্ষাতত্ত্ব পেষ্টালৎসীকে শিক্ষার ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান দিয়ে গেছে।

পেষ্টালৎসীর শিক্ষাতত্ত্ব

রুশোর মত পেষ্টালৎসীও শিক্ষার গতানুগতিক সংকীর্ণ লক্ষ্যগুলিকে বাতিল করে দিয়েছিলেন। তিনি নিজে একজন পরম ধর্মানুরাগী ব্যক্তি হয়েও ধর্মাচরণকে শিক্ষার লক্ষ্য বলে স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে শিক্ষা হল শিশুর সমস্ত শক্তি এবং মানসিক বৃত্তির স্বাভাবিক, প্রগতিশীল এবং স্থষম বিকাশ। অতএব শিশুর শক্তি ও বিভিন্ন বৃত্তিগুলির প্রকৃতি ভাল করে জানতে হবে। এককথায় শিশুর প্রকৃতিটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে হবে এবং তার সেই প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। শিশুর প্রকৃতিকে ভালভাবে জানা মানেই হল শিশুর মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়া এবং সেই মনোবৈজ্ঞানিক আদর্শের উপর ভিত্তি করে শিশুর শিক্ষার পদ্ধতি গড়ে তোলাই সার্থক শিক্ষা দানের প্রথম সোপান। শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিক করে তোলার যে আদর্শের পেছনে পেষ্টালৎসী বলতে গেলে একরূপ তার সমস্ত জীবনটাই উৎসর্গ করেছিলেন—এই হল সেই আদর্শের মূলকথা। পেষ্টালৎসীর শিক্ষাতত্ত্বের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল যে তিনি শিক্ষাকে নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রধান উপকরণ বলে মনে করতেন। লেওনার্ড ও গারটুড (Leonard & Gertrude) নামে তাঁর প্রসিদ্ধ বইটিতে তিনি একটি নতুন শিক্ষার পরিকল্পনা দিয়েছেন। তাঁর সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষা কেবলমাত্র যে শিশুরই নৈতিক ও মানসিক বিকাশই সাধন করবে তাই নয় সেই সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের মধ্যেও অনুরূপ সংস্কারও পরিবর্তন আনবে। গারটুড ছিল একজন অজ্ঞ সাধারণ গ্রাম্য নারী। কিন্তু সে নিছক

অন্তর্দৃষ্টি সাধনা ও পরিশ্রমকে সম্বল করে তার নিজের ছেলেমেয়েদেরই যে কেবল সার্থক শিক্ষা দিয়েছিল তা নয়, তার নতুন শিক্ষাদর্শের প্রভাবে তার অলস ও পানাসক্ত স্বামী লেওনার্ডও বদলে গেল এবং দেখতে দেখতে তার এই নতুন ভাবধারার প্রভাবে তার ছোট গ্রামখানির প্রত্যেক অধিবাসীর মধ্যেই মানসিক ও নৈতিক উন্নতি দেখা দিল। সমাজের উন্নয়নে এবং পুনর্গঠনে শিক্ষার এই অপরিহার্যতা পেষ্টালৎসীর শিক্ষা-তত্ত্বের মূল কথা।

এ থেকেই এসেছে পেষ্টালৎসীর শিক্ষাতত্ত্বের তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটি। শিক্ষা কোন বিশেষ শ্রেণী বা দলের জন্য নয়। শিক্ষা সর্বজনীন, প্রত্যেকের আজন্ম অধিকার। রুশো যা চেয়েছিলেন একটি ছেলের জন্য—এমিলের জন্য, পেষ্টালৎসী তা চাইলেন বিশ্বের সব ছেলেমেয়ের জন্য, তা সে দরিদ্র, নীচ বা ক্ষীণবুদ্ধিই হক না কেন। পেষ্টালৎসীর এই শ্রেণীধর্মনির্বিশেষে সর্বজনগণের জন্য সর্বজনীন শিক্ষার দাবীও যে সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে একটি অত্যন্ত প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পেষ্টালৎসীর শিক্ষাতত্ত্বের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ-প্রক্রিয়ার উপর গুরুত্ব দেওয়া। রুশোর অনুকরণে তিনিও প্রচলিত শিক্ষাপ্রথার তীব্র সমালোচনা করেন এবং স্বাভাবিক বিকাশ প্রক্রিয়া অনুযায়ী শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করার নির্দেশ দেন। তাঁর মতে শিশু যে প্রকৃতিদত্ত শক্তি, আগ্রহ, সম্ভাবনা ও বিকাশোন্মুখতা নিয়ে জন্মায় সেগুলিকে আমরা শিক্ষার নামে হত্যা করি। সত্যকারের শিক্ষা হবে এগুলিকে পূর্ণ ও বাধাহীনভাবে বর্ধিত হতে দেওয়া। পেষ্টালৎসীর মতে আদর্শ শিক্ষা হল শিশুর মানসিক, নৈতিক, দৈহিক, প্রভৃতি দিকের সর্বাঙ্গীন বিকাশ। কিন্তু এই বিকাশ কখনও নিছক বই পড়ে বা তথ্য আহরণ করে আসে না। শিশুর বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সুসংহত কার্যাবলীর মাধ্যমেই এই ঈপ্সীত বিকাশ দেখা দিয়ে থাকে।

পেষ্টালৎসীর শিক্ষাতত্ত্বের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলিত আবহাওয়ার আমূল পরিববর্তন সাধন। গতানুগতিক বিদ্যালয়ের কৃত্রিম, রুক্ষ, বিধিনিষেধের নাগপাশে আবদ্ধ শিক্ষার পরিবেশকে তিনি সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে সেখানে প্রীতি, ভালবাসা ও সহানুভূতির এক মধুর আবহাওয়ার সৃষ্টি করেন। তাঁর মতে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি বোঝাপড়া ও সহযোগিতার সম্পর্ক না থাকে তবে সেখানে শিক্ষা ব্যর্থ হতে বাধ্য। শিক্ষার পরিবেশের মধ্যে এই যে একটা সহজ স্বচ্ছন্দ ও প্রীতিময়

আবহাওয়ার সৃষ্টি এইটি বোধকরি নবশিক্ষার আন্দোলনে পেষ্টালৎসীর সব চেয়ে মূল্যবান অবদান।

পেষ্টালৎসীর শিক্ষাপদ্ধতি

রুশোর মত পেষ্টালৎসী নিছক শিক্ষার কতকগুলি তত্ত্ব দিয়েই ক্ষান্ত হননি। সেগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করে সেগুলির কার্যকারিতা বিচার করেছিলেন। রুশো পুরাতন শিক্ষাপদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করে বহু নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছিলেন কিন্তু সেগুলির সমাধানের কোন চেষ্টা করেন নি। পেষ্টালৎসী শিক্ষাতত্ত্বগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্য নিজে শিক্ষকতাকে বরণ করে নিয়েছিলেন এবং সেগুলিকে কার্যোপযোগী করে তোলার কাজেই সারাজীবন নিয়োগ করে ছিলেন। তাঁর এই সুতীব্র উদ্দীপনা, সীমাহীন অনুপ্রেরণা অনলস সাধনা এবং আত্মোৎসর্গ ই তাঁকে সারা বিশ্বের কাছে প্রিয় করে তুলেছিল। নিজে শিক্ষাব্রত গ্রহণ করে পেষ্টালৎসী দেখলেন যে শিক্ষার দুটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর প্রথমেই পাওয়া প্রয়োজন। প্রথমটি হল কোন্ কোন্ জ্ঞান ও ব্যবহারিক শক্তি শিশুর পক্ষে আহরণ করা প্রয়োজন, এবং দ্বিতীয়, কি পদ্ধতিতে সেই জ্ঞান ও শক্তি শিশুকে অর্জন করতে সমর্থ করা যায়। এই দুটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার পেছনেই তিনি তাঁর সমগ্র প্রচেষ্টা নিয়োগ করেন।

বস্তুভিত্তিক পাঠ (Object Lesson)

পেষ্টালৎসী তাঁর দীর্ঘ পরীক্ষণের ফলরূপে একটি নতুন শিক্ষণ পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। তার নাম দেন তিনি বস্তুভিত্তিক পাঠ দান (Object Lesson) এই পদ্ধতির মূল নীতি হল যে শিশুর শিক্ষা নিছক ভাষার মাধ্যমেই দেওয়া হবে না, কোন মূর্ত বস্তুকে কেন্দ্র করে দেওয়া হবে। এর ফলে বস্তুটি সম্বন্ধে শিক্ষার্থী যে জ্ঞান লাভ করবে তা বাস্তবধর্মী ও স্থায়ী হবে। তাছাড়া শিশুর পর্যবেক্ষণ কুশলতাও এ পদ্ধতিতে বৃদ্ধি পাবে। পেষ্টালৎসীর আগে প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ কমেনিয়াসও মূর্ত বস্তুর মাধ্যমে শিক্ষা দেবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন, কিন্তু তাঁর সে পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাকে বাস্তবধর্মী করা। পেষ্টালৎসীর বস্তুভিত্তিক পাঠদানের অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য হল যে এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিশুর সমগ্র মনের বিকাশ সাধন করা যাবে। পেষ্টালৎসীর ভাষায়, শিশু শিখেছে মানেই শিশু মনের দিক দিয়ে বেড়েছে এবং সে বাড়ে তার নিজের কাজের মধ্যে দিয়ে তার অনুভূতি

ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, নিছক কথার মধ্যে দিয়ে নয়। এক কথায় বাস্তব-জীবনভিত্তিক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে শিশুর মানসিক বৃদ্ধি ঘটে থাকে।

পেষ্টালৎসীর শিক্ষা-পদ্ধতির সমগ্র পরিকল্পনাটাই এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মতে শিক্ষা হল মনের ছেদহীন বিকাশ এবং তা আসে মনের এমন কতকগুলি বিশেষ দিকের চর্চা থেকে যার ফলে মন সামঞ্জস্যপূর্ণ ও প্রগতিশীল পন্থায় কাজ করতে পারে। মনের এই বিশেষ দিকগুলির চর্চাকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যেন শিশুর বৃদ্ধির যে কোন স্তরেই তার মানসিক বিকাশও সুষম ও সু-সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। এই চর্চাও নির্ভর করবে কথা বা ভাষা শিক্ষার উপর নয় মূর্ত বস্তুর পর্যবেক্ষণের উপর। শিক্ষার এই মৌলিক ব্যাখ্যান থেকেই পেষ্টালৎসীর বস্তুভিত্তিক পাঠদানের পদ্ধতিটি জন্মলাভ করেছে।

বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় শিক্ষণে পেষ্টালৎসী তাঁর এই পদ্ধতির প্রয়োগ করেছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষায় পেষ্টালৎসী গণিতের উপর জোর দিয়েছিলেন, বিশেষ করে মানসিক গণিতের উপর। গণিতও শেখান হত মূর্ত বস্তুর মধ্য দিয়ে, এবং পেষ্টালৎসীর শিক্ষাব্যবস্থার ফলে গণিত শিক্ষার পদ্ধতির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। অঙ্কন ও লিখনের উপরও পেষ্টালৎসী বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। লেখা ও আঁকা উভয়ক্ষেত্রেই শিশু সরলরেখা বক্ররেখা প্রভৃতির সমাবেশের সাহায্যে কুশলতা অর্জন করত। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বানান করে অক্ষর শিক্ষার প্রচলিত পদ্ধতিকে বাদ দিয়ে তার স্থানে উচ্চারণ করে শব্দাংশ শিক্ষার পদ্ধতি অনুকরণ করা হত এবং তার ফলে ভাষা শেখাটা অনেক বেশী সহজসাধ্য ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। ভূগোল শিক্ষার পদ্ধতিও তিনি একইভাবে পরিবর্তিত করেছিলেন। সাধারণ ও সহজ বস্তুর সাহায্যে ভৌগোলিক সত্তাগুলিকে ধীরে ধীরে গঠন করে তোলা এবং মানুষের সঙ্গে সেই সত্তাগুলির সম্পর্ক নিরূপণ করাই ছিল তাঁর ভূগোল শিক্ষার পদ্ধতি। তাছাড়া ভূগোলশিক্ষাকে প্রকৃতিবীক্ষণ এবং কৃষিকার্য শেখার অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করা হত। পেষ্টালৎসীর মূর্ত বস্তুর মাধ্যমে শিক্ষাদানের পদ্ধতি থেকেই প্রকৃতিবীক্ষণকে পাঠক্রমের অঙ্গীভূত করার আন্দোলন জন্ম নিয়েছে। সঙ্গীত এবং শরীরচর্চাকে বিদ্যালয়ের কার্যাবলীর প্রয়োজনীয় অংশ বলে মনে করা হত। পেষ্টালৎসীর পদ্ধতির মৌলিক নীতিগুলি সংক্ষেপে নীচে দেওয়া হল।

(ক) পর্যবেক্ষণ সমস্ত শিক্ষার ভিত্তি এবং ভাষা শেখানোর সময় পর্যবেক্ষণের সাহায্যে মূর্তবস্তুর সঙ্গে ভাষাকে গ্রন্থিবদ্ধ করতে হবে।

(খ) শেখার সময় আর বিচার এবং সমালোচনা করার সময় এক নয়।

(গ) শিক্ষার প্রত্যেকটি অংশে যথেষ্ট সময় দিতে হবে যাতে শিশু ভালভাবে বিষয়টি শিখতে পারে।

(ঘ) শিক্ষণ সব সময়ে সাধারণ ও সহজ বস্তু দিয়ে স্থরু হবে এবং ধীরে ধীরে শিশুর বৃদ্ধি অনুযায়ী মনোবিজ্ঞানসম্মত ধারায় এগোবে।

(ঙ) শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিশুর বৃদ্ধি, কেবল কতকগুলি একতরফা মতবাদ শেখান নয়। শিক্ষক অবশ্যই শিশুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা করবেন।

(চ) প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার লক্ষ্য শিশুকে জ্ঞান বা বিদ্যা দেওয়া নয় তার বুদ্ধির ক্ষমতাকে বাড়ান ও বিকাশিত করা। তাছাড়া শিশুর মানসিক শক্তির সঙ্গে তার জ্ঞানকে সুসমন্বিত করতে হবে।

(ছ) শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

(জ) শিক্ষাদান সব সময়েই শিক্ষার উচ্চতর লক্ষ্যের অধীন হবে।

শিক্ষক-শিক্ষণ

যে যুগে উচ্চকণ্ঠস্বর ও কঠোর শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষমতাকেই শিক্ষক বৃত্তির প্রধানতম গুণ বলে মনে করা হত, সে যুগেই পেষ্টালৎসী শিক্ষকদের শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। তিনি উপলব্ধি করলেন যে তাঁর আবিষ্কৃত পদ্ধতির সাফল্য নির্ভর করছে পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগের উপর। সেইজন্য তিনি তাঁর সময়ের অনেকখানি ব্যয় করতে স্থরু করলেন উপযুক্ত শিক্ষক তৈরী করার জন্য। বিভিন্ন দেশ থেকে তার কাছে শিক্ষকেরা আসতে স্থরু করলেন শিক্ষাগ্রহণের জন্য। বহুদেশ সরকারী বৃত্তি ও অর্থসাহায্য মঞ্জুর করলেন এবং উপযুক্ত শিক্ষকদের পাঠালেন পেষ্টালৎসীর কাছ থেকে শিক্ষা পাবার জন্য। দেখতে দেখতে পেষ্টালৎসীর শিক্ষায়তন হয়ে দাঁড়াল সর্বজনীন কৌতূহল ও বিস্ময়ের বস্তু এবং শিক্ষক থেকে স্থরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত দলে দলে সেখানে ভিড় করতে লাগল সে সময়কার সর্বাধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির রূপটি দেখবার জন্য। নবাগত শিক্ষণকামী শিক্ষকদের দল বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় এই নবযুগের শিক্ষকটির অভিনব শিক্ষাপদ্ধতি দেখত এবং তাঁর প্রগতিশীল ও শিক্ষাপরিকল্পনার মৌলিক তত্ত্বগুলি হৃদয়ঙ্গম করে দেশে ফিরত।

পেষ্টালৎসী কেবলমাত্র তাঁর আবিষ্কৃত পদ্ধতিই যে তাদের শেখাতেন তা

নয়, তাদের শেখাতেন কেমন করে শিশুর প্রকৃতিকে চিনতে হবে, কেমন করে সেই প্রকৃতির বিকাশোন্মুখতা অনুযায়ী তার শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে এবং কেমন করে পরীক্ষণের সাহায্যে আরও উন্নততর শিক্ষণ পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হবে এবং অভিজ্ঞতার পরীক্ষণাগারে সেগুলিকে যাচিয়ে নিতে হবে।

দেখতে দেখতে পৃথিবীর সমস্ত দেশেই পেষ্টালৎসীর ছাত্র, শিষ্য ও অনুগামী সমর্থকদের দল গড়ে উঠল। তাঁরা নবীন উৎসাহে পেষ্টালৎসীর নীতি ও পদ্ধতির প্রয়োগ করতে সুরু করলেন এবং তাঁদেরই প্রচেষ্টা থেকে গড়ে উঠল নতুন এক শ্রেণীর শিক্ষায়তন যেখানে প্রথম শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার মূর্তরূপ দেখা দিয়েছিল। পেষ্টালৎসীর ছাত্র ও অনুগামীদের মধ্যে জার্মানবাসী ফলেনবার্গ (Fallenberg) হার্বার্ট (Herbart), ফ্রয়েবেল (Froebel), জেলার (Zeller), সেলডন (Sheldon) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে হার্বার্ট ও ফ্রয়েবেল পরবর্তী শতকে নবশিক্ষা ব্যবস্থার অধিনায়করূপে দেখা দেন।

পেষ্টালৎসীর শিক্ষানীতির সংক্ষিপ্তসার

পেষ্টালৎসীর শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন চিন্তাধারাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা নীচের বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পাই, যথা—

(ক) শিক্ষা হল শিশুর প্রকৃতিদত্ত সমস্ত শক্তি ও বৃত্তিগুলির সুষম বিকাশ। অতএব জ্ঞান আহরণ, ধর্মানুষ্ঠান বা সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া ইত্যাদি শিক্ষার লক্ষ্য হতে পারে না।

(খ) শিক্ষা যে কেবলমাত্র শিশুর পূর্ণবিকাশই আনে তা নয়, সমাজের পুনর্গঠন ও নৈতিক মানের উন্নয়নেরও প্রধানতম উপকরণ হল শিক্ষা।

(গ) শিক্ষা কোন বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠির জন্য নয়, শিক্ষায় সকলের সমান অধিকার, শিক্ষা সর্বজনীন।

(ঘ) শিক্ষা হল শিশুর আভ্যন্তরীণ সম্ভাবনা ও বৈশিষ্ট্যগুলির বিকাশ প্রক্রিয়া এবং সে বিকাশ আসবে শিশুর বৃদ্ধিপ্রক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সু-সংহত কার্যাবলীর মাধ্যমে।

(ঙ) বিদ্যালয়ের পরিবেশ কৃত্রিম ও কঠোর শৃঙ্খলার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে না। বিদ্যালয় হবে গৃহেরই প্রতিচ্ছবি এবং গৃহের মধ্যে যেমন স্বচ্ছন্দ ও প্রীতিময় আবহাওয়া থাকে বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ আবহাওয়াও হবে তার অনুরূপ।

(চ) পর্যবেক্ষণ সমস্ত শিক্ষার মূলে, অতএব শিশুর ইন্দ্রিয়গুলির যথাযথ বিকাশ এবং তার পর্যবেক্ষণের ক্ষমতার উৎকর্ষ-সাধনই শিক্ষার লক্ষ্য।

(ছ) শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক পারস্পরিক আদান প্রদান ও সহানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

শিক্ষায় পেষ্টালৎসীর অবদান

রুশোর মত প্রতিভা বা বৈপ্লবিক ভাবধারা পেষ্টালৎসীর ছিল না। তাঁর অনুগামী হার্বার্টের মত পাণ্ডিত্য ফ্রয়েবেলের মত দার্শনিক গভীর অনুভূতিও তাঁর ছিল না। নতুন তত্ত্ব বা চিন্তার দিক দিয়ে রুশোর চেয়ে একটি নতুন কথাও তিনি বলেন নি। তিনি যা লিখে গেছেন তার মধ্যেও প্রচুর স্ববিরোধিতা ও অসামঞ্জস্য বর্তমান। যে মনোবিজ্ঞানকে তিনি শিক্ষার ভিত্তি করার ব্রত নিয়েছিলেন সে মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধেও তার জ্ঞান নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ছিল। এমন কি বহুক্ষেত্রে তাঁর ধারণা এবং বিশ্বাস ছিল সম্পূর্ণ মনোবিজ্ঞানবিরোধী। কিন্তু তা সত্ত্বেও পেষ্টালৎসীকে আমরা আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার প্রথম কারুশিল্পী বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা করব না।

তার প্রথম কারণ হল তিনিই প্রথম রুশোর শিক্ষাতত্ত্বের বৈপ্লবিক চিন্তাধারাগুলিকে বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা করেন। ইতিপূর্বে বেসডো প্রভৃতি রুশোর অনুরাগীরা রুশোর আদর্শে বিদ্যালয় স্থাপন করলেও পেষ্টালৎসী হলেন প্রথম শিক্ষক যিনি প্রগতিশীল শিক্ষার রূপটিকে বিশ্বের সামনে সাফল্যের সঙ্গে তুলে ধরলেন এবং সর্বসাধারণের কাছ থেকে তার স্বীকৃতি ও সমাদর আদায় করলেন।

দ্বিতীয়ত, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও উনবিংশ শতাব্দীর সূত্রপাতে মানবচিন্তার রাজ্যে বহুমুখী পরিবর্তন এসেছিল। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রুশো, ভলটেয়ার হেগেল প্রভৃতির নতুন ভাবধারার সৃষ্টি, মনোবিজ্ঞানে ডেকার্ট, লক, হবস্ প্রভৃতির আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তন, মানবতাবাদী শিক্ষকদের প্রাচীন সংকীর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা এবং ইরাসমাস্, কমেনিয়াস, রুশো প্রভৃতি প্রগতিপন্থী শিক্ষাবিদদের শিক্ষার নতুন আদর্শ প্রচার ইত্যাদি ঘটনাগুলি শিক্ষাজগতে একটা আমূল পরিবর্তনকে আসন্ন করে তুলেছিল। কেবলমাত্র উপযুক্ত মাধ্যমের অভাবেই সেই বিপ্লবটি এতদিন বিলম্বিত ছিল। পেষ্টালৎসী সেই অতি প্রয়োজনীয় মাধ্যমরূপে দেখা দিলেন এবং তাঁর মধ্য দিয়েই শিক্ষা জগতের এই বহুমুখী পরিবর্তনের রুদ্ধ শক্তিটি আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই কারণেই স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয়ত, পেষ্টালৎসী কেবল নতুন শিক্ষার আদর্শ বা তত্ত্ব উপস্থাপন করেই নিবৃত্ত হন নি, তাঁর সুদীর্ঘ অনলস জীবন দিয়ে সেগুলির তিনি কার্যকারিতা বিচার করেছিলেন। শিক্ষাবিষয়ে তাঁর মতামত ও নির্দেশ সবই বাস্তব পরীক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে সেগুলি গভীরভাবে বিদ্বৎসমাজের অন্তর স্পর্শ করেছিল। পেষ্টালৎসীর এই পরীক্ষণ তাঁর সময়ে এবং পরবর্তীকালে পৃথিবীর বহুদেশের বহু শিক্ষাবিদকে শিক্ষার সমস্যা নিয়ে পরীক্ষণ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং বর্তমানে শিক্ষার নানা সমস্যা নিয়ে যে পৃথিবীব্যাপী নানাবিধ গবেষণা চলছে তার মূলে আছে পেষ্টালৎসীর এই শিক্ষামূলক প্রচেষ্টা।

চতুর্থত, পেষ্টালৎসীই প্রথম শিশুশিক্ষার একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা থেকেই পরবর্তী যুগে শিক্ষার পদ্ধতি সংস্কারের আন্দোলনের জন্ম হয় এবং বহু প্রগতিশীল পদ্ধতির আবিষ্কার হয়।

পঞ্চমত, শিক্ষার রুক্ষ কঠোর পরিবেশের মধ্যে তিনি এক নতুন প্রীতিময় আবহাওয়ার সৃষ্টি করে শিক্ষা সম্বন্ধে গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গীটির আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভালবাসা ও প্রীতি যে যথার্থ শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য—আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার এই মৌলিক তথ্যটুকু প্রথম বাস্তবে প্রয়োগ করেন "ফাদার পেষ্টালৎসী।"

ষষ্ঠত, পেষ্টালৎসীই শিক্ষাকে সর্বজনীনতা দান করে গেছেন। শিক্ষা যে সকলের জন্মাধিকার তাঁর এই মতবাদ থেকে জন্মেছে আধুনিক সর্বজনীন শিক্ষা-দানের আদর্শটি।

সবশেষে, শিক্ষাকে মনোভিত্তিক করার প্রচেষ্টাই পেষ্টালৎসীর শিক্ষাক্ষেত্রে সব চেয়ে বড় অবদান। প্রকৃত মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে পেষ্টালৎসীর বিশেষ কোন পরিচয় না থাকলেও এবং বহুক্ষেত্রে ভুল মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর তাঁর মতবাদ এবং পদ্ধতিকে প্রতিষ্ঠিত করলেও পেষ্টালৎসীর প্রচেষ্টাই যে পরবর্তীযুগের শিক্ষায় মনোবৈজ্ঞানিক আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল সে. বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হার্বার্ট, ফ্রয়েবেল, মণ্টেসরি প্রভৃতি শিক্ষাবিদেরা শিক্ষাব্যবস্থাকে মনোবিজ্ঞানসম্মত রূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন এবং আজ সেই সব প্রচেষ্টার সম্মিলিত ফলরূপে দেখা দিয়েছে আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা। বস্তুত প্রগতিশীল শিক্ষাকেন্দ্রিক শিক্ষার সাম্প্রতিক সৌধরচনার মালমশলা দিয়ে যান রুশো। পেষ্টালৎসী হলেন প্রথম কারুশিল্পি যিনি সেই মালমশলা দিয়ে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার সে সৌধের

ভিত্তি স্থাপন করেন। পূর্ণ সৌধগঠনের কৃতিত্ব পরবর্তী শিক্ষাবিদগণের হলেও পেষ্টালৎসীকে প্রথম ভিত্তিস্থাপকরূপে আমরা সব সময়েই মনে রাখব।

প্রশ্নাবলী

1. "The modern education breathes the spirit of Pestalozzi" —Discuss.

Ans. (পৃঃ ২২৫—পৃঃ ২৩৩)

2. Critically estimate Pestalozzi's contribution to education.

Ans. (পৃঃ ২৩০—পৃঃ ২৩৩)

3. Discuss the new method of teaching introduced by Pestalozzi.

Ans. (পৃঃ ২২১—পৃঃ ২২৩)

4. Pestalozzi is the originator of the movement of psychologising education. How far is this statement true ?

Ans. (পৃঃ ২২৭—পৃঃ ২৩৩)

ক্লাড়

জন ফ্রেডারিক হার্বার্ট (John Frederic Herbart)

শিক্ষার জগতে রুশো দেখা দেন রুদ্ররূপী ঝঞ্ঝার মূর্তি নিয়ে। সেই সময়কার ধর্মীয় শিক্ষকগণ শাসন-সর্বস্ব এবং অন্তঃসারশূন্য শিক্ষার যে ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন রুশো তা প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেললেন, কিন্তু রুশো স্বজনধর্মী ছিলেন না। প্রাচীন নিয়ম-সর্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করেই তাঁর কাজ শেষ হয়ে যায়। নতুন করে গড়বার কোন চেষ্টাই তিনি করেননি।

এই ধ্বংস স্তূপের উপর শিক্ষা-সৌধকে নতুন করে গড়ে তোলবার ভার যাঁদের উপর পড়েছিল জন হার্বার্ট হলেন তাঁদের একজন। রুশোর নতুন আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য পেষ্টালৎসী যে প্রচেষ্টা করেছিলেন সেই প্রচেষ্টাই জন হার্বার্টকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। বস্তুত জার্মান শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে তিনিই প্রথম পেষ্টালৎসীর শিক্ষাপ্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানান। আবার তিনিই প্রথম পেষ্টালৎসীর নীতি ও কার্যের সমালোচনা করেন।

এর প্রথম কারণ হল, হার্বার্ট বুদ্ধি ও জ্ঞানের দিক দিয়ে পেষ্টালৎসী এমন কি রুশোর চেয়ে ও উন্নত ছিলেন। রুশো যুক্তি বা বিচারবুদ্ধিকে স্বীকার করেন নি, মনের আবেগ প্রক্ষোভ ইত্যাদিকেই বড় করেছিলেন। পেষ্টালৎসীর কাছেও যুক্তির আবেদনের চেয়ে মনের আবেদন অনেক বড় ছিল। সেই দিক দিয়ে রুশোর মাপকাঠিতে পেষ্টালৎসী ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। কিন্তু হার্বার্ট ছিলেন একটি শিক্ষাপ্রাপ্ত, সুসংহত-চিন্তাসম্পন্ন এবং সমালোচনাধর্মী-মনের অধিকারী। সেইজন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে হার্বার্টের যা কিছু অবদান সবই যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত, মনের কাছে নিছক আবেগধর্মী আবেদন নয়।

হার্বার্টের শিক্ষাতত্ত্ব

পেষ্টালৎসীর মতে শিশুর মানসিক শক্তিগুলির সুষম বিকাশ হল শিক্ষার লক্ষ্য। কিন্তু হার্বার্ট শিক্ষার এ লক্ষ্যকে বাতিল করে দেন। তাঁর মতে মন একটি একক পদার্থ তাকে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন শক্তিতে ভাগ করা যায় না। তেমনি রুশোর দেওয়া শিক্ষার লক্ষ্যের সমাজ-বিরোধী সংব্যাখ্যানকেও হার্বার্ট সমর্থন

করেন নি। তাঁর মতে শিক্ষার লক্ষ্য হবে বর্তমান সামাজিক সংগঠনের মধ্যে শিশু যাতে সার্থকভাবে বাঁচতে পারে তার জন্য প্রস্তুত করা। অতএব আমাদের মনোযোগ দিতে হবে কেবলমাত্র জ্ঞানের উপর নয়, প্রকৃতির উপর নয়, এমন কি মনের ক্ষমতার উপরও নয়। মনোযোগ দিতে হবে চরিত্র এবং সামাজিক নীতিবোধের বিকাশের উপর। তাঁর মতে ধর্ম (virtue) কথাটির দ্বারাই শিক্ষার সমগ্র উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত করা যায়। ধর্ম বলতে জ্ঞানকে বোঝায় না, যদিও উপযুক্ত জ্ঞান থেকেই ধর্ম দেখা দেয়।

পেস্টালৎসীর শিক্ষাতত্ত্বের ভিত্তি ছিল নিছক ভালবাসা, সততা, স্বজনপ্রীতি। কিন্তু হার্বার্ট ছিলেন দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক এবং নির্ভুল দার্শনিক ও মনোবৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের উপর তাঁর শিক্ষাতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। দার্শনিক মতবাদে তিনি কাণ্টের স্বগোত্রীয় ছিলেন। তাঁর মতে বহু স্বতন্ত্র বাস্তব (reals) দিয়ে আমাদের এই বাস্তবতা (reality) গঠিত। ব্যক্তিগত আত্মা বা অহম্ এই ধরনের একটি বাস্তব। প্রত্যেক বাস্তবেরই ধর্ম হল যে অন্যান্য বাস্তবের প্রতিকূল প্রভাব থেকে নিজের স্বতন্ত্র প্রকৃতিটি অক্ষুণ্ণ রাখা। বস্তুত বিভিন্ন বাস্তবগুলির পরস্পরের উপর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া থেকেই অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হয়। এই প্রতিক্রিয়ার যে ফল বা প্রভাব অভিজ্ঞতায় থাকে তার নাম ভাব বা জ্ঞান (Idea)। অতএব হার্বার্টের মতে ভাব বা জ্ঞান আত্মার সঙ্গে পরিবেশের সংঘাতের ফলে সৃষ্ট হয়। এই বিভিন্ন ভাব ও সংবেদনগুলি জন্মের পর থেকে আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে এবং আমাদের পরবর্তী সমস্ত শিক্ষাকে প্রভাবিত করে। এই জ্ঞান বা ভাবগুলির মধ্যে যেগুলি আবার আমাদের সচেতনতার কেন্দ্রস্থান অধিকার করে সেগুলির প্রভাব আমাদের উপর সব চেয়ে বেশী। আবার কোন কোন জ্ঞান বা ভাব আমাদের সচেতনতার সীমারেখার নীচে চলে যায়, সেগুলি আমরা ভুলেই যাই। আমাদের অর্জিত সমস্ত জ্ঞানগুলির মধ্যে সততই সংগ্রাম চলেছে মনের কেন্দ্রস্থান অধিকার করবার জন্য। হার্বার্টের মতে দুটি বৈশিষ্ট্য কোন বিশেষ জ্ঞানকে সচেতনতার কেন্দ্রে উপস্থিত হতে সাহায্য করে। একটি হল সাদৃশ্য, অপরটি বৈসাদৃশ্য। নানা কারণে আমাদের জ্ঞান বা ভাবগুলি বিশেষ বিশেষ সম্মেলনে (combination) আবদ্ধ হয় এবং কোন্ বস্তুটির প্রতি মনোযোগ দেব এবং কোন্‌টির উপর দেব না তা নির্ভর করে এই সম্মেলনের উপর। হার্বার্ট এই নির্বাচনী প্রক্রিয়ার নাম দিয়েছেন আত্মবীক্ষণ (apperception) এবং ভাবের যে সম্মেলনটির নির্বাচন (combination) আত্মবীক্ষণে সাহায্য করে তার নাম

তিনি দিয়েছেন আত্মবীক্ষিত বস্তুপুঞ্জ (apperceptive mass)। এক কথায় আমরা যখন কোন বস্তু প্রত্যক্ষণ করি তখন সেই বস্তুটিকে আমরা প্রকৃতপক্ষে আত্মবীক্ষণ করি।

হার্বার্টের এই আত্মবীক্ষিত বস্তুপুঞ্জের মতবাদটি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ এবং এই মতবাদ থেকে পরে শিক্ষার যে পদ্ধতি-তত্ত্বটি (methodology) গড়ে ওঠে তা সব দেশের শিক্ষা প্রক্রিয়াকে বহু বৎসর ধরে প্রভাবিত করে এসেছে।

এই মতবাদ অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে আমরা কোন্ বস্তুটির প্রতি মনোযোগ দেব এবং কোন্ বস্তুটির প্রতি দেব না তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আত্মবীক্ষিত বস্তুপুঞ্জের উপর। অতএব নতুন কোন ভাব বা জ্ঞান আয়ত্ব করার কাজে ব্যক্তির মানসিক পটভূমিকার প্রকৃতি এবং সংগঠনই সবচেয়ে বড় প্রয়োজনীয় শক্তি অর্থাৎ এক কথায় নতুন জ্ঞান আমরা পুরোনো জ্ঞানের মাধ্যমে শিক্ষা করে থাকি।

হার্বার্টের পাঁচটি সোপান

এই যুক্তি থেকেই বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ হার্বার্টীয় শিক্ষাতত্ত্বটি জন্ম লাভ করেছে। সেটি হল যে শিশুর পুরোনো শিক্ষা যতদূর তাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে ঠিক সেইখান থেকেই তার নতুন শিক্ষা স্থুরু হবে। নতুন কিছু শেখবার আগে শিক্ষক ভাল করে দেখে নেবেন যে শিশুর পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতা সেই নতুন জ্ঞান বা তথ্য গ্রহণ করার পক্ষে পর্যাপ্ত কিনা। হার্বার্টের প্রসিদ্ধ আকারমূলক পাঁচটি সোপান (Five Formal Steps) তাঁর এই আত্মবীক্ষণের তত্ত্ব থেকেই জন্মলাভ করেছে এবং সম্পূর্ণভাবে পুরোনো থেকে নতুনে বা জ্ঞাত থেকে অজ্ঞাতে যাওয়ার শিক্ষানীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। নীচে এই সোপান পাঁচটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল।

১। প্রস্তুতীকরণ (Preparation)

এই ধাপে শিক্ষক এমন একটি বিষয় নিয়ে তাঁর পাঠ স্থুরু করেন যার স্বরূপ সম্বন্ধে শিশুর মধ্যে পূর্ব থেকেই পরিষ্কার জ্ঞান রয়েছে।

২। উপস্থাপন (Presentation)

এই ধাপে শিক্ষক নতুন বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করেন।

৩। অনুষঙ্গস্থাপন (Association) বা তুলনাকরণ (Comparison)

এই ধাপে শিক্ষক প্রথম দুধাপের বিষয়বস্তুর মধ্যে তুলনা করেন এবং তাদের মধ্যে কোথায় কোথায় সাদৃশ্য ও কোথায় বৈসাদৃশ্য আছে তা দেখিয়ে দেন।

এই ভাবে অনুষঙ্গস্থাপন বা তুলনার সাহায্যে শিক্ষক পুরাতন জ্ঞান ও নতুন জ্ঞানের মধ্যে একটা সমন্বয় এনে দেন।

হার্বার্টের মতে এই ধাপটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা যত ভালভাবে শিক্ষক এই অনুষঙ্গ স্থাপন করতে পারবেন, তত শিক্ষার্থীর আত্মবীক্ষণ সুদৃঢ় ও স্থায়ী হবে।

৪। সামান্যীকরণ (Generalisation)

এই সোপানে শিক্ষার্থী যে সব তথ্য বা ধারণা শিখল শিক্ষক সেগুলি সাধারণ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে শেখান। অর্থাৎ সেগুলির অন্তর্নিহিত মৌলিক তত্ত্বগুলিকে বেছে নিয়ে সেগুলি থেকে সামান্য সত্য গঠন করতে তিনি শিক্ষার্থীকে সাহায্য করেন। প্রকৃতপক্ষে এই ধাপে শিক্ষাদান কাজটির শেষ হল।

৫। অভিযোজন (Application)

পূর্বের ধাপে শিক্ষার্থী সে সব সামান্য সত্য বা মৌলিক তত্ত্ব আহরণ করল সেগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করে কতকগুলি নতুন সমস্যা সমাধান করতে শিক্ষার্থীকে দেওয়া হয়। এই ধাপে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ করা হয়।

হার্বার্টীয় শিখন-সোপানের সমালোচনা

হার্বার্টের শিক্ষাদানের এই পাঁচটি সোপান শিক্ষক মহলে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং পৃথিবীর বহুদেশের শিক্ষকগণ শিক্ষাদানের সময় এই পাঁচটি সোপান অনুসরণ করতে সুরু করেন। বিশেষ করে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষা দানকালে হার্বার্টের আত্মবীক্ষণ তত্ত্ব এবং শিক্ষাদানের পাঁচটি সোপান শিক্ষাপদ্ধতির প্রধানতম অঙ্গ বলে স্বীকৃত হয়। কিন্তু গত কয়েক দশক থেকে নানা কারণে হার্বার্টীয় পাঁচটি সোপানের মূল্য বেশ কমে এসেছে। বহু আধুনিক শিক্ষাবিদ্ এই পদ্ধতির বিরূপ সমালোচনা করেন এবং এর গুরুতর অসম্পূর্ণতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এর বিরুদ্ধে সর্বপ্রধান সমালোচনা হল এই যে শিক্ষাদান কখনও ছাঁচে ঢালা সুনির্দিষ্ট সোপান অনুসরণ করে এগোয় না। শিক্ষাদান স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। অনেকটা নির্বাধ স্রোতস্বিনীর মত শিক্ষকের মন থেকে জন্মলাভ করে এবং নিজস্ব গতিপথ ধরে এগোয়। তাকে সুনির্দিষ্ট

কোন ছাঁচে ফেলার চেষ্টা করলে তার সাবলীলতা ও স্বচ্ছন্দ গতিকেই খর্ব করা হবে।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষাদান একটি নিরবছিন্ন একক প্রক্রিয়া, একে টুকরো টুকরো করে বিভাগ করলে সে বিভাজন কৃত্রিমই হবে।

তৃতীয়ত, সাধারণভাবে প্রচলিত ক্লাসে পড়ানোর যে সময় পাওয়া যায় তাতে পাঁচটি সোপান অনুকরণ করবার চেষ্টা করলে কোন পাঠদানই সম্পূর্ণ হবে না। বিষয়বস্তুর উপস্থাপনে অর্থাৎ দ্বিতীয় সোপানে এতটা সময় কেটে যায় যে পরের সোপানগুলি অনুসরণ করার সময়ই থাকে না। এই জন্য আধুনিককালে অনেকে পাঁচটি সোপানকে কেটে ছেঁটে তিনটিতে দাঁড় করিয়েছেন, যেমন প্রস্তুতীকরণ, উপস্থাপন ও অভিযোজন। এতে অবশ্য হার্বার্টীয় সোপানকে কিছুটা বজায় রাখা হল কিন্তু হার্বার্টীয় শিক্ষাদানের মূলতত্ত্বটিকে বাদ দেওয়া হল। হার্বার্টের তৃতীয় ও চতুর্থ ধাপে অনুষঙ্গস্থাপন ও সামান্যীকরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর যে আত্মবীক্ষণ গঠিত হত সেটিই হার্বার্টের মতে শিক্ষার প্রধান সহায়ক, কিন্তু এক্ষেত্রে সেই দুটি ধাপ বাদ দেওয়াতে হার্বার্টের শিক্ষাতত্ত্বের অনেকখানি বাদ চলে গেল। হার্বার্টের সবচেয়ে বড় বিরূপ সমালোচনা করেছেন প্রসিদ্ধ আমেরিকান শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক জন ডিউই। তিনিও হার্বার্টের মত শিক্ষাগ্রহণের পাঁচটি সোপানের উল্লেখ করেছেন। যথা, (১) সক্রিয়তা (Activity), (২) সমস্যা (Problem), (৩) তথ্য (Data), (৪) বিকল্পন (Hypothesis) ও পরীক্ষণ (Testing)। ডিউই হলেন সক্রিয়তামূলক শিক্ষার প্রধানতম সমর্থক। তাঁর দেওয়া শিক্ষা সোপানগুলির প্রথম সোপানে শিক্ষার্থী একটি কর্ম সম্পাদন করে, দ্বিতীয় সোপানে সেই কর্মটি করতে করতে সে একটি সমস্যার সম্মুখীন হয়, তৃতীয় সোপানে সে সমস্যাটি সমাধান করার বিভিন্ন পন্থাগুলি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে, চতুর্থ সোপানে সে বিভিন্ন সম্ভাব্য সমাধানগুলি থেকে একটীকে বেছে নেয় এবং শেষ ধাপে সে ঐ নির্বাচিত সমাধানটী বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখে যে সেটী কার্যকরী কিনা।

হার্বার্টের পাঁচটী সোপান ও ডিউইর পাঁচটী সোপানের মধ্যে আপাতসাদৃশ্য থাকলেও, মূলগত পার্থক্য প্রচুর। ডিউইর পদ্ধতিতে সমস্ত শিক্ষাপ্রক্রিয়াটিই সুরু হয়েছে একটী সমস্যা থেকে, কিন্তু হার্বার্টের পদ্ধতিতে কোথাও কোন সমস্যার উপলব্ধি নেই। হার্বার্টের দ্বিতীয় সোপানে নতুন বিষয়বস্তু উপস্থাপিত করা হয়েছে বটে কিন্তু তার মধ্যে সমস্যা সমাধান করার কোন চাপ থাকে না, কেবলমাত্র আছে নিছক নতুন তথ্যের আহরণ। ডিউইর দ্বিতীয় সোপানেও

কতকগুলি নতুন তথ্য আহরণ করা হয় বটে কিন্তু সে তথ্য আহরণ করেই কাজ শেষ হয় না। সেগুলিকে আহরণ করা হয় সমস্যা সমাধানের জন্য। হার্বার্টের পদ্ধতিতে যে সব তথ্য পূর্বে আহরণ করা হয়েছিল সেগুলির সঙ্গে মিল করে নতুন তথ্যগুলি আহরণ করা হয়, কিন্তু ডিউইর পদ্ধতিতে নতুন তথ্য আহরণ করা হয় সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিকরূপে (incidentally) কোন বিশেষ একটী কার্য সমাধান করার মাধ্যমে। শেষ ধাপেও এই দুটি পদ্ধতির মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

হার্বার্টীয় অভিযোজনে পূর্বের ধাপগুলিতে শেখা বিশেষ একটা নীতি বা ধারণার কতটা শিক্ষার্থী শিখল তারই পরিমাপ করা হয়। তার মধ্যে অজানা বা অনিশ্চিত বলতে কোন কিছু থাকে না। কিন্তু ডিউইর পরীক্ষণ নামক ধাপটীতে একটী বিশেষ বিকল্পের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয় এবং তার ফলাফল সম্বন্ধে শিক্ষক, শিক্ষার্থী সকলেই অনিশ্চিত থাকেন। ফলে এই অবস্থায় কেবলমাত্র উপদেশ দেওয়া বা পরিচালনা করা ছাড়া শিক্ষক বেশী কিছু করতে পারেন না। কিন্তু হার্বার্টীয় পদ্ধতিতে শিক্ষকের কাছে শিক্ষণীয় বস্তুটির সবটুকু আগে থেকেই জানা থাকে বলে তিনি ক্লাসেতে অধিনায়করূপে বিরাজ করতে পারেন। কিন্তু ডিউইর পদ্ধতিতে তিনি শিক্ষার্থীদের সহায়ক, উপদেশদাতা ও সহকর্মী মাত্র।

কৃষ্টি-যুগ (Culture-Epoch) তত্ত্ব

পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রেও হার্বার্ট তাঁর আত্মবীক্ষণ-তত্ত্বের প্রয়োগ করেছেন। তার মতে পাঠক্রমে এমন ভাবে বিষয়গুলিকে সাজান হবে যাতে শিক্ষার্থী পরিচিত বিষয়বস্তু থেকে অপরিচিত বস্তুতে যেতে পারে। পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্ণয়ে হেগেলের মত হার্বার্টও ইতিহাস পাঠের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। হার্বার্ট প্রসিদ্ধ কৃষ্টি-যুগ তত্ত্বের (Culture-Epoch Theory) প্রবর্তন করেন এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটীর প্রথম প্রয়োগ করেন। এই তত্ত্বটীর অর্থ হল যে সুদীর্ঘ ক্রমবিবর্তনের পথে মনুষ্যজাতি যে সব বিভিন্ন ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছিল এবং যে সব বিভিন্ন কৃষ্টিমূলক যুগ বা স্তর মানবের সম্মিলিত ভাগ্যকে নির্ধারিত করেছিল, সেই বিচিত্র কৃষ্টিমূলক অভিজ্ঞতাই শিশুর শিক্ষায় পুনরাবৃত্তি করাই তার যথোচিত বিকাশের পক্ষে অনুকূল। এই জন্য জাতির বিবর্তনের বিভিন্ন কৃষ্টিমূলক স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিশুর পাঠক্রমে কার্যাবলীর

সন্নিবেশ করাই হার্বার্টের মতে পাঠক্রম রচনার মনোবিজ্ঞানসম্মত পন্থা। হার্বার্টের এই নীতি কালক্রমে বহু শিক্ষাবিদকে প্রভাবিত করে এবং বহুদেশের পাঠক্রম রচনার মূলনীতিরূপে গৃহীত হয় বর্তমানে এ তত্ত্বটী একরকম পরিত্যক্ত হয়েছে বললেই চলে।

হার্বার্ট ছিলেন একজন বাস্তববাদী। ভাববাদীদের (Idealist) মতে শিক্ষা আসে মানুষের অভ্যন্তর থেকে, বাইরের বস্তু জগতের উপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু হার্বার্টের মতে বাইরের বস্তু জগতের সঙ্গে আত্মার পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলরূপে শিক্ষা দেখা দেয়। এর ফলে স্পষ্টতই সিদ্ধান্ত করা যায় যে শিক্ষার্থীর সামনে যে ধরনের বাইরের জগতের বস্তু উপস্থাপিত করা যায় সেগুলির নির্বাচনের উপর নির্ভর করে শিক্ষার প্রকৃতি ও ফলাফল। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর বাইরের বস্তু বা পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে শিক্ষক শিক্ষার্থীর শিক্ষাকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। হার্বার্টের এই সিদ্ধান্তটী যে শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একথা বলা বাহুল্য। এতে শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শিক্ষক যে প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী এইটিই প্রমাণিত হয়। হার্বার্টের এই তত্ত্বটির অনেকেই তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে তত্ত্বটির দ্বারা শিক্ষার্থীর স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করা হয়। এবং শিক্ষা প্রক্রিয়াটিই যান্ত্রিক হয়ে ওঠে। কিন্তু এ ধরনের বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও ইউরোপ ও আমেরিকায় হার্বার্টের মতবাদ যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

হার্বার্টের আগ্রহতত্ত্ব

হার্বার্টের আত্মবীক্ষণ তত্ত্বের (Theory of apperception) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক অনুসিদ্ধান্তটি হল আগ্রহের তত্ত্বটি (Theory of Interest)। চিরকালই সব শিক্ষাবিদ দেখে এসেছেন যে শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শিশুর আগ্রহ তৈরী করাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। আগ্রহ ও প্রচেষ্টা (effort) এ দুটিকে তাঁরা শিখন প্রক্রিয়ায় দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু বলে মনে করে এসেছেন। তাঁদের মতে প্রথমটি হল অধিকতর কার্যকরী কিন্তু শিশুর খেয়ালী প্রকৃতির জন্য এটি সব সময় পাওয়া শক্ত। আর দ্বিতীয়টি কম কার্যকরী কিন্তু শিক্ষক ইচ্ছা করলে নানা উপায়ে শিশুর মধ্যে প্রচেষ্টা সৃষ্টি করতে পারেন। তিনি যখন দেখেন যে কোন বিশেষ পাঠে শিক্ষার্থীর আগ্রহ নেই তখন তিনি শিশুকে চেষ্টা করতে বাধ্য

করেন। অর্থাৎ প্রচলিত মতানুযায়ী আগ্রহের অভাবকেই পূরণ করা হয় প্রচেষ্টা দিয়ে। কিন্তু হার্বাট আগ্রহের একটি নতুন তত্ত্ব উপস্থাপিত করলেন। তাঁর মতে শিক্ষার্থীর খেয়াল বা খুসী থেকে আগ্রহ জন্মায় না। শিক্ষার্থীর সামনে যে সব ভাব বা বস্তু উপস্থাপিত করা হয় সেগুলির প্রত্যেকটিই শিশুর মনে স্থান করে নেবার জন্য চেষ্টা করে এবং তার ফলে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। শিক্ষা হল এই ভাব বা বস্তুগুলির পারম্পরিক প্রতিক্রিয়ার সম্মিলিত ফল। অতএব শেখার আগ্রহ বা প্রেষণা (motivation) নির্ভর করে এই প্রতিক্রিয়ার উপর এবং যখনই উপস্থাপিত বস্তু বা ভাবের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পুরাতন বস্তু বা ভাবের সাদৃশ্য থাকে তখনই সেই বস্তু বা ভাবটির প্রতি শিশুর আগ্রহ জন্মায়। অতএব আগ্রহ হল শিক্ষার্থীর মনে পুরাতন ভাব বা ধারণা কর্তৃক নতুন ভাব বা ধারণা গ্রহণ করার প্রবণতা বা প্রচেষ্টা। অতএব প্রাচীন শিক্ষাবিদেরা যে আগ্রহকে শিক্ষার একটি বাহ্যিক উপাদান বলে মনে করতেন সেটা একান্তই ভুল। হার্বাটের মতে শিক্ষার সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয় উপকরণ হল আগ্রহ। আগ্রহ ছাড়া শিক্ষা হয়ই না এবং হলেও তা হয় অত্যন্ত দুর্বল ও ক্ষণস্থায়ী। হার্বাট আগ্রহকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, স্বতঃপ্রসূত ও আরোপিত। যেখানে শিক্ষার্থীর আভ্যন্তরীণ ভাবগুলি নিজে নিজেই নতুন ভাবকে গ্রহণ করে নেয় সেখানে আগ্রহ হল স্বতঃপ্রসূত। আর যেখানে উপদেশ শিক্ষণ ইত্যাদির দ্বারা শিশুর মধ্যে নতুন শিক্ষাগ্রহণ করার আগ্রহকে সৃষ্টি করা হয় সেখানে আগ্রহ হল আরোপিত। হার্বাটের মতে স্বতঃপ্রসূতই হোক আর আরোপিত হোক আগ্রহ ছাড়া শিক্ষা হয় না।

হার্বাটের পূর্বগামী শিক্ষাবিদগণের তুলনায় যদিও হার্বাটের আগ্রহতত্ত্বটি যথেষ্ট নতুন ও উন্নত, তবু আধুনিক শিক্ষাবিদগণ বিশেষ করে প্রসিদ্ধ আমেরিকান শিক্ষাবিদ জন ডিউই এই তত্ত্বটির সমালোচনা করেছেন। হার্বাটের এই আত্মবীক্ষণমূলক আগ্রহতত্ত্বের বিরুদ্ধে ডিউইর প্রধান আপত্তি হল যে হার্বাট যে ভাবে বিভিন্ন ভাব বা ধারণার অন্তঃসংঘাত থেকে আগ্রহের জন্ম হয় বলে বর্ণনা করেছেন তাতে আগ্রহ একটি যান্ত্রিক শক্তি ছাড়া আর বেশী কিছুতেই দাঁড়ায় না। অতএব এ অবস্থায় আগ্রহ একটি সত্যকারের স্বতঃপ্রসূত বস্তুও হতে পারে না, আবার শিক্ষণ বা উপদেশ দিয়েও তাকে সৃষ্টি করাও যায় না। তার ফলে আগ্রহ শিক্ষার প্রেষণারূপে কখনই কাজ করতে পারে না।

আগ্রহের সর্বাধুনিক তত্ত্ব দিয়েছেন জন ডিউই। তাঁর মতে ভিতরের

অহংসত্তার উপর বাইরের পরিবেশের প্রতিক্রিয়া থেকে আগ্রহ জন্মায় না। হার্বার্টের প্রদত্ত বর্ণনানুযায়ী শিক্ষার্থীর অহংসত্তা একটি গতিহীন বস্তু। কিন্তু ডিউইর মতে শিক্ষার্থীর অহংসত্তা ক্রিয়াশীল এবং গতিময়। বাইরের বস্তু যেমন সক্রিয়ভাবে শিক্ষার্থীর অহংসত্তাকে প্রভাবিত করে তেমনই শিক্ষার্থীর অহংসত্তাও সক্রিয়ভাবে পরিবেশের শক্তির প্রতি সাড়া দেয়। যখন কোন একটি বহির্জগতের বস্তুকে গ্রহণ করতে ব্যক্তির অহংসত্তা স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে এগিয়ে আসে তখনই শিক্ষার্থীর সত্যকারের আগ্রহ দেখা দিয়েছে বলা হয়। অর্থাৎ ডিউইর মতে শিক্ষার্থীর অহংসত্তার স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে বহিরাগমনের নামই আগ্রহ। এই অহংসত্তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার পক্ষে যে বস্তু বা ভাবধারা অনুকূল তারই প্রতিই শিক্ষার্থী আগ্রহ অনুভব করে। অতএব আগ্রহ বস্তু বা ভাবের সংঘাতের উপর নির্ভর করে না, করে শিক্ষার্থীর সত্তার চাহিদার প্রকৃতি ও তার পূর্ণতার উপর। আগ্রহ সকল সময়েই স্বতঃপ্রণোদিত, কখনও কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট বা বাইরে থেকে আরোপিত হতে পারে না। আর যখন আগ্রহ সৃষ্ট হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয় প্রচেষ্টা। অতএব প্রচেষ্টা আগ্রহের বিরোধী নয়, সহায়ক ও সম্পূরক। আগ্রহ যেমন বাড়ে, প্রচেষ্টাও সেই অনুপাতে বেড়ে যায়।

হার্বার্টের অনুবন্ধতত্ত্ব (Doctrine of Correlation)

হার্বার্টের শিক্ষাপদ্ধতির মূলকথা হল এই যে পাঠ্যবিষয়টিকে এমনভাবে উপস্থাপিত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর মানসিক সংগঠন সেটিকে বিনা আয়াসে গ্রহণ করে নিতে পারে এবং মনের পূর্ব আহরিত অভিজ্ঞতাপুঞ্জের সঙ্গে মিলিয়ে এক করে নিতে পারে। আগ্রহের প্রয়োজনও এই একই কারণে। আগ্রহ কেবল যে শিক্ষার্থীর পাঠে মনোযোগই আনবে তা নয়, আগ্রহ এই নতুন পাঠকে শিক্ষার্থীর মানসিক সংগঠনের অঙ্গীভূত করতে সাহায্য করবে।

এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে শিক্ষককে দুটি জিনিষের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। প্রথম, উপযুক্ত পাঠ্যবিষয়ের নির্বাচন এবং দ্বিতীয় সেই পাঠ্যবিষয় উপস্থাপনের উপযুক্ত পদ্ধতির অনুসরণ।

উপযুক্ত পাঠ্যবিষয় নির্বাচন প্রসঙ্গে হার্বার্ট কৃষ্টি-যুগ তত্ত্বের (Culture Epoch

Theory) অবতারণা করেন। তাঁর মতে শিশুর বিভিন্ন বয়সের পাঠ্যবস্তু নির্বাচিত করতে হবে মানবজাতির অগ্রগতির বিভিন্ন স্তরের অভিজ্ঞতা ও আগ্রহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে।

আর সেই পাঠ্যবিষয় শেখানোর উপযুক্ত পদ্ধতির অনুসরণ প্রসঙ্গে হার্বার্ট আর একটি তত্ত্বের অবতারণা করেন। সেটি হল অনুবন্ধ তত্ত্ব (Doctrine of Correlation)। এই তত্ত্বটির অর্থ হচ্ছে যে পাঠ্যবিষয়গুলি যদিও বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র তবু এগুলির মধ্যে যে মৌলিক ঐক্য এবং আঙ্গিক যোগসূত্র বর্তমান এটি শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থী যেন পাঠ্যবিষয়গুলির আকারগত বিভিন্নতা সত্ত্বেও সেগুলিকে একটি একক সত্তার বিভিন্ন অংশ বলে মনে করে আয়ত্ত করতে পারে। অনুবন্ধ পদ্ধতিতে পাঠদানের সময় বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়গুলিকে গ্রন্থিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়। এ পদ্ধতিরই একটি বিশেষ প্রকারের নাম কেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি (Concentration Method)। এই পদ্ধতিতে একটি কেন্দ্রীয় বিষয়কে (core subject) মধ্যে রেখে তার সঙ্গে অন্যান্য পাঠ্যবিষয়গুলিকে গ্রন্থিবদ্ধ করা হয়। এই কেন্দ্রীয় বিষয়টি হার্বার্ট ও তাঁর অনুগামীদের মতে হয় সাহিত্য হবে, নয় ইতিহাস ও সাহিত্যের মিশ্রিত একটি পাঠক্রম হবে। (৬৯-৭১ পাতা দ্রষ্টব্য)

হার্বার্টের শিক্ষায় অবদান

(ক) হার্বার্টই প্রথম শিক্ষাকে সত্যকারের দর্শনমূলক ও মনোবিজ্ঞানমূলক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। রুশো বা পেষ্টালৎসী যা অনুভব করেছিলেন, হার্বার্ট তার বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন।

(খ) হার্বার্টই প্রথম শিখনপ্রক্রিয়ার মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন এবং শিখনের সার্থক ও কার্যকরী পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন।

(গ) হার্বার্টের সবচেয়ে বড় দান হল পদ্ধতিতত্ত্বের ক্ষেত্রে। ইতিপূর্বে শিক্ষার পদ্ধতি নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সত্যকার বাস্তব-ভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতি কেউ দিতে পারেন নি। হার্বার্টই প্রথম উপযুক্ত শিক্ষাপদ্ধতির অপরিহার্যতার উপর জোর দেন এবং একটি সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। আজকের সুসমৃদ্ধ চিন্তাধারা ও প্রগতিশীল পরীক্ষণ ও গবেষণার বিচারে

হার্বাটের পদ্ধতির মধ্যে অনেক ত্রুটি পাওয়া গেলেও শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত মতামত, সুদীর্ঘ পরীক্ষণ ও মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পরবর্তীকালের শিক্ষার পদ্ধতিতত্ত্বের (methodology) গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছে। ডিউই, কিলপ্যাট্রিক প্রভৃতি পরবর্তীযুগের শিক্ষাবিদ্‌গণের পদ্ধতি-মূলক গবেষণায় হার্বাটের সমৃদ্ধ চিন্তাধারা অন্তঃপ্রেরণা ও উপকরণ দুইই জুগিয়েছিল।

(ঘ) হার্বাটের আগ্রহ-তত্ত্বও শিক্ষায় তাঁর একটি বিশেষ অবদান। আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষায় আগ্রহকে শিক্ষাদানের প্রধানতম ভিত্তি বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। শিক্ষায় আগ্রহের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা সম্বন্ধে হার্বাটই প্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আগ্রহের স্বরূপ বিশ্লেষণে হার্বাটের ত্রুটি থাকলেও তিনিই প্রথম শিক্ষাকে আগ্রহ-ভিত্তিক করার নির্দেশ দিয়ে যান। তাঁর পরবর্তী-কালে যে সব শিক্ষাবিদ্ দেখা দেন তাঁরা প্রত্যেকেই হার্বাটের এই আগ্রহের তত্ত্বটিকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে মেনে নিয়েছিলেন।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the major contribution of Herbart in Education.

2. "What Rousseau and Froebel felt, Herbart put them into effect." Discuss.

3. Discuss Herbart's contribution to methodology of education and evaluate the merit of the Five Formal Steps of teaching invented by him.

4. Write notes on Correlation, Apperception and Apperceptive Mass, Culture Epoch Theory.

একুশ

ফ্রেডরিক ফ্রয়েবেল (Freidrich Froebel)

শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিক করার আন্দোলনে যে কয়জন শিক্ষাবিদ্‌কে পুরোগামী বলে ধরা হয় তাঁদের মধ্যে ফ্রয়েবেল হলেন একজন। হার্বার্টের মত ফ্রয়েবেলও ছিলেন জার্মান এবং তাঁরই সমসাময়িক। তিনি পেষ্টালৎসীর এক-প্রকার সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন এবং কয়েক বৎসর তাঁর কাছে থেকে তাঁর অভিনব শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। বস্তুত ফ্রয়েবেলের শিক্ষা সংস্কারের পেছনে সম্পূর্ণ অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল পেষ্টালৎসীর শিক্ষার নবীন আদর্শ।

ফ্রয়েবেল জন্মগ্রহণ করেন ১৭৮২ সালে। তিনি প্রথম যৌবনে নানা ধরনের কাজ বিক্ষিপ্তভাবে করতে করতে নিতান্ত আকস্মিকভাবে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন এবং উপলব্ধি করেন যে শিক্ষকতাবৃত্তিই তাঁর যথার্থ উপযোগী বৃত্তি। এর পর ১৮০৮ সালে তিনি পেষ্টালৎসীর সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসেন এবং তাঁর কাছ থেকেই প্রগতিশীল শিক্ষাসম্পর্কে তাঁর প্রথম অভিজ্ঞতা হয়।

পেষ্টালৎসীর নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় ফ্রয়েবেল যথেষ্ট প্রভাবিত হলেও তিনি তার দ্বারা পরিপূর্ণভাবে তৃপ্ত হতে পারেন নি। এর কারণ ছিল ফ্রয়েবেলের গভীর দার্শনিক অনুভূতি। মানুষের অস্তিত্ব, জীবন, কর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর একটি নিজস্ব দার্শনিক সংব্যাখ্যান ছিল। তিনি পেষ্টালৎসীর শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে তাঁর সে দার্শনিক সংব্যাখ্যানকে মূর্তরূপ দেবার স্বপ্ন দেখেছিলেন।

১৮১৬ সালে তিনি প্রথম নিজস্ব স্কুল খোলেন। স্কুলটি মূলগতভাবে পেষ্টালৎসীর নীতি ও পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে গান, খেলা এবং নানাবিধ কাজই ছিল স্কুলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যদিও স্কুলটির আদর্শ যথেষ্ট উন্নত ও আধুনিক ছিল, তবু অর্থের অভাবে স্কুলটি ১৮২৬ সালে উঠে যায়। স্কুলটি উঠে গেলেও এ দীর্ঘ দশবৎসরে ফ্রয়েবেলের শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি নিজস্ব সুনির্দিষ্ট মতবাদ গড়ে ওঠে এবং ১৮২৬ সালে তাঁর প্রসিদ্ধ বই 'দি এডুকেশন অফ ম্যান' (The Education of Man) বেরোয়।

আরও কয়েক বৎসর কেটে যায়। ফ্রয়েবেল ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেন যে সমগ্র স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থাটাই উপযুক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং সেজন্য প্রয়োজন নার্সারি বা অতিশৈশব স্তরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা। তার ফলে ১৮৩৭ সালে ফ্রয়েবেল ব্লান্‌কেন্‌বার্গের একটি ছোট সহরে তিন থেকে আট বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপন করলেন। স্কুলটির তিনি নাম দিলেন কিণ্ডারগার্টেন (Kindergarten) বা ছেলেমেয়েদের বাগান। আজ এই কিণ্ডারগার্টেন নামটি পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশের শব্দমালার অঙ্গীভূত হয়ে উঠেছে।

ফ্রয়েবেলের শিক্ষাতত্ত্ব

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জার্মাণীতে কাণ্ট, হেগেল, ফিক্‌টে প্রভৃতি কয়েকজন অতিবিখ্যাত দার্শনিকের আবির্ভাব হয়। এঁদেশে দার্শনিক মতবাদ ফ্রয়েবেলের মাধ্যমে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশলাভ করে।

আত্মসক্রিয়তার (Self-activity) তত্ত্ব ও খেলা

হেগেলের দার্শনিক তত্ত্বের মূলকথা হল সর্ববস্তুর চিরন্তন ঐক্য বা অভিন্নতা। দৃশ্যমান জগৎ যদিও অসংখ্য বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন বস্তু নিয়ে গঠিত, তবু সেগুলি সমস্তই একটি সর্বব্যাপী পরমসত্তার অঙ্গীভূত। ফ্রয়েবেলের শিক্ষাতত্ত্বও সুরু হয় সর্ববস্তুর এই চিরন্তন ঐক্য বা অভিন্নতা দিয়ে। মানুষের জীবনের লক্ষ্য হল তার অন্তরবাসী এই স্বর্গীয় একতাকে উপলব্ধি করা এবং তাকে বিকশিত করা। অতএব শিক্ষার লক্ষ্যও তাই। এর জন্য কোন বাইরের প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই। শিশুর অন্তরগত বা সহজাত প্রকৃতিই পূর্ব থেকেই এই লক্ষ্যের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে, কেননা তার অপরিহার্য ধর্মই হল প্রচেষ্টামূলক স্বয়ংক্রিয়তা। বস্তুত শিশুর মধ্যে সক্রিয়তা আছে একথা বললে কমই বলা হয়, শিশু নিজেই হল সক্রিয়তা তাকে সক্রিয় করার জন্য কোনরূপ বাহিক প্রচেষ্টা বা উৎসাহদানের প্রয়োজন নেই, কারণ সে নিজেই এবং স্বাভাবিকভাবেই সক্রিয়।

শিশুর এই আভ্যন্তরীণ সক্রিয়তার প্রতি শ্রদ্ধার জন্যেই ফ্রয়েবেল হলেন প্রথম শিক্ষাবিদ যিনি শিশুর খেলার শিক্ষামূলক গুরুত্বটা প্রথম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ফ্রয়েবেলের আগে খেলা সম্বন্ধে বিভিন্ন শিক্ষাবিদেরা বিভিন্ন প্রকৃতির অভিমত পোষণ করতেন। একদল খেলাকে স্কুলের বাইরে নির্দোষ চিত্তবিনোদনের মাধ্যম বলে মনে করতেন এবং এর মন্দ বা ভাল কোনরূপই মূল্য দিতেন না। আবার যাঁরা ছিলেন অতি গোঁড়া শিক্ষাবিদ্ তাঁরা খেলাকে অলস ব্যক্তির প্রতি শয়তানের প্রলোভন বলে মনে করতেন এবং সব দিক দিয়ে খেলাকে বর্জন করার বিধান দিতেন। লক (Locke), বেসডউ (Basedow) প্রভৃতি শিক্ষাবিদেরা শিক্ষাব্যবস্থায় খেলার প্রবর্তন করার প্রস্তাব করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা কোন অপ্রীতিকর বা নীরস বিষয়বস্তু শেখবার সময় শিশুকে প্রলুব্ধ করার উপকরণরূপেই খেলাকে গণ্য করতেন। এক কথায় ফ্রয়েবেলের আগে সমস্ত শিক্ষাবিদেরা খেলাকে অবহেলা করেই এসেছেন এবং খেলার কোনও শিক্ষামূলক দিক বা সম্ভাবনা থাকতে পারে একথা তাঁরা একেবারেই ভাবেন নি।

ফ্রয়েবেলই প্রথম খেলাকে দার্শনিক যুক্তির দ্বারা সমর্থন করেন। খেলাকে তিনি শিশুর আত্ম-সক্রিয়তার অভিব্যক্তি বা স্বাভাবিক প্রকাশ বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে আত্মোপলব্ধিলাভের যে আভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টা ব্যক্তির মধ্যে দেখা দেয় খেলা হল তারই বাহ্যিক অভিব্যক্তি। ফ্রয়েবেলের এই যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে খেলা শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য ; অতএব তার শিক্ষামূলক গুরুত্ব অপরিসীম।

আধ্যাত্মিক একতা (Divine Unity)

ফ্রয়েবেলের দার্শনিক মতবাদ অনুযায়ী মানব অস্তিত্বের সার্থকতা হচ্ছে বিশ্বের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক একতাকে (Divine unity) উপলব্ধি করায়। আবার এই আধ্যাত্মিক একতাকে উপলব্ধি করা এবং নিজের অন্তরস্থিত আত্মা বা পরমসত্তাকে উপলব্ধি করা একই কথা। এই পরম আত্মোপলব্ধিই হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা। ফ্রয়েবেলের মতে শিশুর আভ্যন্তরীণ বহিঃপ্রকাশের তাড়না যত বেশী বাহ্যিক অভিব্যক্তির সঙ্গে সংযোগ (Connectedness) স্থাপন করতে সমর্থ হয় তত তার এই আত্মোপলব্ধি বা শিক্ষা ত্বরান্বিত হয়, ততই সে তার জীবনের

মধ্যে দিয়ে আধ্যাত্মিক সর্বময় একতাকে প্রকাশ করতে পারে। ফ্রয়েবেল এরই নাম দিয়েছেন "অন্তরকে বাহির করা এবং বাহিরকে অন্তর করা" (Making inner outer and outer inner)। (খেলা হল এমন একটি মাধ্যম যার মধ্যে দিয়ে আভ্যন্তরীণ অভিব্যক্তির ইচ্ছা বাইরে রূপান্তরিত হতে পারে। অতএব খেলা হল শিশুর শিক্ষা বা আত্মোপলব্ধির প্রধানতম উপকরণ।

কেবলমাত্র সক্রিয়তার সাহায্যেই যে খেলা শিশুর পরমসত্তাকে জাগিয়ে তোলে তা নয়, শিশুর অন্তরগত আধ্যাত্মিক একতার প্রতীক (symbol) রূপেও খেলা কাজ করে থাকে।) এই থেকে ফ্রয়েবেলের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতীক ব্যবহারের প্রথাটির প্রচলন হয়েছে। তাঁর কিণ্ডারগার্টেনে তিনি এমন সব খেলার উদ্ভাবন করেন এবং এমন সব খেলার সামগ্রীর প্রচলন করেন যেগুলি শিশুদের কাছে প্রতীকরূপে বিশেষ অর্থবোধক হয়ে দাঁড়ায়।

উন্মেষণ (Unfoldment) তত্ত্ব

(এই আধ্যাত্মিক একতার উপলব্ধি বা আত্মোপলব্ধি কয়েকটি ক্রমবিকাশের স্তরের মধ্যে দিয়ে দেখা দেয়। ফ্রয়েবেল এই প্রক্রিয়াটির নাম দিয়েছেন উন্মেষণ (unfoldment)।) শিশু ভবিষ্যতে যা হবে তা শিশুর মধ্যে প্রথম থেকেই নিহিত থাকে এবং শিশু তার সেই ভবিষ্যৎ পরিণতিতে পৌঁছয় ভিতর থেকে এই বহির্মুখী ক্রমবিকাশের মাধ্যমে। এককথায় যা ভিতরে ছিল মুদিত (enfolded) অবস্থায় তা ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে উন্মেষিত (unfolded)। শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ, তার শিক্ষা—সবই এই উন্মেষণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সমার্থক। অর্থাৎ এককথায় শিক্ষাই হল উন্মেষণ।

শিক্ষাকে উন্মেষণ রূপে বর্ণনা করার ফলেই ফ্রয়েবেল উদ্ভিদজীবনের বৃদ্ধির সঙ্গে শিশুর বৃদ্ধির তুলনা করেন। ফ্রয়েবেলের পূর্বে কমেনিয়াসও একই ধরনের কথা বলেছিলেন কিন্তু ফ্রয়েবেলই এই তত্ত্বটীকে বিশেষভাবে পরিপুষ্ট করেন এবং তাঁর প্রসিদ্ধ কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাব্যবস্থায় এই তত্ত্বটিকে বাস্তবে প্রয়োগ করেন।

(শিক্ষার এই উন্মেষণ তত্ত্বটি পুরোপুরি ভাববাদ (idealism) দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।) প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটলের মতে বিশ্বের সব কিছুর বিকাশ বা বিবর্তন উদ্দেশ্যমূলক এবং বিশেষ লক্ষ্য-উদ্দিষ্ট (teleological)। অর্থাৎ

সমস্ত বিকাশেরই চরম লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য তার অঙ্কুরের মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত অবস্থায় নিহিত থাকে। ফ্রয়েবেলের শিক্ষার উন্মেষণ তত্বটীও অনুরূপ ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। শিশুর ভবিষ্যৎ পরিণতির সুনির্দিষ্ট ও সুসম্পূর্ণ রূপটী তার মধ্যে নিহিত থাকে, যেমন থাকে পূর্ণ-পরিণত আমগাছটির সুসম্পূর্ণ রূপটি তার ছোট বীজটির মধ্যে অদৃশ্য অবস্থায় অন্তর্নিহিত।

(ফ্রয়েবেলের এই উন্মেষণ তত্ত্বটির পরে বহু শিক্ষাবিদ বিরূপ সমালোচনা করেছেন। প্রথমত, এই তত্ত্ব অনুসারে শিশুর বিকাশে পরিবেশের কোন প্রভাবই নেই, সব কিছুই বংশধারা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। যেহেতু শিশুর চরম পরিণতি তার মধ্যে জন্ম থেকেই নিহিত থাকে, সেহেতু পরিবেশের কোন শক্তিই তার মধ্যে কোন পরিবর্তন আনতে পারে না। কিন্তু একথা পরীক্ষণলব্ধ তথ্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। শিশুর বিকাশে ও তার পরিণতির প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে বংশধারা ও পরিবেশ উভয়েরই অবদান সমান গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, এই তত্ত্বে পরিবর্তনের কোন মূল্য স্বীকার করা হচ্ছে না। যাকে আমরা পরিবর্তন বলে মনে করেছি প্রকৃতপক্ষে সেটি পূর্বনির্ধারিত একটি ঘটনা মাত্র। তার মধ্যে কোন নতুনত্ব বা অনিশ্চয়তা নেই। আর পরিবর্তন যখন নেই, তখন অগ্রগতি বলে কোন বস্তুই নেই। সবই পৃথিবীতে ঘটছে পূর্বনির্দিষ্ট অপরিবর্তনীয় ঘটনার ধারা অনুসরণ করে, সত্যকারের নতুন বা অপ্রত্যাশিত কিছুই ঘটছে না।

তৃতীয়ত, উন্মেষণ তত্ত্বে বিশ্বাসী হলে শিক্ষার কোন গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা থাকে না। শিশুর পরিণতি পূর্বনির্দিষ্ট ও স্থিরীকৃত। অতএব শিক্ষা দেওয়া হোক আর না হোক, শিশু তার লক্ষ্যে ঠিক গিয়ে পৌছবে। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা না থাকলে শিক্ষকেরও প্রয়োজনীয়তা নেই।) পূর্ব থেকেই সুনির্দিষ্ট ও স্থিরীকৃত বিকাশ প্রক্রিয়ায় তাঁর সক্রিয়তা কতটুকু আর থাকতে পারে? এই শেষ সিদ্ধান্তটুকু কিন্তু ফ্রয়েবেল ভালভাবে মেনে নিতে পারেননি এবং বহু দার্শনিক যুক্তির দ্বারা তিনি শিক্ষায় শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

ফ্রয়েবেলের শিক্ষাপদ্ধতি ও কিণ্ডারগার্টেন

পেষ্টালৎসীর বস্তুভিত্তিক পাঠের (Object Lesson) পদ্ধতিটিই ফ্রয়েবেল নিজের প্রয়োজনমত পরিবর্তিত করে গ্রহণ করেন। পেষ্টালৎসী বহুবিধ মূর্তবস্তু

শিশুর সামনে উপস্থাপিত করতেন যাতে শিশু সেগুলির সংস্পর্শে এসে তার ইন্দ্রিয়শক্তির চর্চা করতে পারে। কিন্তু ফ্রয়েবেল বহু বস্তুর পরিবর্তে কতকগুলি বিশেষ ধরনের এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক মূর্ত বস্তুর প্রবর্তন করেন। এগুলিই হল তাঁর প্রসিদ্ধ উপহার (gift) এবং কাজ (occupation) নামে খ্যাত। ফ্রয়েবেলের উপহারগুলি আকারের দিক দিয়ে বিশেষ কতকগুলি গুণসম্পন্ন এবং সেগুলির আকৃতি বিশেষ বিশেষ বস্তুর প্রতীকরূপে শিশুর কাছে প্রতীয়মান হয়। যেমন কিণ্ডারগার্টেনে বল কেবলমাত্র খেলার সামগ্রীরূপে শিশুকে দেওয়া হয় না, কিংবা গোলাকৃতির ধারণা দেবার জন্যও দেওয়া হয় না, দেওয়া হয় তার মনে স্বর্গীয় সর্বব্যাপী একতার ধারণা জন্মাতে। তেমনই কিউব বা ঘন-আকৃতির বস্তু দেওয়া হয় 'বলে'র ঠিক বিপরীত ধারণাটি জন্মাতে এবং এ দুই বিপরীত ধারণার মিল ঘটিয়ে তৃতীয় ধারণার সৃষ্টি করার জন্য দেওয়া হয় বেলনাকারের বস্তু (cylinder)। কিণ্ডারগার্টেনের বৃত্তাকারে ছেলেমেয়েদের সম্মিলিত হওয়ার বিখ্যাত প্রথাটিও ঐ সর্বব্যাপী একতার ধারণা দেবার জন্যই প্রবর্তিত।

ফ্রয়েবেলের শিক্ষাপদ্ধতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল ছেলেমেয়েদের মধ্যে সমাজধর্মী সহযোগিতা আনা। পেষ্টালৎসীও স্কুলে বাড়ীর আবহাওয়া সৃষ্টি করে শিক্ষায় সামাজিক দিকটার গুরুত্ব স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু ফ্রয়েবেলই প্রথম স্কুলকে সমাজধর্মী করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর আধ্যাত্মিক একতার ধারণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ফ্রয়েবেল ছেলেমেয়েদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে একতা আনার পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর মতে শিশু একা হলেও সে আর দশজনের মত একটা বিরাট সত্তার অন্তর্গত অংশবিশেষ এটুকু জানা শিশুর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। তার ফলে যৌথকর্ম, সম্মিলিত প্রচেষ্টা ইত্যাদি ফ্রয়েবেলের কিণ্ডারগার্টেনে অপরিহার্যভাবেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং এই থেকেই এক আধুনিক ও অতি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতি জন্মলাভ করেছে। আধুনিক কালের বিদ্যালয়কে সমাজের প্রতিচ্ছবি করার মতবাদটি সার্থকভাবে রূপ পেয়েছে ফ্রয়েবেলের কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা ব্যবস্থায়।

বলাবাহুল্য সক্রিয়তা বা ফ্রয়েবেলের ভাষায় বলতে গেলে আত্মসক্রিয়তা তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির আর এক অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। যেহেতু এই আত্মসক্রিয়তা স্বাভাবিকভাবে আত্মপ্রকাশ করবে শিশুর খেলা ও স্বতঃপ্রণোদিত কাজের মধ্যে

দিয়ে, সেহেতু চলাফেরা, খেলা, গান, ছবি আঁকা, গল্প বলা ইত্যাদি বহুবিধ কাজ শিশুর দৈনিক অভিজ্ঞতার অন্তর্গত ছিল।

তাঁর কিণ্ডারগার্টেনে তিন রকমের উপকরণ ব্যবহৃত হত, মাদার প্লে (Mother play), নার্সারি গান এবং উপহার ও কাজ। উপহার ও কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের সৃজনীশক্তি বাড়বে। উপহার হল বল, কিউব, সিলিণ্ডার ইত্যাদি। এগুলির আকৃতি অপরিবর্তনীয় এবং এগুলি শিশুর সঞ্চালনমূলক অভিব্যক্তিকে সাহায্য করবে। কাজগুলি হল পরিবর্তনশীল আকারের বস্তু যেমন মাটি, বালি, কার্ডবোর্ড ইত্যাদি। কিণ্ডারগার্টেনে অবশ্য সবচেয়ে প্রভাবশালী উপকরণ হল গল্প। এগুলি শিশুদের মন থেকে সুরু করে তাদের ভাষা, গান, খেলা সকল বস্তুকেই প্রভাবিত করে।

ফ্রয়েবেল হাতের কাজের উপরও প্রচুর গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং তাঁর কিণ্ডার-গার্টেনের পাঠক্রমে হাতের কাজ একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছিল। রুশো হাতের কাজকে সমর্থন করেছিলেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে এবং পেষ্টালৎসী সমর্থন করেছিলেন ইন্দ্রিয়চর্চার জন্য। ফ্রয়েবেল সমর্থন করেছিলেন হাতের কাজের মধ্যে দিয়ে শিশুর সৃজন আকাঙ্খা তৃপ্তি পাবে বলে।

পেষ্টালৎসীর মত ফ্রয়েবেলও প্রকৃতিবীক্ষণকে (Nature Study) শিক্ষার অঙ্গ করেছিলেন। পেষ্টালৎসী করেছিলেন প্রকৃতি সম্বন্ধে শিশুর অভিজ্ঞতা বাড়বে বলে। কিন্তু ফ্রয়েবেল প্রকৃতিবীক্ষণকে সমর্থন করেছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে শিশু তার নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন এবং আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি লাভ করবে প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে।

ফ্রয়েবেলের শিক্ষানীতির সারসংক্ষেপ

(১) শিক্ষার লক্ষ্য হল আধ্যাত্মিক একতার উপলব্ধি, বা এককথায় আত্মোপলব্ধি।

(২) এই আত্মোপলব্ধি আসে শিশুর অন্তর্নিহিত সত্তার ক্রমবিকাশ বা ক্রম-উন্মেষণের মাধ্যমে।

(৩) আবার এই ক্রম-উন্মেষণের স্বাভাবিক মাধ্যাম হল আত্মসক্রিয়তা এবং আত্মসক্রিয়তার স্বাভাবিক রূপ হল খেলা। অতএব খেলা শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ।

(৪) অনেক বস্তু ও কাজ আছে যেগুলি এই আধ্যাত্মিক একতার প্রতীক-স্বরূপ। এই ধারণা থেকেই ফ্রয়েবেলের কিণ্ডারগার্টেন প্রথায় প্রতীকমূলক বস্তুর ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

(৫) সামাজিক সহযোগিতার মাধ্যমে শিশুরা দলবদ্ধ হয় এবং তার ফলে তারা আধ্যাত্মিক একতা উপলব্ধি করতে পারে।

শিক্ষায় ফ্রয়েবেলের অবদান

বর্তমানে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত কিণ্ডারগার্টেন প্রথার অপরিসীম জনপ্রিয়তা আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় ফ্রয়েবেলের সুগভীর প্রভাব সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা আমাদের দিয়ে থাকে। বস্তুত প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থায় নার্সারি এবং তার উপরের স্তরের জন্য ফ্রয়েবেলের কিণ্ডারগার্টেনকে আদর্শ শিক্ষা-পরিকল্পনা রূপে প্রায় সব দেশেই গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষায় ফ্রয়েবেলের প্রকৃত অবদান কেবলমাত্র কিণ্ডারগার্টেন প্রথার উদ্ভাবনেই সীমাবদ্ধ নয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে ফ্রয়েবেলের সবচেয়ে বড় অবদান হল যে তিনিই প্রথম শিক্ষার একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন। ইতিপূর্বে রুশো শিক্ষার নানা সমস্যার ব্যাখ্যায় দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন। কিন্তু ফ্রয়েবেলই প্রথম সমগ্র শিক্ষাপ্রক্রিয়াটিকে একটি দার্শনিক তত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করেন। এককথায় তিনিই প্রথম শিক্ষাশ্রয়ী দর্শনের (Educational Philosophy) জনক। তার পরবর্তী কালে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক শিক্ষাবিদ্ জন ডিউইর হাতে এই শিক্ষাশ্রয়ী দর্শন পরিপুষ্টি লাভ করে।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষায় সক্রিয়তার অপরিহার্যতা ফ্রয়েবেলই প্রথম ঘোষণা করেন। পেষ্টালৎসীর শিক্ষাব্যবস্থাতেও সক্রিয়তা অত্যাবশ্যক অঙ্গ ছিল, কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে হলে সক্রিয়তা যে একমাত্র মাধ্যম একথা ফ্রয়েবেলই প্রথম বলেন। তাঁর দার্শনিক সংব্যাখ্যান অনুযায়ী শিশুর অন্তরস্থ সম্ভাবনা সক্রিয়তার মাধ্যম ছাড়া পূর্ণতা লাভ করে না।

তৃতীয়ত, শিশুর খেলার গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ফ্রয়েবেল। তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে তিনি বুঝেছিলেন যে শিশুর ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক ও স্বতস্ফূর্ত মাধ্যম হল খেলা। ফ্রয়েবেলের এই সিদ্ধান্তটি শিশু শিক্ষায় সর্বত্র সর্ববাদীসম্মতরূপে মেনে নেওয়া হয়েছে।

চতুর্থত, শিক্ষার পরিবেশকে সমাজধর্মী করারও আধুনিক পরিকল্পনাটি ফ্রয়েবেলের শিক্ষাতত্ত্ব থেকে জন্মলাভ করেছে। বহুর মধ্যে এককে উপলব্ধি করাই হল ফ্রয়েবেলের মতে শিক্ষার প্রধানতম লক্ষ্য এবং সে উপলব্ধি আসে শিশুর সামাজিক সচেতনতার মধ্যে দিয়ে। ফ্রয়েবেলের এই মতবাদ থেকেই বিদ্যালয়কে সমাজের প্রতিচ্ছবি করার প্রসিদ্ধ আন্দোলনটি জন্মেছে।

পঞ্চমত, ফ্রয়েবেলই পাঁচ থেকে আট বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং পরবর্তী বয়সের শিক্ষাকে কার্যকরী করতে হলে শৈশবের শিক্ষাকে যে সুদৃঢ় করতে হবে এই প্রয়োজনীয় সত্যটি সম্বন্ধে তিনিই প্রথম সকলকে অবহিত করেন।

ষষ্ঠত, ফ্রয়েবেল শিক্ষায় কৃত্রিমতা ও বহিশক্তির হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণরূপে দূর করার নির্দেশ দিয়েছেন। শিশুর শিক্ষা গাছের বৃদ্ধির মত স্বাভাবিক ও স্বতঃপ্রণোদিত। ফ্রয়েবেলের এই আদর্শ থেকেই এসেছে শিক্ষায় শিশুকে স্বাধীনতাদানের আধুনিক মতবাদ।

সপ্তমত, ফ্রয়েবেল তাঁর কিণ্ডারগার্টেনে শিশুর শিক্ষাকে নিছক পুঁথিবিদ্যার আহরণে সীমাবদ্ধ না রেখে গান, খেলা, হাতের কাজ, গল্প বলা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে সুসমৃদ্ধ বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনে রূপান্তরিত করেন। এর ফলেই বর্তমানে এক সহজ, প্রীতিকর ও সার্থক শিশুশিক্ষার পরিকল্পনা গড়ে উঠেছে।

ফ্রয়েবেলের শিক্ষাতত্ত্ব ও পদ্ধতির মধ্যে অনেক ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতাও ছিল। প্রথমত তাঁর মতবাদ পুরোপুরি ভাববাদীমূলক হওয়ায় শিক্ষার উপকারিতা, অভিনবত্ব ও সৃজনক্ষমতার যথার্থ মূল্য দেওয়া হয় নি। তাঁর উন্মেষণতত্ত্বের (Theory of unfoldment) ব্যাখ্যা অনুযায়ী বংশধারাই সব, পরিবেশের কোন ক্ষমতাই নেই। ফলে শিক্ষার দানও হয়ে দাঁড়ায় অকিঞ্চিৎকর। দ্বিতীয়ত, ফ্রয়েবেল শিক্ষায় প্রতীকের (symbol) ব্যবহার প্রবর্তন করাতে তাঁর শিক্ষানীতিটিই দুর্জ্ঞেয় দুর্বোধ্য ও অলৌকিক রহস্যময় হয়ে উঠেছে। তৃতীয়ত, ফ্রয়েবেলের শিক্ষা পদ্ধতি কেবলমাত্র অল্পবয়স্ক শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রযোজ্য, উচ্চস্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ চলে না।

বাইশ

জন ডিউই (John Dewey)

রুশোর পরে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ আমেরিকান দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ্ জন ডিউইর মত এত ব্যাপক ও স্থায়ী অবদান আর কোন মনীষীরই নেই। তবে রুশোর মতবাদ প্রধানত প্রতিষ্ঠিত ছিল অনুভূতি ও আবেগের উপর, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা সুপরিকল্পিত পর্যবেক্ষণের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই ছিল না। কিন্তু ডিউইর মতবাদ জন্ম নিয়েছিল উন্নত দার্শনিক চিন্তা, আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং বহু বৎসরের বাস্তব পরীক্ষণের সম্মিলিত ফলরূপে। রুশোর সমালোচনা ছিল অসংযত, আবেগপ্রবণ এবং বহু ক্ষেত্রে স্ববিরোধী। কিন্তু ডিউইর সমালোচনা ছিল সুচিন্তিত, স্থিরমস্তিষ্কপ্রসূত ও যুক্তিনির্ভর। রুশো সমালোচনা করেছিলেন নিছক ধ্বংসের উদ্দেশ্যে, তার মধ্যে সৃজনের কোন পরিকল্পনা ছিল না, কিন্তু ডিউইর সমালোচনার মূল উদ্দেশ্যই ছিল ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করে তার স্থানে নতুন ও সার্থক শিক্ষাব্যবস্থার সৃষ্টি করা। বস্তুত কঠোর প্রতিবাদ ও তীক্ষ্ণ সমালোচনার আঘাতে রুশো গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে যে ধ্বংসস্তূপ রেখে গেছলেন ডিউই অসীম অধ্যবসায় ও গভীর যত্নের সাহায্যে তার উপরেই গড়ে তুলেছেন আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সুরম্য অট্টালিকাটি।

আমেরিকার বার্লিংটন শহরে ১৮৫৯ সালে জন ডিউই জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় বিবর্তনবাদী হাক্সলে এবং ডারউইনের মতবাদের দ্বারা তিনি বিশেষ-ভাবে প্রভাবিত হন। প্রসিদ্ধ আমেরিকান মনীষী স্ট্যানলী হল, চার্লস পিয়ার্স প্রভৃতির কাছে তিনি দর্শনতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর পরবর্তী জীবনের দার্শনিক ভাবধারার বীজ তাঁদের হাতেই প্রথম উপ্ত হয়। পড়াশোনা শেষ করে প্রথমে মিচিগান এবং পরে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৯৬ সালে তিনি প্রথম পরীক্ষণমূলকভাবে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং তাঁর স্ত্রী অ্যালিসের সহায়তায় সাত বৎসর স্কুলটি চালান। এই স্কুলটিতে ডিউই তাঁর নিজস্ব শিক্ষানীতিগুলির বাস্তব প্রয়োগ করে সেগুলির কার্যকারিতার বিচার করেন। এই স্কুলটি ল্যাবরেটরী স্কুল (Laboratory School) নামে পরিচিত ছিল। ১৯০৪ সালে ডিউই চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়

ছেড়ে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এই সময় তিনি শিক্ষা ও দর্শনের উপর কতকগুলি বই লেখেন। ১৯১৬ সালে তাঁর বিখ্যাত বই ডেমোক্র্যাসী এ্যাণ্ড এডুকেশন (Democracy and Education) বেরোয়। ১৯২২ সালে বেরোয় তাঁর সমাজ মনোবিজ্ঞানের উপর হিউম্যান নেচার এ্যাণ্ড কনডাক্ট (Human Nature & Conduct) নামে সারগর্ভ গ্রন্থটি। আমেরিকার শিক্ষার পুনর্গঠনে ডিউইর দান অসীম। শিক্ষাঘটিত তত্ত্ব থেকে সুরু করে শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ, শিক্ষার পদ্ধতি প্রভৃতি শিক্ষার সকল প্রকার সমস্যা সম্বন্ধেই ডিউই সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট সমাধান দিয়ে গেছেন। যদিও তাঁর মতবাদ প্রত্যক্ষভাবে আমেরিকার শিক্ষাকে প্রভাবিত করেছে তবু বর্তমানে তাঁর সুচিন্তিত শিক্ষানীতিগুলি পৃথিবীর সমস্ত শিক্ষাবিদেরাই গ্রহণ করেছেন এবং সর্বত্রই ব্যাপকভাবে সেগুলিকে প্রয়োগ করা হচ্ছে। ১৯৫৩ সালে ডিউইর মৃত্যু হয়।

ডিউইর শিক্ষাশ্রয়ী দর্শন (Educational Philosophy)

দার্শনিক মতবাদের দিক দিয়ে ডিউই প্রথমে সুরু করেন ভাববাদী হেগেলের সমর্থকরূপে। পরে তিনি প্রয়োগবাদী (Pragmatist) হয়ে ওঠেন। এদিক দিয়ে তিনি প্রসিদ্ধ দার্শনিক উইলিয়াম জেমস ও চার্লস পিয়ার্সের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। ডিউই দর্শনের একটি সম্পূর্ণ নতুন সংজ্ঞা দেন। তাঁর মতে পৃথিবীকে আমরা কি ভাবে জানি তা নির্ণয় করা দর্শনের কাজ নয়, দর্শনের কাজ হল আমরা কি ভাবে পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রিত এবং উন্নত করতে পারি তাই দেখা। আরও বিশদভাবে বলতে গেলে ডিউইর মতে—গণতন্ত্র, শিল্প এবং বিজ্ঞান—বর্তমান পৃথিবীর এই তিনটি প্রধান শক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে যে সামাজিক সংঘাতের সৃষ্টি হয় তারই পর্যবেক্ষণের নাম দর্শনশাস্ত্র।

দর্শন ও শিক্ষার সম্পর্ক

দর্শনের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক নির্ণয়েও ডিউই সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেন। তাঁর মতে শিক্ষা ও দর্শনের মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। ডিউই বলেন যে ব্যক্তির চতুষ্পার্শ্বের প্রকৃতি ও প্রতিবেশীদের প্রতি জ্ঞানমূলক ও প্রক্ষোভমূলক মনোভাব তৈরী করাকেই ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলা চলে।

আর শিক্ষা যদি তাই হয় তাহলে দর্শন হয়ে দাঁড়াচ্ছে শিক্ষার সাধারণ তত্ত্ব বা নীতি। দর্শনের কাজ হল শিক্ষার বর্তমান লক্ষ্যগুলির সমালোচনা করা এবং বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতির চাহিদার উপযোগী করে সেগুলিকে পুনর্গঠন করা। অর্থাৎ এককথায় শিক্ষা হল সেই গবেষণাগার যেখানে বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বগুলিকে বাস্তবে পরীক্ষা করা হয়।

চিন্তন ও সত্য

ডিউইর দার্শনিক মতবাদ ডারউইনের বিবর্তনবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। এ্যারিস্টটল থেকে স্রুরু করে হেগেল পর্যন্ত সকলেই ধরে নিয়েছেন যে সৃষ্টির প্রথম থেকেই মানুষ বুদ্ধি এবং চিন্তন শক্তির অধিকারী। তাহলে চিন্তনের চর্চাই হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য। কিন্তু ডারউইনের বিবর্তনতত্ত্বের অনুসরণে ডিউই এই সিদ্ধান্তে এলেন যে মানুষ চিন্তাশক্তির অধিকারী হয়েছে ক্রমবিবর্তনের মধ্যপথে এমন একটি দিনে যখন জটিল এবং বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে সঙ্গতিবিধানের উদ্দেশ্যে তার পক্ষে চিন্তন বা বুদ্ধির ব্যবহার অস্তিত্বরক্ষার জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠল। এই সিদ্ধান্ত থেকে ডিউই আর একটি অতি-প্রয়োজনীয় শিক্ষামূলক তত্ত্বে গিয়ে পৌছলেন। শিক্ষায় চিন্তন অপরিহার্য, কিন্তু যেহেতু চিন্তন কাজটা ভাল সে জন্য নয়, যেহেতু চিন্তন জটিল ও বিপদসঙ্কুল পৃথিবীতে আমাদের সমস্যা সমাধানের উপকরণ এবং আমাদের উন্নত সঙ্গতিবিধানে সহায়ক সেইজন্যই। চিন্তন দু'রকমের—মনন-মূলক ও কল্পনামূলক। কল্পনামূলক চিন্তন আমাদের সঙ্গতিবিধানে বা সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে না। কিন্তু মননমূলক চিন্তনই (Reflective thinking) আমাদের সত্যে পৌছবার প্রধানতম উপকরণ। ডিউই এই মননমূলক চিন্তনেরই আর একটি নাম দিয়েছেন অনুসন্ধান (Enquiry)। নতুন কোন জ্ঞান আহরণ করতে, কোন অজানা সত্যে পৌছতে, কোন সমস্যার সমাধান করতে এই মননমূলক চিন্তন বা অনুসন্ধান অপরিহার্য।

চিন্তনের এই তত্ত্ব থেকে আসে ডিউইর সত্য (Truth) বা জ্ঞানের (Knowledge) নবতম ব্যাখ্যান। ভাববাদী দার্শনিকদের মতে সত্য চিরস্থায়ী, অপরিবর্তনীয় এবং সর্বজনীন। অর্থাৎ অতীতে যা সত্য ছিল, তা বর্তমানেও সত্য এবং ভবিষ্যতেও তা সত্য থাকবে। তেমনই মানুষে মানুষে দেশে দেশে সত্য বদলায় না। যা তোমার কাছে সত্য, তা আমার কাছে সত্য, যাদের দেখিনি,

জানি না তাদের কাছেও সত্য। সত্য ও জ্ঞান অপরিবর্তনীয় হওয়াতে শিশুদের সত্য বা জ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতিও সহজ বলে এতদিন বিবেচিত হয়ে এসেছে। পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া এবং আমাদের অর্জিত সত্য ও জ্ঞান-গুলি বক্তৃতা, আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুদের হাতে তুলে দিলেই হয়। প্রয়োজন কেবল সহজ ও সুবোধ্য করে সেগুলিকে ব্যাখ্যা করে দেওয়া যাতে শিশুদের অপরিণত মন সেগুলিকে গ্রহণ করতে অসুবিধা বোধ না করে। এই ধারণা থেকেই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় বক্তৃতা ও আলোচনার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়ার প্রথা বহুদিন ধরে চলে এসেছে।

ডিউই জানালেন যে সত্য বা জ্ঞান অপরিবর্তনীয় নয়, সর্বজনীনও নয়। বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে সত্যের রূপও বিভিন্ন এবং সত্যকে যদি জানতে হয় তাহলে তাকে নিজের প্রচেষ্টায় আহরণ করে নিতে হবে, কারও কাছ থেকে তৈরী বস্তুরূপে তা পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ শিক্ষক শিশুকে সত্য হাতে তুলে দিতে পারবেন না, শিশুকে নিজেকেই নিজের সত্য আবিষ্কার করে নিতে হবে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রকৃত সমস্যা সমাধানের মধ্যে দিয়ে।

ডিউইর সক্রিয়তা-তত্ত্ব

এই থেকেই দেখা দিয়েছে ডিউইর প্রসিদ্ধ সক্রিয়তার তত্ত্বটি (Theory of Activity)। ডিউইর মতে সমস্যা সমাধান বা সত্য-আহরণের প্রধানতম মাধ্যম হল পরীক্ষণ (experiment) এবং চিন্তা বা ধারণার বাস্তবে প্রয়োগ। এই জন্যই ডিউইর মতবাদকে প্রয়োগবাদ (Pragmatism) বা পরীক্ষণমূলকবাদ (Experimentalism) বলা হয়ে থাকে।

কোনও সত্য বা জ্ঞান আহরণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তখনই যখন ব্যক্তি কোন সমস্যার (Problem) সম্মুখীন হয়। সমস্যা মানেই হল ব্যক্তির পূর্ব অর্জিত জ্ঞান বা ধারণাগুলির দ্বারা যখন তার পক্ষে পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিবিধান করা আর সম্ভব হচ্ছে না এবং তার ফলে নতুন জ্ঞান বা সত্য আহরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

এখন সমস্যা দেখা দেয় তখনই যখন কোন কাজ করতে করতে হঠাৎ বাধা বা বিঘ্নের সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে কাজটি বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ সমস্যা আসে সক্রিয়তা (Activity) থেকে। সমস্যার সৃষ্টি হলে ব্যক্তি তখন তার সমাধানের

জন্য মনে মনে নানা সম্ভাব্য উপায়ের চিন্তা করে। সমস্যা সমাধানের এই স্তরকে আমরা তথ্য-সংগ্রহ (Data) বলে বর্ণনা করতে পারি।

এই বিভিন্ন সম্ভাব্য সমাধান থেকে ব্যক্তি তখন বিশেষ একটি সমাধানকে বেছে নেয়। এই স্তরকে আমরা প্রকল্পন (Hypothesis) নাম দিতে পারি। এটিকে বিকল্পন বলা হয় এইজন্য যে অনেকগুলি বিকল্প তথ্য বা সম্ভাব্যের মধ্যে থেকে যেটিকে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা উপযোগী বলে মনে করে সেটিকে সে বেছে নেয়।

কিন্তু কেবল একটি সমাধানকে বেছে নিলেই চলবে না, দেখতে হবে সেই সমাধানটি সত্যকারের কার্যকরী কি না। এর জন্য প্রয়োজন সেই তথ্য বা ধারণাটির পরীক্ষণ (Testing)। যদি পরীক্ষণের ফলে দেখা যায় যে ঐ তথ্য বা ধারণাটি সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম, তাহলে বুঝতে হবে যে ঐ তথ্য বা ধারণাটি নির্ভুল এবং সমস্যার সমাধানও সঙ্গে সঙ্গে এসে যাবে। আর যদি দেখা যায় যে ঐ তথ্য বা ধারণার দ্বারা সমস্যার সমাধান করা গেল না তাহলে ওটিকে বাতিল করে আর একটি তথ্য বা ধারণা গ্রহণ করতে হবে এবং সেটিকেও অনুরূপভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে সত্য সত্যই সেটি সমস্যার সমাধানে কার্যকরী কি না। এই ভাবে ব্যক্তি যখন পরীক্ষণের দ্বারা কোন তথ্য বা ধারণার কার্যকারিতা প্রমাণিত করতে পারে তখনই ডিউইর মতে সে প্রকৃত জ্ঞান বা সত্য আহরণ করতে পারল। সত্য আহরণ করার আর কোন দ্বিতীয় পথ নেই।

বলা বাহুল্য পরীক্ষণ প্রক্রিয়াটিও পুরোপুরি সক্রিয়তামূলক। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সত্য আবিষ্কার বা সমস্যা সমাধানের সুরু হয়েছে সক্রিয়তা থেকে এবং তার শেষও হল সক্রিয়তায়।

সত্য আহরণের পাঁচটি সোপান

অতএব ডিউইর সমস্যা-সমাধান বা সত্য আহরণের পাঁচটি সোপান হল—

১। **সক্রিয়তা** (Activity) : ব্যক্তি কোন কাজ সম্পন্ন করতে করতে

২। **সমস্যা** (Problem) : হঠাৎ বাধাপ্রাপ্ত হলে সমস্যা দেখা দেয়। তখন তার সমাধানের জন্য

৩। **তথ্য** (Data) : সে নানা তথ্য ও ধারণা মনে মনে সংগ্রহ করে এবং

৪। **প্রকল্পন** (Hypothesis): পরে তার মধ্যে থেকে একটি তথ্য বা ধারণাকে সে বেছে নিয়ে

৫। **পরীক্ষণ** (Testing) : সেটিকে বাস্তবে প্রয়োগ করে তার কার্য-কারিতার বিচার করে।

ডিউইর দেওয়া সত্য আহরণের পাঁচটি সোপানের শেষ হয়েছে পরীক্ষণে। বলা বাহুল্য পরীক্ষণও সক্রিয়তামূলক অর্থাৎ বাস্তব কর্মের ভেতর দিয়ে তথ্য বা ধারণাটির কার্যকারিতার পরীক্ষা করা হয়। এক কথায় সত্য আহরণের প্রচেষ্টার সুরু সক্রিয়তায় এবং শেষও সক্রিয়তায়। হার্বার্ট ও শিক্ষণের পাঁচটি সোপানের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ডিউইর পাঁচটি সোপানের সঙ্গে হার্বার্টের দেওয়া পাঁচটি সোপানের বিরাট পার্থক্য আছে।*

ডিউইর সক্রিয়তা-তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য

ইতিপূর্বে শিক্ষায় সক্রিয়তার মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বহু শিক্ষাবিদই তাঁদের অভিমত দিয়ে এসেছেন। অ্যারিস্টটল, কুইন্টিলিয়ান থেকে সুরু করে কমেনিয়াস, ফ্রয়েবেল প্রভৃতি বহু শিক্ষাবিদ শিক্ষায় সক্রিয়তাকে অঙ্গীভূত করার সপক্ষে মত দিয়ে গেছেন। ফ্রয়েবেল শিক্ষায় সক্রিয়তাকে অপরিহার্য বলে বর্ণনা করে গেছেন। কিন্তু ডিউইর মত সক্রিয়তার এত বড় মূল্য বোধ করি আর কেউ দেন নি। ডিউইর পূর্বের শিক্ষাবিদেরা সক্রিয়তাকে সমর্থন করেছেন হয় শারীরিক পুষ্টি বা উন্নতির জন্য, কিংবা আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলির বিকাশের জন্য, কিন্তু ডিউই সক্রিয়তাকে সমর্থন করেছিলেন তার চেয়ে অনেক বড় কারণে। তাঁর মতে সক্রিয়তা হল সত্যে পৌছবার একমাত্র এবং অপরিহার্য সোপান। যেহেতু সত্য আহরণ এবং সমস্যা সমাধান আমাদের বেঁচে থাকা এবং সভ্যতার বিকাশের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় সেহেতু সক্রিয়তাও আমাদের ব্যক্তিগত ও সাংস্কৃতিক উভয় প্রকার অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য।

ডিউইর দেওয়া সক্রিয়তার এই নতুন তত্ত্বটি সত্যই যুগান্তকারী। এর দ্বারা সক্রিয়তার একটা সম্পূর্ণ নতুন ব্যাখ্যা ও গুরুত্ব দেওয়া হল। সত্য অপরিবর্তনীয় ও চিরস্থায়ী ত নয়ই। বরং সত্য পুরোপুরি সক্রিয়তার উপর নির্ভরশীল। সক্রিয়তার মাধ্যমে পরীক্ষার দ্বারা যদি সত্যের কার্যকারিতা বা যাথার্থ্য প্রমাণিত হয় তবেই সে সত্য প্রমাণগ্রাহ্য। অর্থাৎ সত্য স্বয়ং প্রমাণিত নয়, সত্য মাত্রেই প্রমাণিতব্য। এদিক দিয়ে ডিউইর সঙ্গে প্রাচীন সোফিস্ট নামে গ্রীক শিক্ষাবিদদের বেশ মিল আছে।

---

*হার্বার্টের পাঁচটি সোপানের সঙ্গে ডিউইর পাঁচটি সেপানের তুলনা ২৩৭ পাতায় দ্রষ্টব্য।

সত্য আহরণের জন্য যখন সক্রিয়তা অপরিহার্য তখন শিশুর সার্থক শিক্ষা পরিকল্পনা সক্রিয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত হবেই। শিশুর সমস্ত শিক্ষা, জ্ঞান, ধারণা, তথ্য-সংগ্রহ সবই সম্পন্ন হবে সক্রিয়তার মাধ্যমে। ডিউইর এই প্রগতিশীল সক্রিয়তার তত্ত্ব থেকেই উদ্ভূত হয়েছে শিক্ষাকে সক্রিয়তাভিত্তিক করার বর্তমানের পৃথিবীব্যাপী আন্দোলন।

শিক্ষাই ক্রমবিকাশ (Growth)

প্রাচীন ভাববাদীদের মতে সত্যকারের পরিবর্তন বলে কোন বস্তু নেই। যাকে আমরা পরিবর্তন বলি বা পরিবর্তন বলে মনে করি প্রকৃতপক্ষে সেটি বাহ্যিক বা আকারগত পরিবর্তন, সত্যকারের কোন অস্তিত্বগত পরিবর্তন নয়। অতএব পৃথিবীতে কোন কিছু আসলে বদলায় না, যা বদলায় তা কেবলমাত্র আকারে। কিন্তু উইলিয়াম জেমস্ প্রভৃতি আধুনিক প্রয়োগবাদীদের মতে সৃষ্টি চিরপরিবর্তনশীল এবং মানব অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল পরিবর্তন এবং বৈচিত্র্য। পৃথিবী নিয়তই বদলাচ্ছে, বাড়ছে, নতুন হচ্ছে। এই দার্শনিক মতবাদটি থেকে জন্মেছে জন ডিউইর শিক্ষার ক্রমবিকাশের তত্ত্বটি (Theory of Growth)।

এই তত্ত্ব অনুযায়ী শিক্ষা হল বৃদ্ধি বা ক্রমবিকাশেরই নামান্তর। শিশুমাত্রেই নিয়ত বৃদ্ধিশীল—তার শরীর, মন, আগ্রহ, জ্ঞান, কৌশল, আচরণ সব দিক দিয়েই সে প্রতিনিয়ত বাড়ছে। এই ছেদহীন, বিরামহীন বৃদ্ধি বা ক্রমবিকাশই হল তার শিক্ষা। শিক্ষা নিছক কতকগুলি নিষ্ক্রিয় তথ্য বা জ্ঞানের আহরণ নয়, শিক্ষা একটি সতত সক্রিয় প্রক্রিয়া বিশেষ, যে প্রক্রিয়া ব্যক্তির সত্তার ক্রমবিকাশের সঙ্গে অভিন্ন। অতএব প্রচলিত সংব্যাখ্যান অনুযায়ী শিক্ষার যে নানা লক্ষ্য ধরা হয় সেগুলি সবই ভুল। আত্মোপলব্ধি, ভবিষ্যৎ-প্রস্তুতি, বৃত্তি-শিখন, চরিত্র-গঠন প্রভৃতি যে বহুবিধ শিক্ষার লক্ষ্যের কথা শিক্ষক, পিতামাতা প্রভৃতি বলে থাকেন সেগুলি নেহাৎ সংকীর্ণ ও অসম্পূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার কোন সুনির্দিষ্ট ও স্থিরীকৃত লক্ষ্য থাকতে পারে না। শিক্ষা একটি প্রক্রিয়া বিশেষ এবং কোন প্রক্রিয়ারই কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকতে পারে না। প্রক্রিয়া মাত্রেরই লক্ষ্য প্রক্রিয়াটিকে আরও চালিয়ে যাওয়া। যেমন, 'চলা' নামক প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হল আরও 'চলা'। তেমনই শিশুর বৃদ্ধিরূপ প্রক্রিয়ার কোন দূরবর্তী লক্ষ্যও থাকতে পারে না, বৃদ্ধির লক্ষ্য আরও বৃদ্ধি। আবার শিক্ষা আর বৃদ্ধি

সমার্থক, অতএব শিক্ষার লক্ষ্যও হল আরও শিক্ষা। এই লক্ষ্য ছাড়া কোন সংকীর্ণ নির্দিষ্ট লক্ষ্য শিক্ষার উপর আরোপ করা সঙ্গত নয়। শিশুর সামনে শিক্ষার যে সব সুদূর, অস্পষ্ট ও কাল্পনিক লক্ষ্য প্রায়ই অভিভাবকেরা ধরে থাকেন ডিউই সেগুলির তীব্র সমালোচনা করেছেন।

শিক্ষার সামাজিক দিক ও গণতন্ত্র

ডিউইর শিক্ষাতত্ত্বের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষার সামাজিক দিকটির উপর বিশেষ গুরুত্বদান। ব্যক্তির বৃদ্ধি বা ক্রমবিকাশ যদিও মূলত ব্যক্তিগত প্রক্রিয়া, তবু এ প্রক্রিয়া সমাজের ভিতরেই ঘটে থাকে। সমাজ ছাড়া ঘটে না বা ঘটতে পারেও না। বস্তুত শিশুর শিক্ষা ঘটে থাকে সমাজের অন্যান্য অধিবাসীদের সঙ্গে পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদান ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে। অতীতের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানের সঙ্গে উন্নততর সঙ্গতিবিধানের উদ্দেশ্যে ব্যক্তির অভিজ্ঞতার নিয়ত পুনর্গঠন ও পুনর্স্জনই হল শিক্ষা। আর যত বেশী ব্যক্তি সমাজের অন্যান্য অধিবাসীদের সঙ্গে তার অভিজ্ঞতার অংশ গ্রহণ করবে ততই তার অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন সুসমৃদ্ধ ও লাভজনক হয়ে উঠবে। ডিউইর মতে এই ধরনের যৌথ অভিজ্ঞতা যত বাড়বে ততই ব্যক্তি এবং সমাজ দুয়েরই বৃদ্ধি ঘটবে। আর যৌথ অভিজ্ঞতার সুযোগ সব চেয়ে বেশী পাওয়া যায় গণতান্ত্রিক সমাজে যেখানে ব্যক্তির আচরণের উপর বাধানিষেধ সবচেয়ে অল্প। অতএব সার্থক শিক্ষার উপযোগী সমাজ হল গণতান্ত্রিক সমাজ।

ডিউই শিক্ষাকে একটি সামাজিক প্রক্রিয়ারূপে বর্ণনা করেছেন। অতএব বলা বাহুল্য যে শিক্ষার পূর্ণতা ও সার্থকতা নির্ভর করবে আদর্শ-সামাজিক পরিবেশের উপর। ডিউইর মতে একমাত্র গণতন্ত্রই হল সেই পূর্ণ ও সার্থক শিক্ষার উপযোগী আদর্শ ক্ষেত্র।

বিদ্যালয়ই সমাজ

অতএব দেখা যাচ্ছে যে প্রকৃত সামাজিক পরিবেশ ছাড়া সমস্ত শিক্ষাই অসম্পূর্ণ ও কৃত্রিম। কিন্তু গতানুগতিক স্কুলগুলিতে এই অতি প্রয়োজনীয়

সত্যটিকে সম্পূর্ণ অবহেলা করা হয়। সেখানে বাইরের সমাজের স্পর্শ থেকে স্কুলকে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে রাখা হয় এবং বাস্তব সমাজজীবনের জন্য অপরিহার্য অভিজ্ঞতা, আচরণ, কৌশল, মনোভাব ইত্যাদি শিক্ষার্থীকে শেখাবার কোনরূপ আয়োজনই সেখানে থাকে না। তার ফলে শিক্ষার্থী যখন সমাজজীবনে প্রবেশ করে তখন সেই পরিবেশে সে নিজেকে সম্পূর্ণ অনুপযোগী ও অক্ষমরূপে দেখতে পায়। বিদ্যালয় এবং সমাজের মধ্যে এই যে দ্বন্দ্ব বা ব্যবধান বহুদিন ধরে চলে আসছে, ডিউইর মতে তা নিতান্তই কাল্পনিক ও কৃত্রিম। বিদ্যালয় হবে সমাজেরই নিখুঁত প্রতিচ্ছবি—সেখানে সমাজের সমগ্র রূপটি পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হবে শিশুদের বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে। ডিউইর এই মতবাদ থেকেই জন্ম নিয়েছে আধুনিককালের স্কুলকে সমাজের প্রতিচ্ছবি করে তোলার আন্দোলন।

শিশুকে সমাজজীবনের জন্য প্রস্তুত করাটা যদিও শিক্ষার কার্যসূচীর অন্তর্গত তবু একথা ভাবলে ভুল হবে যে শিশুকে কোন নির্দিষ্ট ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করাটা শিক্ষার উদ্দেশ্য। প্রাচীন শিক্ষাবিদেরা ভবিষ্যতের জন্য শিশুকে প্রস্তুত করাটা শিক্ষার লক্ষ্য বলে মনে করতেন। কিন্তু ডিউইর মতে কোন সুনির্দিষ্ট ও সুদূর বস্তুকে শিক্ষার লক্ষ্য বলে বর্ণনা করা চলে না। শিক্ষার লক্ষ্য বটে শিশুকে প্রস্তুত করা কিন্তু সে প্রস্তুত করা কোন সুনির্দিষ্ট দূরস্থিত কাল্পনিক লক্ষ্যের জন্য নয়, সে প্রস্তুত করা শিশুকে তার পূর্ণ জীবনের জন্য এবং বিদ্যালয় শিশুকে সেই প্রস্তুতি দেবে শিশুর পূর্ণজীবনকে তার পরিবেশের মধ্যে প্রতিফলিত করে (prepare for life by being life)।

হার্বার্টের কৃষ্টি-যুগতত্ত্বটিও ডিউইকে বেশ কিছুটা প্রভাবিত করেছিল এবং মানবজাতি যে সব মৌলিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বর্তমান উন্নত অবস্থায় এসে পৌঁছেছে সেগুলির অনুশীলনই তাঁর মতে শিশুর সুষ্ঠু বিকাশের পরম সহায়ক। এইজন্য গতানুগতিক পাঠক্রমকে বাতিল করে দিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে সব মৌলিক ও অপরিহার্য কাজগুলি সম্পন্ন করে গেছেন ডিউই সেগুলিকে শিশুর পাঠক্রমের প্রধান বিষয়বস্তু করার নির্দেশ দিয়েছেন।

শৃঙ্খলার সমস্যা ডিউইর শিক্ষাতত্ত্বে কোন সমস্যাই নয়। তাঁর মতে বিদ্যালয়ে যদি সত্যকারের সমাজধর্মী পরিবেশের সৃষ্টি করা যায় তাহলে শৃঙ্খলা স্বাভাবিক ও স্বতঃপ্রণোদিতভাবে দেখা দেবে। শৃঙ্খলা রক্ষা সেখানেই সমস্যারূপে দেখা দেয় যেখানে পরিবেশ অসমাজধর্মী এবং ফলে যেখানে শিশু কাজ করার কোন স্বাভাবিক প্রেরণা অনুভব করে না।

ডিউইর আগ্রহতত্ত্ব

ডিউই আগ্রহেরও এক নতুন মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন। হার্বাটের মতে আগ্রহ নির্ভর করে শেখার বিষয়বস্তুর উপর। যদি নতুন শিক্ষণীয় বস্তুটি শিশুর পূর্বে শেখা বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তাহলে আগ্রহ নিজে নিজে দেখা দেবে। অতএব হার্বাটের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আগ্রহ ভিতর থেকে আসছে না, বাইরে থেকে সৃষ্ট করা হয়ে থাকে। ডিউই এ ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করে জানান যে আমাদের অহংসত্তা থেকে যে স্বাভাবিক প্রেরণা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বেরিয়ে আসে তা থেকেই জন্মায় আগ্রহ।

ব্যক্তির নিজস্ব বিকাশপথের অভিমুখে অবস্থিত কোন কিছুর প্রতি অহংসত্তার স্বতঃবহির্গমনের নাম দেওয়া যেতে পারে আগ্রহ। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে আগ্রহ ও প্রচেষ্টা পরস্পর বিরোধী নয়, পরস্পরের সহায়ক। আগ্রহ যত বাড়বে প্রচেষ্টাও তত বাড়বে। আগ্রহ প্রকৃতপক্ষে আত্ম-অভিব্যক্তিমূলক আচরণই, যার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির বিকাশপ্রচেষ্টা অন্তঃসুপ্ত প্রবণতা অনুযায়ী আত্মপ্রকাশ করে থাকে। গতানুগতিক শিক্ষায় আগ্রহ ও প্রচেষ্টার মধ্যে বহুযুগ ধরে যে বিরোধিতাকে কল্পনা করে আসা হয়েছে ডিউই এইভাবে তার মীমাংসা করলেন।

ডিউই ব্যক্তিগত বৈষম্যে পরম বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতে বৈচিত্র্য ও নতুনত্ব পার্থিব অস্তিত্বমাত্রেরই মৌলিক বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক শিক্ষার্থীই দেহ, মন, শক্তি, রুচি সব দিক দিয়েই স্বতন্ত্র ও অদ্বিতীয়। অতএব এই ব্যক্তিগত বৈষম্যকে শিক্ষার প্রকৃতি ও পদ্ধতি নির্ণয়ে প্রধান নির্ধারকরূপে গণ্য করতে হবে।

ডিউইর শিক্ষাপদ্ধতি

ডিউইর শিক্ষাপদ্ধতি পরিপূর্ণভাবে তাঁর নিজস্ব দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার সেই সঙ্গে মনোবৈজ্ঞানিক ও জীবতত্ত্বমূলক গবেষণার আধুনিক আবিষ্কারগুলিও ডিউই পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন। কেবল তাই নয়, বহুবৎসর ধরে ডিউই তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে বাস্তবক্ষেত্রে নানা পরীক্ষণ চালান এবং তাঁর অধিকাংশ পদ্ধতিমূলক তত্ত্বই দীর্ঘ পরীক্ষণের সিদ্ধান্তের দ্বারা পূর্ণভাবে সমর্থিত। ডিউইর শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে সংক্ষেপে দেওয়া হল।

শিক্ষায় শিশুকে সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা দিতে হবে। শিক্ষা হল শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি বা বিকাশপ্রক্রিয়া। অতএব সেখানে কারও কোনরূপ নিয়ন্ত্রণের স্থান নেই। শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ বা প্রচেষ্টাকে বাধা দেওয়ার অর্থই হল স্বাভাবিক বিকাশ-প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ণ করা।

শিশুর শিক্ষা আসবে পুরোপুরি বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে—নিষ্ক্রিয় লিখন-পঠনের মধ্যে দিয়ে নয়। শিশুর পাঠক্রমে থাকবে এমন সব অভিজ্ঞতা যেগুলির সঙ্গে শিশুর জীবনের বাস্তব যোগাযোগ আছে। এককথায় শিশুর দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় যে ধরনের অভিজ্ঞতা শিশু আহরণ করে বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতাও সেগুলির সঙ্গে নিবিড়ভাবে গ্রন্থিবদ্ধ হবে।

সক্রিয়তা হবে শিশুর শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম। ডিউইর মতে প্রকৃত জ্ঞান বা সত্য আহরণ করা যায় সক্রিয়তার মাধ্যমে। সক্রিয়তা বাধা পেলে দেখা দেয় সমস্যা আর সেই সমস্যার সমাধানেই শিশু প্রকৃত জ্ঞান বা সত্যে পৌঁছয়। এই থেকেই জন্ম নিয়েছিল ডিউইর সমস্যা-পদ্ধতি (Problem Method)। এই পদ্ধতির পাঁচটি সোপানের বর্ণনা আগেই করা হয়েছে। প্রথমে শিশুকে একটি কাজ করতে দেওয়া হয় (সক্রিয়তা)। কাজটি করতে করতে সে একটি বাধার সম্মুখীন হয় (সমস্যা)। তখন সে সেই সমস্যাটির সমাধান করার জন্য নানা তথ্য সংগ্রহ করে (তথ্য-সংগ্রহ)। তারপর সেই তথ্যগুলির মধ্যে থেকে সে একটি বিশেষ সমাধানকে বেছে নেয় (প্রকল্পন) এবং সব শেষে সে সেই সমাধানটির প্রয়োগ করে দেখে যে ঐটি কার্যকরী কি না (পরীক্ষণ)। ডিউইর মতে এই সমস্যাপদ্ধতির মাধ্যমেই শিশু প্রকৃত সত্য বা জ্ঞান লাভ করতে পারে। এই পদ্ধতিতে সমস্যা সমাধানের মাধ্যম হল সক্রিয়তা এবং মননমূলক চিন্তন হল তার অপরিহার্য উপকরণ।

ডিউই স্কুল

ডিউই তাঁর এই শিক্ষাপদ্ধতিটির কার্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্য একটি বিশেষ বিদ্যালয় খোলেন। এই বিদ্যালয়টি গবেষণাগার বিদ্যালয় (Laboratory School) বা ডিউই স্কুল নামে খ্যাত। এই বিদ্যালয়টিতে ডিউই তাঁর আধুনিক সক্রিয়তাভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করেন।

এই স্কুলটিতে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার অনেক বৈশিষ্ট্যই ছিল না। যেমন বেঞ্চ-চেয়ার টেবিল দিয়ে সাজান ক্লাস, পিরিয়ড, শিক্ষকের বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষণ, ব্ল্যাকবোর্ড, ইত্যাদি প্রচলিত বিদ্যালয়ের অপরিহার্য উপকরণগুলি ডিউইর স্কুলে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নি। সেখানে কোনরূপ পাঠ্যপুস্তক ছিল না, পড়া দেওয়া, পড়া ধরা ইত্যাদি বহুযুগ ধরে অনুসৃত প্রথাগুলিরও অস্তিত্ব ছিল না। কোন বাঁধাধরা রুটিন, পিরিয়ড, পঠন-লিখনের সুনির্দিষ্ট নিয়ম ইত্যাদির কিছুই ছিল না।

ডিউইর পদ্ধতি ছিল পরিপূর্ণভাবে সক্রিয়তা-ভিত্তিক। এমন কি পঠন, লিখন, গণিত প্রভৃতিও শিশু শিখবে তার জীবনের কার্যাবলী থেকে। বিদ্যালয়ের পাঠক্রম বলতে ছিল সক্রিয় শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন। শিশুদের সক্রিয়তা ছিল নানা প্রকৃতির যেমন খেলা, কোন কিছু তৈরী করা, প্রকৃতির সংস্পর্শে আসা, আত্ম-অভিব্যক্তি ইত্যাদি। এই ভাবে ডিউই স্কুলের আভ্যন্তরীণ আবহাওয়াটাই সম্পূর্ণ বদলে দিলেন এবং বিদ্যালয়কে শিশুর জীবনের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করলেন।

ডিউইর শিক্ষাপদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে শিশুর সমস্ত শিক্ষাই একমাত্র সমাজ-ধর্মী পরিবেশের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে। শিশু কেবলমাত্র জ্ঞান বা কৌশলই আয়ত্ত করবে না, সে সামাজিক গুণাবলীর দিক দিয়ে সুযোগ্য ও সক্ষম হয়ে উঠবে। সেইজন্য ডিউইর বিদ্যালয়ে সব কিছু শেখান হত সহযোগিতা ও পারস্পরিক প্রীতিময় আবহাওয়ার মধ্যে দিয়ে। অর্থাৎ এককথায় শিশুর শিক্ষা হবে তার জীবনের প্রস্তুতির জন্য এবং সে প্রস্তুতি স্কুল শিশুকে দেবে শিশুর জীবনকে স্কুলের মধ্যে পূর্ণভাবে প্রতিফলিত করে। বস্তুত যৌথ কর্মপ্রচেষ্টা ও সম্মিলিত উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে শিশুর সমস্ত শিক্ষা সম্পন্ন হবে— এইটাই ডিউইর শিক্ষাপদ্ধতির মূল কথা। সমাজে বাস করতে গেলে যে সব মৌলিক আচরণ মানুষকে সম্পন্ন করতে হয় সেগুলি শিশুর অভিজ্ঞতার অপরিহার্যভাবে অঙ্গীভূত হবে এবং বিদ্যালয় হবে শিশুকে সেই সব অভিজ্ঞতা দেবার উপযোগী ক্ষেত্র। এককথায় স্কুলকে গড়ে তুলতে হবে ছোটখাট সমাজ রূপে, যেখানে বৃহত্তর সমাজের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে শিশু পরিচিত হতে পারবে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। ডিউইর এই আদর্শ অনুযায়ী আধুনিক প্রগতিশীল বিদ্যালয়গুলিতে বাস্তব সমাজজীবনের অনুকরণে সমবায় সমিতি, সংবাদপত্র, ব্যাঙ্ক, পোষ্ট অফিস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলি গঠন করা হয় এবং

শিক্ষার্থীরা সেগুলিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করে অতিপ্রয়োজনীয় সামাজিক অভিজ্ঞতাগুলি সঞ্চয় করতে পারে।

যদিও সুনির্দিষ্ট ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা দান করা ডিউইর পদ্ধতির মূলকথা, তবু শিক্ষায় শিশুর আগ্রহ যে অপরিহার্য একথাও ডিউই বার বার বলে গেছেন। আগ্রহ হল সেই স্ফুলিঙ্গ যা শিশুর জ্ঞানের শিখাকে জ্বালাবে। তাছাড়া ডিউইর মতে আগ্রহ এবং প্রচেষ্টা পরস্পর বিরোধী নয়। শিশুর প্রকৃত আগ্রহ জাগলে প্রচেষ্টা স্বতঃপ্রণোদিতভাবেই দেখা দেবে। কেননা কোন কাজে যখন স্বাভাবিক আগ্রহ জন্মায় তখনই প্রচেষ্টা দেখা দেয়।

শিক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে ডিউইর শেষ কথা হল যে সমস্ত শেখার মূলেই আছে চিন্তন। সার্থক চিন্তন থেকেই শিখন আসে। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে ডিউইর মতে শিখনের প্রকৃত পদ্ধতিই হল চিন্তন। অতএব এই চিন্তনকে ঠিকমত নিয়ন্ত্রিত করতে পারলেই কার্যকরী শিখন ঘটে থাকে। চিন্তনের যথাযথ প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন (১)কোন একটি কাজের সম্পাদন (২)সমস্যার উপলব্ধি যা থেকে চিন্তনের সুরু হয় (৩)প্রয়োজনীয় তথ্যের অধিকারী হওয়া ও সেইমত পর্যবেক্ষণ করা (৪)কোন একটি সমাধান ঠিক করতে পারা এবং (৫)সমাধানটিকে বাস্তবে পরীক্ষা করে দেখা।

চিন্তনের এই অপরিহার্য অঙ্গগুলি থেকেই ডিউইর প্রসিদ্ধ পাঁচটি সোপানের উৎপত্তি হয়েছে এবং সমস্যা-পদ্ধতি (Problem Method) নামে শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবন হয়েছে। এ সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

ডিউইর শিক্ষানীতির সারসংক্ষেপ

শিক্ষার দার্শনিক তত্ত্ব, পদ্ধতি ও বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে ডিউই এত ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছেন এবং এত অভিনব তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন যে সংক্ষেপে সেগুলিকে উল্লেখ করা নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার। তবু তাঁর শিক্ষানীতির প্রধানতম কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ নীচে করা হল।

(১) শিক্ষা নিছক তথ্য-সংগ্রহ বা নিষ্ক্রিয় জ্ঞান-অর্জন নয়। শিক্ষা ব্যক্তির ক্রমবিকাশ বা বৃদ্ধির সঙ্গে সমার্থক। বৃদ্ধি বলতে বোঝায় ব্যক্তির অস্তিত্বের সব কটি দিকের নিজস্ব পরিণতির গতিপথ ধরে এগিয়ে যাওয়া। এই গতিপথ

নির্ধারিত করে দেয় দুটি বস্তু—একটি, ব্যক্তির নিজের আভ্যন্তরীণ সংগঠন এবং অপরটি, যে সমাজে সে বাস করে সেই সমাজের বিভিন্ন শক্তি।

(২) ব্যক্তির এই ক্রমবিকাশ বা বৃদ্ধি ব্যক্তির কাছে দেখা দেয় অভিজ্ঞতার রূপে। বিভিন্ন পারিবেশিক শক্তির বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির অভিজ্ঞতার স্বরূপ ও প্রকৃতি বদলে যায়। যেহেতু পরিবেশ চিরপরিবর্তনশীল, শিক্ষা হল ব্যক্তির অভিজ্ঞতার বিরামহীন পুনর্গঠন ও পুনঃসৃজন।

(৩) শিক্ষা যখন অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন তখন শিক্ষা নিষ্ক্রিয় কোন বস্তু নয়। শিক্ষা হল চিরপরিবর্তনশীল, গতিময়, ছেদহীন একটি প্রক্রিয়াবিশেষ।

(৪) কোন প্রক্রিয়ারই কোন বহির্স্থিত লক্ষ্য থাকতে পারে না—প্রক্রিয়ার লক্ষ্য প্রক্রিয়াটির মধ্যেই থাকে। শিক্ষাও একটি প্রক্রিয়া, অতএব শিক্ষার কোন লক্ষ্য থাকতে পারে না। সেই হেতু প্রচলিত যত লক্ষ্য শিক্ষার উপর চাপানো হয়ে থাকে তার কোনটিই শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হতে পারে না। বৃদ্ধির একমাত্র লক্ষ্য আরও বৃদ্ধি, আর শিক্ষা ও বৃদ্ধি সমার্থক হওয়ায় শিক্ষার একমাত্র সম্ভাব্য লক্ষ্য হল আরও শিক্ষা।

(৫) শিক্ষাকে কেবলমাত্র একটি প্রক্রিয়া বললেই সব বলা হল না, শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। ব্যক্তির অভিজ্ঞতা একা একা বা শূন্য পরিবেশে ঘটে না, সমাজের আর সকল সদস্যদের সঙ্গে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে থাকে। তাছাড়া শিক্ষা হল সমাজেরই আত্ম-সংরক্ষণের অপরিহার্য উপকরণ বিশেষ এবং অপরিণত ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সমাজের উপযোগী করে তোলার জন্য সমাজের পক্ষ থেকেই শিক্ষা দেবার আয়োজন করা হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীর পরিবেশকে প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রন ও পরিবর্তন করে সমাজের পক্ষে অপরিহার্য আচরণ ও কৌশলগুলির তাকে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। বিদ্যালয় হল এই ধরনের একটি মাধ্যম যার পরিবেশকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে এই শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে।

(৬) সমাজজীবনের উপযোগী শিক্ষাদানের জন্য বিশেষভাবে সৃষ্ট পরিবেশ-সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানই হল বিদ্যালয়। অতএব বিদ্যালয় সমাজের সম্পূর্ণ জীবনটিকে নিখুঁতভাবে তার পরিবেশের মধ্যে প্রতিফলিত করবে, যাতে শিশু সেই পরিবেশে মানুষ হয়ে যথার্থ সমাজধর্মী নাগরিক হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ বিদ্যালয় হবে সমাজেরই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ।

(৭) প্রকৃত জ্ঞান বা সত্য কখনও নিষ্ক্রিয়ভাবে আহরণ করা যায় না।

সত্য আহরণের একমাত্র মাধ্যম হল সক্রিয়তা। কোন কাজ করতে করতে যখন ব্যক্তি বাধা পায় তখন সে যে সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং সেই সমস্যার সমাধান যখন সে করতে পারে তখনই তার নতুন জ্ঞান বা সত্যের লাভ হয়। এছাড়া অন্য কোন উপায়ে বা পথে সে সত্য বা নতুন জ্ঞানের সন্ধান পেতে পারে না। অতএব সার্থক শিক্ষামাত্রেই সম্পন্ন হবে সক্রিয়তার মাধ্যমে।

(৮) সক্রিয়তা যদি সত্য বা নতুন জ্ঞান লাভের মাধ্যম হয় চিন্তন হয় তার পন্থা। চিন্তন বলতে অবশ্য অলস কল্পনাবিলাসী চিন্তনকে বোঝায় না, বোঝায় মননমূলক উদ্দেশ্যসম্পন্ন চিন্তনকে। এই চিন্তনের সাহায্যে ব্যক্তি তার পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগায় বর্তমানের সমস্যা সমাধানে এবং শেষ পর্যন্ত সত্য বা নতুন জ্ঞানে পৌছয়। সক্রিয়তা ও চিন্তনের উপর এই অভিনব তত্ত্ব থেকেই ডিউই সমস্যা-পদ্ধতি (Problem Method) নামে শিক্ষাদানের নতুন এক পদ্ধতি উদ্ভাবিত করেন।

(৯) শিক্ষায় আর একটি অপরিহার্য বস্তু হল শিশুর আগ্রহ। আগ্রহ স্বতঃপ্রসূত স্বাভাবিক আভ্যন্তরীণ শক্তিবিশেষ এবং আগ্রহ জাগলে প্রচেষ্টা স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দেয়।

(১০) সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলের সঙ্গে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যখন শিক্ষা আসে তখন সামাজিক সংগঠনের স্বরূপের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে শিক্ষার প্রকৃতি ও সার্থকতা। ডিউইর মতে গণতন্ত্র হল এদিক দিয়ে আদর্শ সামাজিক সংগঠন। সেখানে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা কোন দিক দিয়ে বাধাপ্রাপ্ত বা প্রতিহত হয় না বলে তার অভিজ্ঞতা হয় অসীম ও বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং তার ফলে তার শিক্ষাও হয় সুসমৃদ্ধ ও উন্নত।

(১১) ডিউইর মতে শৃঙ্খলারক্ষার সমস্যা সত্যকারের সমাজধর্মী পরিবেশে কোন সমস্যাই নয়। যে সব বিদ্যালয়ের পরিবেশ অসামাজিক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোন সামাজিক চেতনার উপলব্ধি নেই সেখানে বহির্জাত ও পীড়নমূলক পন্থার সাহায্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হয়। কিন্তু যদি পরিবেশটি সমাজধর্মী হয় তবে শৃঙ্খলা স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থীদের সামাজিক সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ থেকে দেখা দেবে।

(১২) শিক্ষায় শিশুকে সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা দিতে হবে যাতে তার বিভিন্ন বৃদ্ধি প্রচেষ্টা বিনা বাধায় স্বপরিণতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। ডিউই পূর্ণ শিশু-স্বাধীনতার পক্ষপাতী হলেও উদ্দেশ্যহীন ও অসংযত স্বাধীনতাকে কথনই

সমর্থন করেন না। তাঁর মতে যে স্বাধীনতা সৃজনধর্মী আত্ম-অভিব্যক্তির রূপ নেবে তাই হবে প্রকৃত স্বাধীনতা। এর জন্য শিশুকে অভীষ্ট পথে পরিচালনা করতে হবে, কিন্তু কোনরূপে তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে নয়। পরিবেশকে বিচক্ষণতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করে শিশুর অভ্যন্তরস্থ স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ প্রচেষ্টাকে সুষ্ঠু পথে পরিচালনা করাই সুশিক্ষার প্রধানতম কর্মসূচী।

ডিউইর শিক্ষায় অবদান

বহুশতাব্দী ধরে প্রচলিত অন্তঃসারশূন্য ও আকারসর্বস্ব প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার নীতি ও পদ্ধতিগুলির প্রতিবাদ করে প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার নতুন ভাবধারার সন্ধান দিয়ে যান রুশো। পেস্টালৎসী, ফ্রয়েবেল ও হার্বাট সেই আদর্শের বিশেষ বিশেষ দিককে অনুসরণ করে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে আংশিকভাবে বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু নিজের প্রতিভা, গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সযত্ন অধ্যবসায়ের সাহায্যে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে গড়ে তোলার কৃতিত্ব জন ডিউইরই। আমেরিকার অংসহত ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের কাজেই তাঁর নীতি ও পদ্ধতির প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ হলেও, ডিউইর বৈপ্লবিক ভাবধারা, শিক্ষার অভিনব সংব্যাখ্যান ও নানা জটিল শিক্ষাসমস্যার অপরূপ সমাধান সারা পৃথিবীর শিক্ষাবিদকেই প্রভাবিত করেছে এবং বর্তমানে সমস্ত প্রগতিশীল দেশের শিক্ষাব্যবস্থাতেই তাঁর শিক্ষাতত্ত্ব, পদ্ধতি ও অন্যান্য নির্দেশ অল্পবিস্তরভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে।

প্রথমত, ডিউইর শিক্ষাঘটিত মতামতগুলির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল যে তাঁর কোন মত বা নির্দেশই নিছক কল্পনাজাত বা অনুভূতিপ্রসূত নয়, সবগুলিই সুপ্রমাণিত দার্শনিক তত্ত্ব, মনোবৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং নিজের পরীক্ষণলব্ধ ফলাফলের উপর প্রতিষ্ঠিত। যুক্তি ও প্রমাণের সবল আবেদন তাঁর সমস্ত মতবাদের পেছনে থাকায়, সেগুলি যেমন একদিকে সর্বজনগ্রাহ্য হতে পেরেছে তেমনই অপরদিকে শিক্ষাশাস্ত্রকে নিছক জল্পনা-কল্পনার স্তর থেকে তুলে পরিপূর্ণ বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নত করেছে।

দ্বিতীয়ত, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার যে সব মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি রুশো তাঁর গভীর অনুভূতির দ্বারা কল্পনা করেছিলেন, সেগুলির প্রকৃত গুরুত্ব ও মূল্য যাচাই

করে বাস্তব শিক্ষা পরিকল্পনায় সেগুলির যথাযথ স্থান নির্ণয় করার গুরুভার পড়েছিল ডিউইর উপর। বস্তুত শিশু স্বাধীনতা, সক্রিয়তা, মূর্তবস্তুর মাধ্যমে শিক্ষণ, প্রকৃতি-বীক্ষণ প্রভৃতি ডিউইর শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির প্রত্যেকটিই রুশোর মতবাদে পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলির দার্শনিক, মনোবৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক মূল্য নিখুঁতভাবে নিরূপণ করে গেছেন জন ডিউই।

তৃতীয়ত, শিক্ষার প্রচলিত সংকীর্ণ সংজ্ঞাকে বিসর্জন দিয়ে অভিনব ব্যাপক সংজ্ঞা দান করে শিক্ষার মর্যাদা ও প্রয়োজনীয়তা দুইই অভাবিত মাত্রায় বাড়িয়ে দিয়ে গেছেন ডিউই। শিক্ষা এখন কতিপয়ের ইচ্ছানির্ভর মানসিক বা সাংস্কৃতিক সৌকর্যসাধন নয়, শিক্ষা প্রত্যেকের অস্তিত্বরক্ষার অপরিহার্য উপকরণ। ডিউইর দেওয়া শিক্ষার এই নবতম সংব্যাখ্যান থেকেই এসেছে আধুনিক কালের গণতান্ত্রিক সর্বজনীন শিক্ষার আদর্শ।

চতুর্থত, আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী দর্শনের (Educational Philosophy) প্রকৃত জন্মদাতা হলেন জন ডিউই। ইতিপূর্বে বহু শিক্ষাবিদই শিক্ষাতত্ত্বের বিশ্লেষণে দার্শনিক চিন্তার অবতারণা করেছেন, কিন্তু সেগুলি দার্শনিক তত্ত্বই থেকে গেছে, প্রকৃত শিক্ষাতত্ত্ব হয় নি। এদিক দিয়ে অবশ্য ফ্রয়েবেলই প্রথম শিক্ষার দার্শনিক সংব্যাখ্যান দানে কিছুটা সাফল্য লাভ করেন। কিন্তু সত্যকারের শিক্ষাতত্ত্বের সুসংহত ও যুক্তিনির্ভর দার্শনিক ভিত্তি স্থাপন করে যান জন ডিউই। তাঁর মৌলিক দার্শনিক মতবাদের প্রতি অনেক শিক্ষাবিদের সমর্থন না থাকলেও তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের সংব্যাখ্যান মেনে নিতে তাঁরা বিশেষ দ্বিধা করেন নি।

পঞ্চমত, প্রকৃত শিক্ষা যে কর্মসম্পাদন ছাড়া আসে না—ডিউইর এই অভিনব মতবাদ থেকেই জন্ম নিয়েছে শিক্ষাকে সক্রিয়তা ভিত্তিক করার পৃথিবীব্যাপী আন্দোলন। তাঁর এই নতুন শিক্ষাপরিকল্পনা পৃথিবীর সর্বত্রই গৃহীত হয়েছে এবং প্রচলিত লিখন-পঠন-সর্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

ষষ্ঠত, শিক্ষার প্রচলিত সংকীর্ণ লক্ষ্যগুলিকে অবাস্তব ঘোষণা করে এবং শিক্ষাকে শিশুর জীবনধারণের সঙ্গে সমার্থক বলে বর্ণনা করে ডিউই সমগ্র শিক্ষার পরিকল্পনাকে নতুন ছাঁচে ঢেলেছেন। পিতামাতা, শিক্ষক, বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ, শিক্ষানীতি-নির্ধারক প্রভৃতি সকলেই শিক্ষার এই অতিব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পর্কে ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে উঠছেন এবং সংকীর্ণ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সৃষ্ট প্রচলিত শিক্ষায়তনগুলির স্থানে শিশুর পূর্ণ ব্যক্তিসত্তা গঠনে সক্ষম সার্থক শিক্ষার মাধ্যম সৃষ্টির চেষ্টা করছেন।

সপ্তমত, গতানুগতিক বিদ্যালয়গুলিতে অনুসৃত নীতি, পদ্ধতি, পাঠক্রম প্রভৃতির ব্যাপক সংস্কারসাধনও ডিউইর মতবাদের প্রত্যক্ষ ফল। বিশেষ করে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠতম করা এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশকে সমাজধর্মী করে তোলার বর্তমান আন্দোলন ডিউইর আদর্শজাত। এর ফলে আধুনিক বিদ্যালয়গুলির আভ্যন্তরীণ পরিবেশ, পাঠক্রম ও সংগঠনে আমূল পরিবর্তন এসেছে।

অষ্টমত, ডিউইর আধুনিক শিক্ষার আর একটি উল্লেখযোগ্য দান হল সমাজধর্মী ভাবধারার উপর শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে প্রতিষ্ঠিত করা। ডিউইর মতে সামাজিক আব-হাওয়া ছাড়া শিক্ষা হয় না এবং যে পরিবেশ যত সমাজধর্মী সে পরিবেশে শিক্ষাও তত উৎকৃষ্ট ও সার্থক হয়ে উঠবে। শিশুর প্রকৃত শিক্ষা আসবে যৌথ কর্মসম্পাদন, সম্মিলিত উদ্যোগ ইত্যাদি সামাজিক আচরণের মধ্যে দিয়ে। তাঁর মতে গণতন্ত্রই হল শিক্ষার পক্ষে আদর্শ সমাজ। সমাজতত্ত্বমূলক ভাবধারার সঙ্গে শিক্ষাতত্ত্বের এই সমন্বয়ন ডিউইর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এর দ্বারা তিনি ব্যক্তির নিজস্ব বৃদ্ধি ও সমাজের যৌথ উন্নতি এ দুয়ের মধ্যে যুগযুগান্তরের বিবাদ দূর ত করলেনই এমন কি এ দুটিকে পরস্পর নির্ভরশীল বস্তু বলে প্রমাণ করলেন।

নবমত, পদ্ধতিতত্ত্বের দিক দিয়েও ডিউইর অবদান কম নয়। সক্রিয়তা ও চিন্তনকে ভিত্তি করে প্রকৃত শিক্ষা হবে এই হল ডিউইর উদ্ভাবিত সমস্যাপদ্ধতির (Problem Method) মূলকথা। ডিউইর পদ্ধতিটির গঠনমূলক জটিলতার জন্য সেটিকে বাস্তবে প্রয়োগ করা দুরূহ ছিল। কিন্তু তাঁর পদ্ধতির মৌলিক তত্ত্বটিকে ভিত্তি করে তাঁরই অনুরাগী শিষ্য কিলপ্যাট্রিক প্রসিদ্ধ প্রজেক্ট মেথডের (Pıoject Method) উদ্ভাবন করেন। বর্তমানে পৃথিবীর সমস্ত দেশের শিক্ষাব্যবস্থাতেই কিলপ্যাট্রিকের প্রজেক্ট মেথড ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

দশমত, ডিউইর, সক্রিয়তাকে শিক্ষার মাধ্যম বলে স্বীকার করলেও চিন্তনকেও শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ বলে বর্ণনা করে গেছেন। তাঁর মতে সক্রিয়তার মাধ্যমে এবং চিন্তনের সাহায্যে আসবে সত্যকারের শিক্ষা। অনেকে ডিউইর শিক্ষা-পরিকল্পনাকে নিছক দৈহিক অঙ্গসঞ্চালন ও কর্মসম্পাদনে সীমাবদ্ধ বলে মনে করেন। কিন্তু ডিউইর মতে সমস্ত কাজের পেছনে যদি সত্যকারের মননমূলক চিন্তন না থাকে তাহলে সমস্ত কর্মসম্পাদনই বৃথা হবে এবং সক্রিয়তার মূল লক্ষ্য যে সত্য আহরণ তাই সম্ভব হয়ে উঠবে না।

তেইশ

মারিয়া মণ্টেসরি (Maria Montessori)

প্রগতিশীল শিক্ষার ভাবধারাকে ভিত্তি করে যে কয়জন শিক্ষাবিদ নতুন শিক্ষা-পরিকল্পনার সৃষ্টি করে শিক্ষার ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করে গেছেন তাঁদের মধ্যে মারিয়া মণ্টেসরি অন্যতমা। শিক্ষার জগতে জনপ্রিয়তা ও বহুল প্রচারের দিক দিয়ে ফ্রয়েবেলের কিণ্ডারগার্টেন প্রথার পরই মণ্টেসরি শিক্ষাব্যবস্থার নাম করা যায়।

মারিয়া মণ্টেসরি ইটালির আঙ্কোনা প্রদেশে ১৮৭০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই প্রথম ইটালীয় মহিলা যিনি এম্-ডি হবার গৌরব অর্জন করেন এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েই মানসিক চিকিৎসাবিভাগে সহকারী চিকিৎসকের পদ গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি প্রসিদ্ধ ইটালীয় চিকিৎসক সেগুঁই (Seguin) ও ইট্রাডের (Itrad) সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁদের অনুসৃত ক্ষীণবুদ্ধি (feebleminded) ও ত্রুটিসম্পন্ন (defective) ছেলেমেয়েদের চিকিৎসার অভিনব পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ লাভ করেন। সেগুঁই এবং ইট্রাড তাঁদের বিশিষ্ট পদ্ধতির দ্বারা মানসিক ও দৈহিক ত্রুটিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের মধ্যে অভাবনীয় উন্নতি আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। মণ্টেসরি তাঁদের চিকিৎসাপদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে যদি এই পদ্ধতিতে ত্রুটিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের উন্নতি হতে পারে তাহলে স্বাভাবিক ও ত্রুটিহীন ছেলেমেয়েদের উপর ঐ একই পদ্ধতি প্রয়োগ করলে আরও অনেক ভাল ফল পাওয়া যাবে।

এই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ১৯০৭ সালে চিল্‌ড্‌রেনস্ হাউস (Children's House) নামে একটি স্কুলে তাঁর পদ্ধতির প্রয়োগ করেন এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করলেন। ১৯০৯ সালে তিনি তাঁর এই পদ্ধতির উপর প্রথম এবং ১৯১২ সালে দ্বিতীয় বই লেখেন। শীঘ্রই তাঁর এই পদ্ধতি মণ্টেসরি পদ্ধতি নামে খ্যাতি লাভ করে এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রগতিশীল দেশেই তাঁর পদ্ধতি বহুলভাবে অনুসৃত হতে শুরু হয়।

১৯৫২ সালে মারিয়া মণ্টেসরির মৃত্যু হয়। এই সুদীর্ঘ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই তিনি তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির উন্নতি ও সংস্কারের পিছনেই উৎসর্গ করেন এবং তাঁর অদম্য উৎসাহ ও অসীম প্রেরণার ফলেই আজ লণ্ডন, নিউইয়র্ক, টোকিও প্রভৃতি বিরাটকায় শহর থেকে সুরু করে আফ্রিকার অন্ধকারতম গ্রামেও তাঁর শিক্ষার অগ্নিশিখা অনির্বাণভাবে প্রজ্বলিত রয়েছে।

মণ্টেসরির শিক্ষাপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

মণ্টেসরি শিক্ষার কোন দার্শনিক সংব্যাখ্যান দেবার চেষ্টা করেননি। তবে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ বহুলাংশে ফ্রয়েবেলের শিক্ষা-তত্ত্বের সঙ্গে মিলে যায়। ফ্রয়েবেলের মত মণ্টেসরিও বিশ্বাস করেন যে শিক্ষা হল শিশুর আভ্যন্তরীণ সম্ভাবনার উন্মেষণ বা বিকাশ। অতএব শিশুর শিক্ষায় বাইরের কোন শক্তির হস্তক্ষেপের স্থান নেই। শিশুর শিক্ষা হবে স্বতঃপ্রণোদিত ও স্বতঃস্ফূর্ত। সেইজন্য তাকে দিতে হবে পূর্ণ স্বাধীনতা। এই থেকেই জন্ম নিয়েছে মণ্টেসরির প্রসিদ্ধ স্বয়ং-শিক্ষার (auto-education) পরিকল্পনা।

পূর্ণ স্বাধীনতা

মণ্টেসরি পদ্ধতির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল শিশুর সর্বাঙ্গীণ ও নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা। মণ্টেসরির মতে শিশুর বৃদ্ধি বা ক্রমবিকাশ যাতে বাধাহীনভাবে তার পূর্ণপরিণতিতে গিয়ে পৌছতে পারে সেইজন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন। মণ্টেসরি স্বাধীনতার একটা নতুন সংব্যাখ্যান দিয়েছেন। তাঁর মতে শিশুকে ইচ্ছামত আচরণ করার ক্ষমতা দেওয়াকেই স্বাধীনতা বলা চলে না। গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় নানাবিধ প্রথা, ব্যবস্থা, নিয়মকানুনের দ্বারা শিশুর স্বচ্ছন্দ আচরণকে শৃঙ্খলিত করে রাখা হয়েছে। এই সব বাধা বন্ধন যা শিশুকে চারপাশ থেকে ঘিরে আছে সেগুলির অপসারণকেই প্রকৃত স্বাধীনতা বলে। রুশো, পেস্টালৎসী, ফ্রয়েবেল প্রভৃতি শিক্ষাবিদেরা শিশু স্বাধীনতার উগ্র সমর্থক হলেও স্বাধীনতার এই বাস্তবধর্মী ব্যাখ্যা দেওয়ার কৃতিত্ব মণ্টেসরিরই।

মণ্টেসরি প্রথমেই তাঁর বিদ্যালয় থেকে বহুযুগ ধরে প্রচলিত বেঞ্চে বসার প্রথা উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় ছোট ছোট হাল্কা টেবিল ও চেয়ার স্থাপন করলেন। তাঁর মতে বেঞ্চগুলি ছিল যুগযুগান্তের শিশুদের গতিহীনতার প্রতীক। এই চেয়ার-টেবিলগুলি শিশুরা নিজেরাই নাড়াচাড়া করতে পারে। তার ফলে তাদের স্বচ্ছন্দ ও বিকাশমূলক আচরণে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি হবার আর কোন সম্ভাবনা থাকল না।

গতানুগতিক শাসনমূলক শৃঙ্খলার কোন স্থান নেই মণ্টেসরির নতুন শিক্ষা-পরিকল্পনায়। রক্তচক্ষু তর্জনকারিণী কর্তৃত্বময়ী শিক্ষিকাদের স্থানে এলেন হাস্যময়ী সহানুভূতিশীলা পরিচালিকার (directress) দল। তাঁদের কাজ শিশুকে কিছু শেখান নয় বা তার কোন কাজে বাধা দেওয়াও নয়। তাঁদের একমাত্র কাজ নিষ্ক্রিয়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে যাওয়া, যেমন করেন জ্যোতির্বিদ দূরবীক্ষণ যন্ত্র চোখে দিয়ে নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা হিসাবে আর দেখেন অগণিত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর চোখের সামনে দিয়ে ঘুরে চলেছে। শিশুর সমস্ত কাজই পরিচালিকারা পর্যবেক্ষণ করবেন বৈজ্ঞানিক কৌতূহল নিয়ে এবং দেখে যাবেন যে কেমন করে শিশু ধীরে ধীরে স্বতঃপ্রণোদিত-ভাবে সুসমৃদ্ধ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষে পরিণত হয়।

স্বতঃপ্রসূত শৃঙ্খলা

এ থেকে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে যে মণ্টেসরি শিক্ষাব্যবস্থায় তাহলে শৃঙ্খলা বজায় রাখা কি ভাবে সম্ভব হয়। কিন্তু মণ্টেসরি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে গতানুগতিক শাসনধর্মী ও উৎপীড়নমূলক পন্থায় সত্যকারের শৃঙ্খলা রাখা যায় না। শৃঙ্খলা সত্যকারের আসে স্বাধীন কর্মের মধ্যে দিয়ে। তাঁর মতে শাসনের কাছে আত্মসমর্পণের নাম শৃঙ্খলা নয়, শৃঙ্খলা হল স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারার ক্ষমতা। স্বাধীনতায় শৃঙ্খলা পুষ্টিলাভ করে, শাসনে শীর্ণ হয়ে যায়। মণ্টেসরির এই আদর্শ অনুযায়ী তাঁর বিদ্যালয়গুলি থেকে শাসন, কঠোর নিয়ম-কানুন, বাঁধাধরা বিধি-নিষেধ ইত্যাদিকে নির্বাসন দেওয়া হল। তার স্থানে শিশুকে দেওয়া হল চলা, ফেরা, খেলা ও কাজ করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা।

মণ্টেসরির বিদ্যালয়েতে পুরস্কার এবং শাস্তিরও কোন স্থান ছিল না। তাঁর মতে শাস্তি এবং পুরস্কার দুইই অর্থহীন ও কোন দিক দিয়েই কার্যকরী নয়।

শাস্তি শিশুর দোষকে দূর ত করে না বরং তার নৈতিক অবনতি আনে। পুরস্কারও শিশুর মধ্যে লোভ ও অহঙ্কার সৃষ্টি করে।

সাধারণত মণ্টেসরি স্কুলে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য শাস্তির কোন প্রয়োজন হয় না। তবে মাঝে মাঝে যখন তেমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তখন সাধারণ গতানুগতিক প্রথায় শাস্তি না দিয়ে বিশেষ একটি পন্থায় শৃঙ্খলা রক্ষা করা হয়। যদি দেখা যায় যে কোন শিশু খুব গোলমাল করছে বা শান্তিভঙ্গ করছে পরিচালিকা তাকে তখন শান্তভাবে বলেন যে সে ভুল করছে বা অশোভনতা প্রকাশ করছে। তাতেও যদি ফল না পাওয়া যায়, তখন তাকে ঐ দল থেকে সরিয়ে ঘরের এক কোণে একটি আরামকেদারায় বসিয়ে তার খেলনাপত্র তার সামনে রেখে দেওয়া হয়। ছেলেটি সেখান থেকে দলের আর সকলের কার্যকলাপ দেখে এবং শীঘ্রই ঐ দলে ফিরে আসার ইচ্ছা অনুভব করে।

সক্রিয়তা

স্বাধীনতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে আসে সক্রিয়তার চাহিদা। মণ্টেসরির মতে স্বাধীনতাই সক্রিয়তা (Liberty is Activity)। বস্তুত সক্রিয়তা হল জীবনের ভিত্তি এবং শিশুকে চলাফেরা করতে এবং কাজ করতে শেখানোর অর্থ ই হল তাকে জীবনের জন্য শিক্ষা দেওয়া এবং সেটাই হল বিদ্যালয়ের প্রকৃত কাজ। মণ্টেসরির ভাষায় জীবনের অপরিহার্য বস্তু হল গতি এবং গতিকে ব্যাহত করা বা ক্ষুণ্ণ করা কখনই শিক্ষার কাজ হতে পারে না। এই জন্যই দেখা যাবে যে মণ্টেসরি স্কুলে ছেলেমেয়েদের সর্বাঙ্গীণ অস্তিত্বের সঙ্গে কেমন অভিন্ন হয়ে মিশে গেছে এই নির্বাধ গতির ছন্দ। যত ছোট হোক না কেন, তার নিজের সব কাজই তাকে করতে হয়। স্কুলের ঘর তারা নিজেরাই গুছোয়, ধুলো ঝাড়ে, চেয়ার টেবিল সাজায়, আবার কাজ হয়ে গেলে সেগুলিকে উঠিয়ে রাখে। তাছাড়া নিজেদের প্রয়োজন নিজেরাই মেটায়, নিজেদের সাজসরঞ্জামের যত্ন নেয় এবং আরও অনেক প্রয়োজনীয় কাজ করে। তিন-চার বছরের ছেলেমেয়েরা গ্লাস, ডিশ ইত্যাদি ব্যবহার করতে শেখে এবং খাবার টেবিলে খাবার হাতে হাতে বিলোতে জানে। মণ্টেসরির মতে শিশুকে সাহায্যদানের প্রথা তার স্বাভাবিক শক্তির বিকাশে বাধাই সৃষ্টি করে। তাদের নিজেদের কাজ নিজেদেরই করার পূর্ণ সুযোগ দেওয়া উচিত। শিশুকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিলে তার আভ্যন্তরীণ সম্ভাবনাগুলির পূর্ণ বিকাশ হবে এবং তার বৃদ্ধি ক্রমশ আদর্শ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবে।

ইন্দ্রিয়-অনুশীলন (Training of senses)

কিন্তু মণ্টেসরি পদ্ধতির সব চেয়ে অভিনব এবং উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সেই সব যন্ত্রপাতি যা মণ্টেসরি শিশুর ইন্দ্রিয়গুলির অনুশীলন ও উৎকর্ষসাধনের জন্য উদ্ভাবন করেছিলেন। এই যন্ত্রপাতিগুলির পরিকল্পনা অবশ্য মণ্টেসরি ইট্রাড ও সেগুঁইয়ের কাছ থেকে পুরোপুরিই নিয়েছিলেন। কিন্তু পার্থক্যের মধ্যে হল তাঁরা ঐগুলির ব্যবহার করতেন মানসিক ত্রুটিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য আর মণ্টেসরি ব্যবহার করতেন সেগুলি স্বাভাবিক ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য।

এই সাজসরঞ্জামগুলি বৈজ্ঞানিক পন্থায় প্রস্তুত এবং এগুলির ব্যবহারে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রই যে প্রসারিত হয় তাই নয় বুদ্ধির বিকাশের সবল ও সুসমৃদ্ধ ভিত্তি গঠিত হয়। বস্তুত আমাদের আচরণগত ধারণাগুলি তৈরী হয় পরিবেশকে জানা এবং চেনার মধ্যে দিয়ে এবং যেহেতু এই জানা এবং চেনা কাজগুলি সম্পন্ন হয় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সেহেতু যতই ইন্দ্রিয়গুলি উন্নত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হবে ততই আমাদের ধারণা ও প্রত্যক্ষণের ভিত্তি সুদৃঢ় ও নিখুঁত হয়ে উঠবে।

দ্বিতীয়ত স্কুলে আসার আগে থেকেই শিশু কোনরূপ বাইরের পরিচালনা ও সাহায্য ছাড়াই অসংখ্য ধারণা ও মনোভাব নিজস্ব করে নেয়। ফলে এই ধারণাগুলি পুঞ্জীভূত হয়ে তার অচেতন মনে একটি বিপর্যস্ত অথচ সুসমৃদ্ধ ভাবসমষ্টির সৃষ্টি করে। এর জন্য প্রয়োজন শিশু বড় হলে যাতে তার পরিবেশকে নতুন করে আবিষ্কার করতে এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তাকে জানতে পারে তার সুযোগ দেওয়া। মণ্টেসরির মতে ইন্দ্রিয়গুলির উৎকর্ষসাধনই হল পরিবেশকে ভাল করে জানার সব চেয়ে উৎকৃষ্ট উপায় এবং এই উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় ইন্দ্রিয় অনুশীলনের উপযোগী সরঞ্জামের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রেখেছেন।

শিক্ষামূলক সরঞ্জাম (Didactic Apparatus)

মণ্টেসরির প্রবর্তিত ইন্দ্রিয় অনুশীলনের উপকরণগুলি শিক্ষামূলক সরঞ্জাম (Didactic Apparatus) নামে পরিচিত। এগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হল শিশুর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা ও তুলনা করার শক্তিকে বাড়ান। যেমন, কতকগুলি ছোট ছোট কাঠের টুকরোর উপর সব চেয়ে মসৃণ থেকে সুরু

করে সব চেয়ে কর্কশ শিরিষ কাগজ (Sand paper) লাগান থাকে। তারপর চোখ বাঁধা অবস্থায় ছেলেমেয়েরা সেগুলির উপর হাত বুলিয়ে তাদের পার্থক্য নির্ণয় করার ক্ষমতা অর্জন করে। একই উপায়ে গঠন, আকৃতি, রঙ প্রভৃতির ক্ষেত্রেও পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষমতা অর্জনের জন্য স্বতন্ত্র সরঞ্জামের ব্যবস্থা আছে। মণ্টেসরি পদ্ধতিতে পড়তে ও লিখতে শেখানর সময়ও চোখে দেখা ও কানে শোনার সঙ্গে সঙ্গে স্পর্শেন্দ্রিয়ের ব্যবহারও শেখান হয় এবং বিশ্বাস করা হয় যে এর দ্বারা শিশুর পঠন ও লিখনের জ্ঞান আরও উন্নত ও কার্যকরী হবে। যেমন শিরিষ কাগজ দিয়ে তৈরী বর্ণমালা চৌকো চৌকো কাডবোর্ডের উপর আঁটা থাকে এবং শিশু সেগুলির উপর হাত বুলিয়ে অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত হয়। অনুরূপ পদ্ধতির সাহায্যে শোনা, দেখা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিরও উৎকর্ষসাধন করা হয়ে থাকে। শব্দ এবং শব্দাংশের উচ্চারণের অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুর বাচন-ক্ষমতার উন্নতি করা হয়। কোন কোন সরঞ্জামের আবার একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। সরঞ্জামটি নিজে নিজেই শিশুর ভুলকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অর্থাৎ যদি শিশু কোন ভুল করে ফেলে তবে সরঞ্জামটি নিজে থেকেই সেই ভুল শিশুকে দেখিয়ে দেবে। এমন কি এই অবস্থায় সরঞ্জামটি কাজ করতে করতে বন্ধ হয়েও যায়। তার ফলে শিশুর সামনে সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং নিজের প্রচেষ্টায় তাকে সেই সমস্যাটির সমাধান করতে হয়। মণ্টেসরির সরঞ্জামগুলির এই আত্মসংশোধনমূলক প্রকৃতির জন্য শিশুর ক্রমবিকাশ নিখুঁত ও ত্রুটিহীন হয়ে ওঠে।

মণ্টেসরির সরঞ্জামগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এগুলির সৌন্দর্যানুভূতির দিকটা। শিশুর চারপাশে যা কিছু থাকে সে সবগুলির মধ্যে রঙ, যাতে ঔজ্জ্বল্য, আকৃতির সামঞ্জস্য প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি থাকে তারে ব্যবস্থা করা মণ্টেসরির পরিকল্পনার একটা বড় অঙ্গ। মণ্টেসরির প্রবর্তিত সরঞ্জামগুলিও গঠন, আকৃতি ও রঙের দিক দিয়ে এতই আকর্ষণীয় যে শিশুর সৌন্দর্যবোধ জাগানোর পক্ষে তারা পরম সহায়ক। কেবল এই বিশেষ সরঞ্জামগুলিই নয়, শিশুর চারপাশের সমগ্র পরিবেশটিকেই এমন আকর্ষণীয় করে তোলা হয় যে শিশু তার প্রতি আকৃষ্ট না হয়েই পারে না।

মণ্টেসরির এই শিক্ষামূলক সরঞ্জামগুলি দুশ্রেণীর—ইন্দ্রিয়মূলক ও বিকাশ-মূলক। প্রথম শ্রেণীটির কাজ হল ইন্দ্রিয়গুলিকে উন্নত করা আর দ্বিতীয় শ্রেণীটির কাজ হল, লিখন, পঠন, গণিত এবং অন্যান্য কাজে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া। ইন্দ্রিয়মূলক সরঞ্জামগুলি দ্বারা শিশুর স্পর্শ, আস্বাদ, শ্রবণ, দর্শন

ইত্যাদি ঘটিত ইন্দ্রিয়গুলি ছাড়াও উত্তাপ, ভারসাম্য, ত্রি-আয়তন, ইত্যাদি ঘটিত ইন্দ্রিয়গুলিরও চর্চা হয়ে থাকে। বিকাশমূলক সরঞ্জামগুলি বহুবিধ হতে পারে এবং পাঠক্রমের অধিকাংশ বিষয়ই এই সরঞ্জামগুলির সাহায্যে শেখান যেতে পারে।

ফ্রয়েবেলের উপহার ও মণ্টেসরির সরঞ্জাম

ফ্রয়েবেল শিশুর শিক্ষার মাধ্যমরূপে তাঁর উপহারের (gifts) প্রবর্তন করে-ছিলেন। কিন্তু মণ্টেসরির সরঞ্জাম ও ফ্রয়েবেলের উপহারের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। প্রথমত ফ্রয়েবেলের উপহারগুলি বিশেষ বিশেষ ধারণা বা ভাবের প্রতীক ছিল, মণ্টেসরির সরঞ্জামের মধ্যে কোন প্রতীকধর্মিতা (symbolism) নেই। দ্বিতীয়ত, ফ্রয়েবেলের উপহারগুলি উপস্থাপিত করার একটি বিশেষ নির্দিষ্ট অনুক্র আছে, মণ্টেসরির সরঞ্জামে তেমন কোন সুনির্দিষ্ট অনুক্রম নেই। তৃতীয়ত, ফ্রয়েবেলের উপহারের দ্বারা পাঠ্যবিষয় শেখা যায় না, কিন্তু মণ্টেসরির সরঞ্জামগুলি প্রধানত লিখন, পঠন, গণিত ইত্যাদি শেখানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ব্যক্তিমুখী শিখন

মণ্টেসরি পদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এতে ব্যক্তিগত বৈষম্যের তত্ত্ব অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। যদিও একসঙ্গে শ্রেণীগতভাবে শিক্ষা দেওয়ার প্রথা মণ্টেসরি শিক্ষাব্যবস্থায় প্রচলিত তবু শিক্ষা দেওয়া হয় ব্যক্তিগত ভাবেই। মণ্টেসরিই প্রথম শ্রেণীগত শিক্ষণের গুরুতর ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হন এবং তাঁর শিক্ষাপরিকল্পনায় ব্যক্তিমুখী শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

মণ্টেসরি ও কিণ্ডারগার্টেনের তুলনা

মণ্টেসরি পদ্ধতি ও কিণ্ডারগার্টেন উভয় পরিকল্পনাই শিশু ও কিশোরদের জন্য এবং উভয় ব্যবস্থাতেই আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রয়োগ করা হয়েছে। দুটি পরিকল্পনার মধ্যে অনেকাংশে মিল থাকলেও উল্লেখযোগ্য পার্থক্যও বর্তমান।

উভয় পদ্ধতিতেই শিশুর স্বাধীনতা, সক্রিয়তা ও মূর্ত বস্তুর মাধ্যমে শেখার উপর বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছে। উভয় পদ্ধতিতেই শিশুর আভ্যন্তরীন সম্ভাবনাগুলির স্বতঃপ্রণোদিত বিকাশকে শিক্ষা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া অন্তর্জাত ও স্বাধীনতা-ভিত্তিক শৃঙ্খলা, যৌথ কর্মপ্রচেষ্টা, সৃজনমূলক কাজ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলিও উভয় পরিকল্পনাতে সমভাবে বর্তমান।

পার্থক্যের দিক দিয়ে কিণ্ডারগার্টেন প্রথায় দলবদ্ধ কাজের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। কিন্তু মণ্টেসরি প্রথায় শিশুদের ব্যক্তিগত ভাবেই কাজ বেশী করতে হয়। মণ্টেসরি প্রথায় শিক্ষার্থীদের শ্রেণীবিভাগ খুব সুনির্দিষ্ট নয়, কিন্তু কিণ্ডারগার্টেন প্রথায় গতানুগতিক প্রথার মতই শ্রেণীবিভাজন সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়। উভয় পদ্ধতিতেই ইন্দ্রিয়-চর্চাকে শিক্ষায় অপরিহার্য বলে গণ্য করা হয়েছে। মণ্টেসরি প্রথায় ইন্দ্রিয়চর্চার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও সরঞ্জামের প্রবর্তন করা হয়েছে। কন্তু কিণ্ডারগার্টেন প্রথায় বিভিন্ন উপহার ও কাজের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়চর্চার ব্যবস্থা আছে। দলগত কাজের মধ্যে দিয়ে উভয় পদ্ধতিতেই সামাজিক শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। কিণ্ডারগার্টেন প্রথায় যৌথ খেলা, অভিনয় ইত্যাদির মাধ্যমে সামাজিক শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু মণ্টেসরি পদ্ধতিতে সামাজিক আচরণের মধ্যে দিয়েই সেই শিক্ষা দেওয়া হয়।

মণ্টেসরি পদ্ধতিতে লিখন, পঠনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়, কিন্তু কিণ্ডারগার্টেনে এ সব কাজের উপর তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

উভয় পদ্ধতিতেই বিশেষ বস্তু বা সরঞ্জামের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। তবে কিণ্ডারগার্টেনে যে সব উপহার ব্যবহার করা হয় সেগুলিকে একটি সুনির্দিষ্ট অনুক্রম অনুযায়ী শিশুর সামনে উপস্থিত করতে হয়। কিন্তু মণ্টেসরি পদ্ধতিতে ব্যবহৃত সরঞ্জামগুলি ইচ্ছামত ব্যবহার করার স্বাধীনতা শিশুদের থাকে। কিণ্ডারগার্টেনে ব্যবহৃত উপহারগুলির যেমন একটা দার্শনিক ও রহস্যময় ব্যাখ্যা আছে, মণ্টেসরির সরঞ্জামগুলির মধ্যে তেমন কোন অন্তর্নিহিত তত্ত্ব বা অর্থ নেই।

মণ্টেসরি পদ্ধতির সমালোচনা

শিশু শিক্ষার সার্থক পদ্ধতিরূপে মণ্টেসরির পরিকল্পনা যথেষ্ট সাফল্য লাভ করলেও এর কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটির প্রতি আধুনিক শিক্ষাবিদেরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যেমন—

প্রথমত, এই পদ্ধতিতে ছেলেমেয়েরা প্রচুর শারীরিক স্বাধীনতা ভোগ করলেও মানসিক স্বাধীনতা তাদের খুবই সীমাবদ্ধ। তারা যথেচ্ছ যেতে আসতে পারে, কাজ করতে বা চুপ করে বসে থাকতে পারে, কথা বলতে বা নড়াচড়া করতে পারে, কিন্তু নিজেদের স্বাধীনভাবে কোন কিছু নতুন সৃষ্টি করার অবকাশ তাদের বিশেষ দেওয়া হয়নি। শিক্ষার সরঞ্জামগুলিরও তারা ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারে বটে, কিন্তু সেগুলির সাহায্যে নিজেদের পরিকল্পনা বা প্রয়োজনমত কিছু করতে পারে না। সরঞ্জামগুলির যান্ত্রিকতা শিশুর আচরণকে এমনভাবে সব দিক দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করে যে শিশুর নিজস্ব সৃজনমূলক প্রচেষ্টা ব্যক্ত হবার পথ পায় না।

দ্বিতীয়ত, যে সব সরঞ্জাম শিশুদের কাজ করার জন্য দেওয়া হয়ে থাকে সেগুলির সঙ্গে শিশুর জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার বিশেষ সম্পর্ক নেই। আধুনিক শিক্ষাবিদদের মতে জীবনসমস্যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই যথার্থ শিক্ষা হয়ে থাকে। যে সব কাজ শিশুকে বড় হয়ে সম্পন্ন করতে হবে এবং যে সব সমস্যা তাকে পরবর্তী জীবনে সমাধান করতে হবে সেগুলিই শিশুর পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে। মন্টেসরি পদ্ধতিতে এই মূল্যবান সত্যটিকে উপেক্ষা করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, মন্টেসরি প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীদের মত মানসিক শক্তির তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মনের মধ্যে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র শক্তি আছে এবং চর্চার দ্বারা সেগুলির মধ্যে উন্নতি বা উৎকর্ষ আনা যায়। সে উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর সরঞ্জামগুলি প্রয়োগ করতেন। কিন্তু বর্তমানে মানসিক শক্তির এ তত্ত্বটি সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছে।

চতুর্থত, মন্টেসরির সরঞ্জামগুলি এক একটি বিশেষ ইন্দ্রিয়ের পার্থক্যনির্ণয় ও তুলনা-করণের শক্তির উন্নতির জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু এই ধরনের বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা শিশু বাস্তব জীবন কখনই পায় না, ফলে এই সরঞ্জামগুলি থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা অবাস্তব ও কৃত্রিম হয় এবং এর ফলে তার স্বাধীনতাকে আরও বেশী করে খর্ব করা হয়ে থাকে। সেইজন্য আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণের মতে এই ধরনের কোন সুনির্দিষ্ট বস্তু বা সরঞ্জামের মাধ্যমে শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করাটা মোটেই মনোবিজ্ঞানসম্মত নয়। শিক্ষার প্রকৃত পদ্ধতিতে শিক্ষার সামগ্রী বা সরঞ্জাম নির্ণয়ে শিশুর নিজের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে এবং এই বস্তু এবং সামগ্রীগুলি এমনভাবে পরিকল্পিত হবে যাতে শিশুর বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলিকে সেগুলির মাধ্যমে সমাধান করা যায়।

প্রশ্নাবলী

1. Give a critical estimate of the contribution of Froebel to modern educational thought, making reference to h's important writing.

(B. T. 1955)

2. Describe the major features of Froebel's Kindergarten system and method of teaching followed in it.

3. Discuss Froebel's theory of unfoldment and theory of self-activity.

4. Discuss John Dewey's main contributions to educational theory and practice.

(B. T. 1953)

5. John Dewey says—"The principle that development of experience comes through interaction means that education is essentially a social process. This quality is realised in the degree in which individuals form a community or group."—Amplify.

(B. T. 1955)

6. Discuss the major characteristics of Dewey's educational theories and estimate his contribution to modern education.

7. What does Dewey mean by "learning by doing"? Why does he describe activity as essential to learning?

8. Describe Dewey's theory of activity and five steps of learning. Compare the five steps of Dewey with those of Herbart.

9. Bring out the significance of the following statements of Dewey.

(i) Education is growth.

(ii) Education is the constant reconstruction and reconstitution of experience.

(ii i Education is a social process.

(iv) Education being a proeess cannot have an aim outside it.

(v) The aim of education is more education.

(vi) School is a miniature society.

(vii) School is a special environment.

(viii) School will prepare child for life by being life.

10. Compare the theory of interest of Dewey with that of Herbart.

11. Give a critical estimate of the contribution of Montessori to education.

(B. T. 1958)

চব্বিশ

শিক্ষণ-পদ্ধতি (Methods of Teaching)

শিক্ষার তিনটি অঙ্গ আছে—লক্ষ্য, বিষয়বস্তু এবং পদ্ধতি। শিক্ষার সমস্যা বলতেও বোঝায় এই তিনটি অঙ্গের সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলি। কেবলমাত্র শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য ও তার উপযোগী বিষয়বস্তু নির্ণয় করলেই চলবে না, তার সঙ্গে প্রয়োজন যথার্থ কার্যকরী পদ্ধতির প্রয়োগ। পদ্ধতি ভুল হলে পাঠক্রম যতই সুনির্বাচিত হোক না কেন শিক্ষা বিফল হতে বাধ্য। এই জন্য শিক্ষাবিদেরা সার্থক শিক্ষণপদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য নানা গবেষণা ও পরীক্ষণ করে আসছেন। তাঁদের গবেষণা লব্ধ ফলাফলের কয়েকটি নীচে আলোচিত হল।

তর্কবিদ্যাসম্মত (Logical) ও মনোবিজ্ঞানসম্মত (Psychological) পদ্ধতি

কোন বিষয়বস্তুর অন্তর্গত বিভিন্ন অংশগুলিকে সাজাবার সময় আমরা তর্কবিদ্যা-সম্মত অনুক্রম (order) অনুসরণ করে থাকি। এই অনুক্রমে সাধারণত আমরা একটা মৌলিক নীতি (First Principle) থেকে চিন্তা করতে সুরু করি এবং তারপর বিচারকরণের নিয়ম অনুযায়ী ধাপে ধাপে অগ্রসর হই।

এখন কোন বিষয়বস্তু শিক্ষণের সময় যদি আমরা এই তর্কবিদ্যাসম্মত অনুক্রম অনুসরণ করি তবে আমাদের শিক্ষণপদ্ধতিকে তর্কবিদ্যাসম্মত পদ্ধতি (Logical) বলা হয়। যেমন, প্রাণীকে শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে আমরা মানুষ পশু, পাখী, সরীসৃপ ইত্যাদিতে ভাগ করলাম, বা বইকে শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে উপন্যাস, নাটক, গল্পগ্রন্থ, কবিতাপুস্তক, প্রবন্ধ, ভ্রমণ ইত্যাদি ভাগে ভাগ করলাম। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমাদের স্বাভাবিক চিন্তাধারার সঙ্গে এই তর্কবিদ্যাসম্মত চিন্তাধারার কোন মিল থাকে না। মনের চিন্তাধারার আদিম অপরিণত অবস্থা থেকে বিবর্তনের নিয়ম অনুযায়ী ধীরে ধীরে যে পথে এগিয়েছে সেটির সঙ্গে যে সব সময়েই তর্কবিদ্যাসম্মত বিচারকরণের সোপানগুলির মিল

থাকবে তার কোন অর্থ নেই। যে সব ক্ষেত্রে এই মিল থাকে না সে সব ক্ষেত্রে তর্কবিদ্যাসম্মত অনুক্রম অনুযায়ী শিক্ষা দিলে শিক্ষার্থীর পক্ষে বুঝতে যথেষ্ট অসুবিধা হয় এবং অযথা সময় এবং পরিশ্রমের অপব্যয় ঘটে। এ সব ক্ষেত্রে তর্কবিদ্যাসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করা বিধেয় নয়। শিক্ষণের পদ্ধতি হবে মনের চিন্তাধারার স্বাভাবিক গতিধারা অনুযায়ী। অর্থাৎ এককথায় পদ্ধতি হবে মনোবিজ্ঞানসম্মত (Psychological), তর্কবিদ্যাসম্মত (Logical) নয়।

উদাহরণস্বরূপ, আমরা শিক্ষার বিষয়বস্তুগুলিকে ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি নানা বিষয়ে ভাগ করে শিক্ষা দিয়ে থাকি। এই ভাগগুলি তর্কবিদ্যাসম্মত, কিন্তু মনোবিজ্ঞানসম্মত নয়, অর্থাৎ আমাদের মন ঐ ভাবে আলাদা আলাদা করে বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে না। আমাদের সমস্ত জ্ঞানই বিভিন্ন বিষয়ের সংমিশ্রিত রূপ নিয়ে আমাদের কাছে এসে থাকে। তার ফলে এই কৃত্রিম বিষয়-বিভাজন স্বাভাবিক শিক্ষার বিঘ্ন ঘটিয়ে থাকে।

অবশ্য সব সময়েই যে মানসিক চিন্তার স্বাভাবিক অনুক্রমের সঙ্গে তর্কবিদ্যাসম্মত অনুক্রমের অমিল থাকে তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে আমাদের চিন্তাও স্বাভাবিকভাবে মৌলিক নীতির প্রয়োগের মাধ্যমে অগ্রসর হয়।

সংশ্লেষণমূলক (Synthetic) ও বিশ্লেষণমূলক (Analytic) পদ্ধতি

একটি বস্তুকে বিশ্লেষণ করার পর তার বিভিন্ন অংশগুলিকে পৃথকভাবে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করে সেগুলিকে শেখানোর নাম বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি (Analytic Method)। যেমন মানবদেহের গঠন ও ক্রিয়া বোঝাতে গিয়ে মানবদেহের বিভিন্ন অংশকে পৃথক পৃথক ভাবে ব্যাখ্যা করা হল।

আবার একটি বস্তুকে সমগ্রভাবে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করে তার বিভিন্ন কাজগুলির সামগ্রিক ব্যাখ্যা দেওয়ার নাম সংশ্লেষণমূলক পদ্ধতি। যেমন সমগ্র মানবদেহটির একটি ছবি শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করে তার বিভিন্ন কাজগুলির বর্ণনা করা হল।

গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিটিকেই কার্যকরী পদ্ধতি বলে গণ্য করা হত। এতদিন শিক্ষাবিদদের ধারণা ছিল যে বিভিন্ন অংশগুলিকে ভাল করে ব্যাখ্যা করতে পারলে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থীর সমগ্র বস্তুটি সম্বন্ধে

জ্ঞানলাভ হয়ে যাবে। কিন্তু আধুনিক গেষ্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের মতবাদ অনুযায়ী অংশের জ্ঞান থেকে সমগ্রের জ্ঞান হয় না। অতএব প্রথমেই অংশগুলির উপস্থাপন করাটা মোটেই মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষণপদ্ধতি নয় এবং ফলে শিক্ষার্থীর জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও যান্ত্রিক হয়ে যায়। তাঁদের মতে প্রথমে বিষয়বস্তুটিকে সমগ্রভাবে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর সমগ্র বস্তুটি সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়। তারপর সেই বস্তুটিকে বিশ্লেষণ করে তার বিভিন্ন অংশগুলির উপর বিশদ তথ্য পরিবেশন করা উচিত। অতএব আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে প্রথমে সংশ্লেষণমূলক পদ্ধতির প্রয়োগ করার পর বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতির প্রয়োগ করাই হল মনোবিজ্ঞানসম্মত উপায়। উদাহরণস্বরূপ ভারতের ভৌগোলিক সংগঠন বোঝাতে গিয়ে প্রথমেই রাজ্যগুলির পৃথক্ পৃথক বর্ণনা না দিয়ে প্রথমে ভারতের একটা সামগ্রিক ভৌগোলিক বর্ণনা দিয়ে তার পর বিভিন্ন রাজ্যগুলির বর্ণনা করাই হবে কার্যকরী শিক্ষণপদ্ধতি।

প্রকৃষ্ট পদ্ধতির কয়েকটি নীতি

আধুনিক শিক্ষাবিদেরা দীর্ঘ গবেষণার ফলে প্রকৃষ্ট শিক্ষণপদ্ধতি সম্পর্কে কতকগুলি নীতি আবিষ্কার করেছেন। পদ্ধতির প্রকৃতি যাই হোক না কেন, এই নীতিগুলি মনোবিজ্ঞানসম্মত হওয়ার ফলে সকল ক্ষেত্রেই অনুসরণীয়।

মূর্ত থেকে অমূর্ত (Concrete to Abstract)

শিক্ষার্থীর অপরিণত মন সহজেই অমূর্ত বস্তু গ্রহণ করতে পারে না। অমূর্ত ধারণাকে হৃদয়ঙ্গম করতে উচ্চ মানসিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। সেজন্য প্রথমেই অমূর্ত বস্তু শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করলে তার মানসিক ক্ষমতাকে অযথা ভারাক্রান্ত করা হয়। সেইজন্য প্রথমে মূর্ত বস্তু তার সামনে উপস্থাপিত করে তাই থেকে অমূর্ত ধারণা গঠন করতে তাকে সাহায্য করতে হবে। যেমন, কাকে দেশভক্তি বা সহিষ্ণুতা বলে এগুলি শিক্ষার্থীকে বোঝাতে গেলে নিছক অমূর্ত ভাব বা ধারণার সাহায্যে বোঝান সহজ নয়, কিন্তু যদি দেশভক্তি এবং সহিষ্ণুতার দু'চারটি মূর্ত দৃষ্টান্ত শিক্ষার্থীর সামনে ধরে ঐগুলির অমূর্ত ধারণা তার কাছে বর্ণনা করা যায় তাহলে শিক্ষার্থীর পক্ষে সে ধারণাগুলি হৃদয়ঙ্গম সম্ভব হয়ে উঠবে।

সহজ থেকে জটিল (Simple to Complex)

প্রথমেই জটিল ও দুরূহ বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করলে তার অপরিণত বোধশক্তি সেটিকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারে না, আর পারলেও তা যান্ত্রিক হয়ে ওঠে। এই জন্য প্রকৃষ্ট পদ্ধতি হল প্রথমেই সহজ বিষয়বস্তু উপস্থাপিত করে তার পরে তার জটিল এবং দুরূহ অংশগুলি উপস্থাপিত করা। এর অর্থ এ নয় যে জটিল বস্তু কখনই শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা হবে না। তবে যখনই কোন জটিল বস্তু উপস্থাপিত করার প্রয়োজন হবে তখন দেখতে হবে যে তার পূর্ববর্তী সহজতর বিষয় ও তথ্যগুলি শিক্ষার্থীর জানা আছে কি না। উদাহরণস্বরূপ ত্রিভুজের ধারণার পূর্ববর্তী সহজতর ধারণাগুলি হল বিন্দু, রেখা ইত্যাদির ধারণাগুলি। অতএব ত্রিভুজ কাকে বলে এই তথ্যটি শিক্ষার্থীকে শেখাতে হলে বিন্দু, রেখা ইত্যাদি কাকে বলে তা আগে তাকে শেখান অত্যাবশ্যক। তেমনই দেশপ্রেম কাকে বলে বোঝাতে গেলে দেশ, ভালবাসা এগুলির ধারণা শিক্ষার্থীর পরিষ্কারভাবে আছে কি না দেখা দরকার।

জ্ঞাত থেকে অজ্ঞাত (Known to Unknown)

নতুন কোন জ্ঞান, তথ্য বা কৌশল আহরণ করার নামই শিক্ষা। অতএব শিক্ষার বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর কাছে সব সময়েই নতুন এবং অজ্ঞাত হবেই। কিন্তু প্রথমেই যদি কোন অজ্ঞাত বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর সামনে ধরা যায় তাহলে তার পক্ষে সেটিকে গ্রহণ করা দুরূহ হয়ে ওঠে। এইজন্যই শিক্ষণের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি হল শিশুর ভালভাবে জানা আছে এমন বস্তু বা বিষয় থেকে সুরু করা এবং তারপর সেই জ্ঞাতবস্তুর সাহায্যে অজ্ঞাত বস্তু বা বিষয়ে গিয়ে পৌছান। হার্বার্টের প্রসিদ্ধ আত্মবীক্ষিত বস্তুপুঞ্জের (Apperceptive Mass) তত্ত্বটিও এই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মতে শিক্ষার্থীকে যা শেখান হবে তা যদি তার পূর্ব আহরিত জ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে তবেই শিক্ষার্থীর শিক্ষা সম্ভবপর হবে। শিক্ষার্থীর জ্ঞাত বস্তু থেকে শিক্ষক তাঁর শিক্ষণ সুরু করবেন এবং ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে অজ্ঞাত বিষয়বস্তুটি তার সামনে উপস্থাপিত করবেন। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর পক্ষে বিষয়বস্তুটি শেখাই যে কেবলমাত্র সহজ হয়ে উঠবে তাই নয়, ঐ বস্তুটিতে সে আগ্রহ বোধ করবে এবং শিখতে প্রেরণা অনুভব করবে।

নির্দিষ্ট থেকে অনির্দিষ্ট (Definite to Indefinite)

অনির্দিষ্ট বা অস্পষ্ট প্রকৃতির কোন বিষয়বস্তু প্রথমেই শিক্ষার্থীকে শেখান উচিত নয়। প্রথমে নির্দিষ্ট কোন বস্তু বা বিষয়কে অবলম্বন করে অনির্দিষ্ট বস্তুটি শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত হবে। অনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু বলতে সেই সব বিষয়কে বোঝাচ্ছে যা শিক্ষক নির্দিষ্ট করে দেখাতে বা বর্ণনা করতে পারবেন না। যেমন 'ইথার' নামক পদার্থটির প্রকৃতি অনির্দিষ্ট, অর্থাৎ একে নির্দিষ্ট করে দেখান বা বোঝান যায় না। অতএব শিক্ষার্থীকে 'ইথার' কি বোঝাতে গেলে সমধর্মী সুনির্দিষ্ট বস্তু, যেমন জল বা হাওয়ার উদাহরণ দিয়ে তাদের সাহায্যে বোঝাতে হবে।

বিশেষ থেকে সামান্য (Particular to General)

শিক্ষণের সময় কোন সাধারণ বা সর্বজনীন সত্য প্রথমেই উপস্থাপিত না করে তার বিশেষ প্রয়োগ বা দৃষ্টান্ত দিয়ে স্বরু করা উচিত এবং তার পর সেই বিশেষ প্রয়োগ বা দৃষ্টান্ত থেকে সাধারণ সূত্র গঠন করতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা উচিত। সাধারণ সত্য বলতেই একটা অমূর্ত ধারণাকে বোঝায় এবং শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রথমেই এই ধরনের একটা অমূর্ত ধারণা বুঝতে পারা বেশ কষ্টকর। কিন্তু বিশেষ দৃষ্টান্তমাত্রেই হল মূর্ত ঘটনা এবং মূর্ত দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে পরে একটা সাধারণ সূত্র বা সত্যতে যাওয়া শিক্ষার্থীর অপরিণত চিন্তাধারার পক্ষে অনেক সহজ ও আয়াসহীন। উদাহরণস্বরূপ, সমস্ত ত্রিভুজেরই তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ—এই সত্যটি প্রথমেই সাধারণ সূত্রের আকারে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত না করে যদি কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির ত্রিভুজের তিনটি কোণ মেপে সেগুলির সমষ্টি যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দুই সমকোণের সমান এটা দেখিয়ে দেওয়া যায় তবে শিক্ষার্থীর পক্ষে ঐ সাধারণ সূত্রটি হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর ও সহজ হবে।

বিশেষ সত্য থেকে সামান্য সত্যে যাওয়াকে তর্কবিদ্যায় আগমন (Induction) বলে। বিশেষ সত্যগুলি সহজেই শিক্ষার্থীর মন গ্রহণ করতে পারে। তার কারণ হল যে প্রথমত এগুলি মূর্ত ঘটনার রূপে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত হয় এবং দ্বিতীয়ত এগুলি শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। তবে বিশেষ সত্য থেকে সামান্য সত্যে যাবার পর সত্যটিকে ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য সামান্য সত্যটিকে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হয়। তর্কবিদ্যায় এই প্রক্রিয়াকে নিগমন (Deduction) বলে। অতএব আমাদের

সিদ্ধান্ত হল যে প্রথমে বিশেষ থেকে সামান্যে এবং তার পর আবার সামান্য থেকে বিশেষে আসাই হল প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। অর্থাৎ প্রথমে আগমন এবং পরে নিগমন।

সমগ্র থেকে অংশ (Whole to Parts)

শিক্ষার বিষয়বস্তুটিকে প্রথমে আংশিকভাবে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত না করে সেটির একটি সামগ্রিক রূপ প্রথমে উপস্থাপিত করা উচিত। তারপর সেটির অংশগুলিকে একটির পর একটি উপস্থাপিত করতে হয়। সংশ্লেষণমূলক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য আলোচনায় আমরা প্রায় একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছিলাম। শিক্ষণীয় বস্তুটির সমগ্র রূপটি প্রথমে শিক্ষার্থীর সামনে ধরলে সেটি সম্বন্ধে সে একটা ধারণা মনের মধ্যে করে নিতে পারে এবং তার পরে যখন বিভিন্ন অংশগুলিকে পর পর তার সামনে উপস্থাপিত করা হয় তখন তার সেগুলিকে বুঝতে অসুবিধা হয় না।

অর্থাৎ এককথায় সমগ্র থেকে অংশতে যাওয়াই হল সব চেয়ে ভাল পদ্ধতি।

সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে এ নিয়মে কোন বাধা নেই এবং এই পদ্ধতিতে শিক্ষণ যে দ্রুত ও স্থায়ী হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে দীর্ঘ বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে সমগ্র থেকে অংশে যাওয়ার নিয়মটা সব সময়ে পূর্ণভাবে অনুসরণ করা যায় না। তবে যতটা সম্ভব সমগ্র বিষয়বস্তুটা প্রথম উপস্থাপিত করে তারপর অংশ বিশ্লেষণে যাওয়া ভাল। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন' বা শেলীর অ্যাডোনেস্ পড়াতে গিয়ে প্রথমে সমগ্র বিষয়বস্তুটির একটি চিত্র শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করে তারপর কবিতাটির অংশগুলিকে ব্যাখ্যা করাই হল সব চেয়ে ভাল পদ্ধতি।

কৌশল শিক্ষার ক্ষেত্রে অবশ্য সমগ্র থেকে অংশে যাওয়া সব সময় সম্ভব হয় না। সেখানে শিক্ষা অংশ থেকেই সুরু করতে হয়। তবে সমগ্র কৌশলটি সম্বন্ধে একটা ধারণা শিশুকে প্রথমে দেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্নাবলী

1. Distinguish between (i) Logical and Psychological and (ii) Analytic ane Synthetic methods of teaching.

2. Name a few effective procedures that are to be adopted in teaching.

পঁচিশ

কয়েকটি আধুনিক শিক্ষণপদ্ধতি

বিংশশতাব্দীতে বিশ্বব্যাপী শিক্ষাসংস্কারের ফলরূপে কতকগুলি প্রগতিশীল শিক্ষণপদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই পদ্ধতিগুলি শিক্ষার বিশেষ বিশেষ সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে উদ্ভাবিত। এখানে কয়েকটি বহুপ্রচলিত আধুনিক শিক্ষণপদ্ধতির বর্ণনা দেওয়া হল।

প্রজেক্ট মেথড্ (Project Method)

জন ডিউই শিক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ এক নতুন তত্ত্ব দিয়ে যান। তাঁর মতে সত্যকারের জ্ঞান আসে সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে, আর অন্য কোন পন্থায় নয়। সমস্যার এই সমাধানও আবার নিষ্ক্রিয়ভাবে জল্পনাকল্পনার দ্বারা হয় না, তার জন্য প্রয়োজন হল সক্রিয়তা। এককথায় সত্য আহরণ বা নতুন জ্ঞান অর্জনে দুটি বস্তু অপরিহার্য—সমস্যা সমাধান ও সক্রিয়তা। শিক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে ডিউইর এই বৈপ্লবিক মতবাদের উপর প্রজেক্ট মেথড প্রতিষ্ঠিত।

ডিউই নিজেও তাঁর মতবাদের উপর ভিত্তি করে স্বতন্ত্র একটি শিক্ষাপদ্ধতি গড়েছিলেন। তাঁর পদ্ধতির তিনি নাম দিয়েছিলেন সমস্যা পদ্ধতি (Problem Method)। কিন্তু পদ্ধতিটির গঠনমূলক জটিলতা এবং ডিউইর ভাষার দুর্বোধ্যতার জন্যে পদ্ধতিটি জনপ্রিয়তা লাভ করে নি। এই সময় উইলিয়াম হার্ড কিলপ্যাট্রিক (William Heard Kilpatrick) নামে একজন ডিউইর অনুগামী ও অনুরাগী শিষ্য তাঁর সমস্যা-পদ্ধতিটিকে পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত করে প্রজেক্ট মেথডের উদ্ভাবন করলেন। পদ্ধতিটির অভিনবত্ব এবং অন্তর্নিহিত আবেদনটি তৎক্ষণাৎ শিক্ষাবিদগণের মনোযোগ আকর্ষণ করল এবং দেখতে দেখতে প্রজেক্ট

মেথড্ প্রগতিশীল সমস্ত শিক্ষায়তনের পাঠক্রমের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল।

তত্ত্বের দিক দিয়ে প্রজেক্ট মেথড্ ডিউইর সমস্যা-সমাধান ও সক্রিয়তার আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। তেমনই মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে এই মেথডটি থর্নডাইকের প্রসিদ্ধ প্রচেষ্টা-ও ভুলের পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। কিলপ্যাট্রিক থর্নডাইকের প্রদত্ত শিখনের প্রচেষ্টা-ও-ভুলের সংব্যাখ্যানের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হন এবং তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির সংগঠনে ঐ শিখন তত্ত্বটির মৌলিক নীতিগুলি বিশেষভাবে প্রয়োগ করেন

নিষ্ক্রিয় ভাবে পাঠ-শিখনের যে যান্ত্রিক ও নীরস প্রথা বহু যুগ ধরে গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় চলে এসেছে তাকে অপসারণ করার উদ্দেশ্যেই প্রজেক্ট মেথডের উদ্ভাবন। প্রচলিত পাঠ-শিখনের প্রথার মধ্যে সমস্যা সমাধানের কোনরূপ আয়োজন ছিলনা।কি পড়তে হবে, কতটুকু পড়তে হবে এ সবই শিক্ষক নির্দিষ্ট করে দিতেন। শিক্ষার্থীকে সেগুলিকে যন্ত্রের মত শিখতে হত। ফলে শিক্ষার্থীর নিজস্ব সৃজন প্রচেষ্টা, উদ্যোগ ও অনুপ্রেরণার কোন স্থানই সেখানে ছিল না। শিক্ষার্থী যা শিখত তা তার কাছে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন ও নিরর্থক বলে মনে হত

কিলপ্যাট্রিকের প্রজেক্ট মেথডে গতানুগতিক পাঠ-শিখন পদ্ধতির পরিবর্তে উদ্দেশ্যমূলক কর্মসম্পাদনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে কি শিখতে হবে তা শিক্ষার্থীকে আগে থেকে নির্ধারিত করে দেওয়া হয় না। কি এবং কতটুকু তাকে শিখতে হবে শিক্ষার্থী নিজেই তা স্থির করে এবং সক্রিয় সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষার্থী তা শেখে। এইভাবে কোন উদ্দেশ্যমূলক কর্ম-সম্পাদনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি শেখার পন্থাকেই প্রজেক্ট মেথড বলা হয়।

কিলপ্যাট্রিকের ভাষায় প্রজেক্ট বলতে বোঝায় "একটি সমাজধর্মী পরিবেশে সর্বান্তকরণে সম্পন্ন করা কোন উদ্দেশ্যমূলক কাজ।" ডক্টর ষ্টিভেন্‌সন প্রজেক্টের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে "প্রজেক্ট হল একটি সমস্যাধর্মী কাজ যা তার স্বাভাবিক পরিবেশে সম্পন্ন করা হয়েছে।"

প্রজেক্টের বৈশিষ্ট্য

উপরের এই বর্ণনা থেকে আমরা প্রজেক্টের কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে পারি। যথা—

প্রথমত, প্রজেক্ট মাত্রের মধ্যেই থাকবে কোন না কোন সমস্যার সমাধান। সমস্যা না থাকলে প্রজেক্ট হবে না। মনোবিজ্ঞানের মতে সমস্যা হল যথার্থ শিখনের অপরিহার্য অঙ্গ।

দ্বিতীয়ত, এই সমস্যা সমাধানের পেছনে থাকবে সুনির্দিষ্ট একটা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ঐ সমস্যাটির সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পূর্ব-পরিকল্পিত কোন উদ্দেশ্যের পরিতৃপ্তি ঘটবে। প্রজেক্টের এই বৈশিষ্ট্যটি থাকার জন্য যান্ত্রিক এবং অর্থহীন শিখন ঘটার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

তৃতীয়ত, প্রত্যেক প্রজেক্টেই থাকবে শিক্ষার্থীর সর্বান্তকরণে অংশগ্রহণ। অর্থাৎ শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী স্বতঃপ্রণোদিতভাবে ও পূর্ণভাবে নিজেকে নিয়োগ করবে।

চতুর্থত, প্রজেক্টমাত্রেই সম্পাদিত হবে তার স্বাভাবিক পরিবেশে। গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতিতে কৃত্রিম ও অবাস্তব পরিবেশে শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করত, ফলে তার শিক্ষাও হত অস্বাভাবিক ও বাস্তব-সম্বন্ধ বর্জিত। কিন্তু প্রজেক্টে যে সব বিষয় শিক্ষা দেওয়া হবে সেগুলিকে যতটা সম্ভব তাদের নিজস্ব ও স্বাভাবিক পরিবেশে শিক্ষার্থীদের নিকট পরিবেশন করা হয়ে থাকে।

পঞ্চমত, প্রজেক্টের অপরিহার্য অঙ্গ হল সামাজিক পরিবেশ। সাধারণত প্রজেক্টে কয়েকজন শিক্ষার্থীর একটি দল মিলিতভাবে কোন সমস্যার সমাধান করার উদ্দেশ্যে একটি যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে। অতএব সঙ্ঘবদ্ধতা প্রজেক্ট-মাত্রেরই মৌলিক ধর্ম। অবশ্য প্রজেক্ট ব্যক্তিগতও হতে পারে। কিন্তু সব প্রজেক্টই তা ব্যক্তিগত হ'ক, বা সামাজিক হ'ক অবশ্যই পরিকল্পিত হবে সামাজিক পরিবেশের মধ্যে। কোনরূপ কৃত্রিম বা অবাস্তব পরিবেশের মধ্যে প্রজেক্টের পরিকল্পনা হলে তার কোন কার্যকারিতাই থাকে না। প্রকৃত সামাজিক অবহাওয়ার মধ্যে প্রজেক্টটি সম্পাদিত হলে শিক্ষার্থীরা সমাজের বিভিন্ন দিকগুলির সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসতে পারে এবং প্রয়োজনীয় আচরণ, তথ্য, কৌশল ইত্যাদি শিখতে পারে।

ষষ্ঠত, প্রজেক্টের পরিকল্পনাটি দুটি উল্লেখযোগ্য মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর

প্রতিষ্ঠিত। প্রথমটি হল থর্নডাইকের সংযোজনবাদ (Connectionism), দ্বিতীয়টি হল প্রাসঙ্গিক শিখনের (Incidental learning) তত্ত্ব। সংযোজনবাদ অনুযায়ী উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নির্ভুল সংযোগ স্থাপনের নামই শিখন। প্রজেক্টের পরিকল্পনায় শিক্ষণীয় বস্তুটিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি অংশে ভাগ করা হয় যাতে শিক্ষার্থী প্রত্যেকটি উদ্দীপককে স্বতন্ত্রভাবে নির্ভুল প্রতিক্রিয়ার দ্বারা আয়ত্ত করতে পারে। শিখনের এই ব্যাখ্যাটি গেস্টাল্টমতবাদীদের দ্বারা ভীষণভাবে সমালোচিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক শিখনের তত্ত্ব অনুযায়ী আমরা যখন কোন বিষয় শেখার চেষ্টা করি তখন সেই শেখার সঙ্গে সঙ্গে বহু বিভিন্ন বস্তু প্রাসঙ্গিকভাবে শিখে থাকি। অর্থাৎ কোন একটিমাত্র বস্তু বিচ্ছিন্নভাবে আমরা কখনই শিখি না। ডিউই, কিলপ্যাট্রিক প্রভৃতির মতে এই প্রাসঙ্গিকভাবে শেখা বস্তুগুলির গুরুত্ব কোন দিক দিয়ে কম নয় এবং শিশু বহু অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু এইভাবেই শিখে থাকে। প্রজেক্টের পরিকল্পনায় এই প্রাসঙ্গিক শিখনের স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সপ্তমত, শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক সচেতনতা ও দায়িত্বশীলতা যাতে সুষ্ঠুভাবে বিকাশ পায় প্রজেক্টের পরিকল্পনায় সেদিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়। প্রজেক্টের সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের ওপর বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়ে থাকে এবং তার ফলে তারা যেমন একদিকে কর্তব্যপরায়ণ ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে ওঠে তেমনি তাদের মধ্যে ভালমন্দের বিচার সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে।

প্রজেক্টের বিভিন্ন সোপান

একটি প্রজেক্টের সম্পাদনে সাধারণত চারটি সোপান বা স্তরের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। সেগুলি হল এই :—

(ক) উদ্দেশ্য-নির্ধারণ (Purposing)
(খ) পরিকল্পন (Planning)
(গ) সম্পাদন (Executing)
(ঘ) বিচারকরণ (Judging)

প্রথম সোপানে, শিক্ষার্থীরা তাদের করণীয় কার্যটি নির্বাচন করে। এই স্তরে তারা যে প্রজেক্টটি গ্রহণ করছে সেই প্রজেক্টটির **উদ্দেশ্য** প্রথমে নির্ধারণ

করে নেবে। অর্থাৎ কি কাজ করবে এবং কেন করবে এইটিই হল প্রজেক্টের প্রথম সোপান।

দ্বিতীয় সোপানে, কেমন করে প্রজেক্টটি সম্পন্ন করা হবে সে সম্পর্কে উপায় এবং পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করবে। এই সোপানেই প্রজেক্টটির সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি স্থির করা হয়।

তৃতীয় সোপানে, সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রজেক্টটি সম্পন্ন করা হয়। এই সোপানটি পুরোপুরি প্রয়োগমূলক।

শেষ সোপানে, সম্পূর্ণ প্রজেক্টটি সম্পন্ন করায় কতটা সাফল্য পাওয়া গেল তার বিচার করা হয়। প্রথম সোপানে যে উদ্দেশ্য নিয়ে প্রজেক্টটি সুরু করা হয়েছিল সে উদ্দেশ্যের কতটা পূর্ণ হল এবং কতটা পূর্ণ হল না এই সোপানে তার পরিমাপ করা হয়।

প্রজেক্টে শিক্ষকদের অংশও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যদিও গতানুগতিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের অবকাশ এতে খুবই কম তবু শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং প্রয়োজন মত পরিচালনা ও উপদেশের মাধ্যমে শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের নানাদিক দিয়ে মূল্যবান সাহায্য করতে পারেন। বিশেষ করে উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও পরিকল্পনার সোপানে শিক্ষকের পরিচালনা ও সুমন্ত্রণা অপরিহার্য। তিনিই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে প্রজেক্টটি সম্পাদনের উপায় ও পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন।

প্রজেক্টের শ্রেণীবিভাগ

কিলপ্যাট্রিকের মতে প্রজেক্ট চার প্রকারের হতে পারে। যেমন :—

(১) সৃজনমূলক বা সংগঠনমূলক প্রজেক্ট—এই শ্রেণীর প্রজেক্টের লক্ষ্য হল কোন ধারণা বা পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেওয়া যেমন, একটি কুটীর নির্মাণ করা, একটি চিঠি খসড়া করা, কোন নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

(২) রসানুভূতিমূলক বা উপভোগমূলক প্রজেক্ট—এই ধরনের প্রজেক্টের উদ্দেশ্য হল কোন সৌন্দর্যমূলক অভিজ্ঞতা উপভোগ করা যেমন, একটি গল্প শোনা বা গান শোনা বা কোন ছবির সৌন্দর্য্য বিচার করা ইত্যাদি।

(৩) সমস্যামূলক প্রজেক্ট—এই শ্রেণীর প্রজেক্টে যে কোন মানসিক সমস্যার সমাধান করা হয় যেমন জোয়ারভাঁটা কেন হয়, শিশির কেন পড়ে ইত্যাদি।

(৪) অনুশীলনমূলক বা বিশেষ শিক্ষামূলক প্রজেক্ট—এই সব প্রজেক্টের উদ্দেশ্য হল কোন বিশেষ কার্য বা জ্ঞান আয়ত্ত করা, যেমন, কোন কবিতা মুখস্থ করা বা কলকাতার রাস্তায় মোটর গাড়ী চালাতে পারা বা বীজগণিতের সমীকরণ করতে শেখা।

অনেকে আবার প্রজেক্ট মেথডকে আরও ব্যাপক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে থাকেন। যেমন কোলিংস (Collings) প্রজেক্টকে ভাগ করেছেন চার ভাগে, যেমন, খেলা প্রজেক্ট, ভ্রমণ প্রজেক্ট, গল্প প্রজেক্ট, কর্মমূলক প্রজেক্ট।

প্রজেক্টের গুণাবলী

প্রজেক্ট মেথডের কার্যকারিতা এখন সকল শিক্ষাবিদই স্বীকার করে নিয়েছেন এবং আধুনিক বিদ্যালয়গুলির পাঠক্রমে প্রজেক্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। যে কোন সুপরিকল্পিত প্রজেক্টের মধ্যে আমরা নীচের গুণগুলির সন্ধান পাই, যথা—

প্রথম, প্রজেক্ট সক্রিয়তার আধুনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। মনোবিজ্ঞান এবং দর্শনশাস্ত্র উভয়ের মতে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, সামর্থ্য, চরিত্র, বৈশিষ্ট্য সবই জন্মায় সক্রিয়তা-মূলক সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে। প্রজেক্ট পুরোপুরি সক্রিয়তা-ভিত্তিক হওয়ায় শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার সুষম বিকাশে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

দ্বিতীয়, শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রজেক্ট প্রকৃত প্রেষণা জাগাতে পারে। শিক্ষার্থীরা জানতে পারে যে তারা কি করছে এবং কেন করছে এবং তার ফলে শিক্ষার কাজ ত্বরায়িত হয়।

তৃতীয়, প্রজেক্টে শিক্ষার্থী সব বিষয়েই পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করে। বিষয় নির্বাচন থেকে সুরু করে প্রজেক্টের উদ্দেশ্য স্থিরীকরণে শিক্ষকের কোনরূপ হস্তক্ষেপ থাকে না।

চতুর্থ, প্রজেক্ট মাত্রেই শিক্ষার্থীর কাছে এমন একটি বাস্তব কাজ যা বুঝতে তার কোনরূপ কষ্ট হয় না। প্রজেক্টের কাজগুলি শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে

সম্পর্কযুক্ত থাকে এবং সেগুলির লক্ষ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনে কোন অস্পষ্টতা বা সন্দেহ থাকে না।

পঞ্চম, প্রজেক্টের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আগ্রহ স্বাভাবিক ভাবেই দেখা যায় এবং কোনরূপ বাহ্যিক উদ্‌বোধকের প্রয়োজন হয় না।

ষষ্ঠ, শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যৎ জীবনে যে সব কাজ করতে হবে, প্রজেক্টের মাধ্যমে সেগুলিতে শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করার সুযোগ পায় অর্থাৎ প্রজেক্টের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত হতে শেখে।

সপ্তম, সমস্ত প্রজেক্টের পরিকল্পনা ও পরিচালনা দুইই শিক্ষার্থী নিজে সম্পন্ন করে তার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মনির্ভরতা ও দায়িত্বশীলতা জেগে থাকে।

অষ্টম, যৌথ প্রজেক্টগুলিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কতকগুলি প্রয়োজনীয় সামাজিক গুণ জন্মলাভ করে থাকে। একসঙ্গে কাজ করার ফলে সহযোগিতা, দলপ্রীতি, আত্মত্যাগ ইত্যাদি গুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা দেয়।

নবম, প্রত্যেক প্রজেক্টেই সক্রিয়তা থাকায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে শ্রমের মর্যাদা দেখা দেয়। তাছাড়া শরীরচর্চা ও স্বাস্থ্যের ন্নতিও ঘটে থাকে প্রজেক্টের দ্বারা।

দশম, প্রজেক্টে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার মত কৃত্রিম ও আড়ষ্ট হয় না। একসঙ্গে কাজ করার ফলে এই সম্পর্ক প্রীতি ও সহজ বোঝাপড়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রজেক্টের অসম্পূতা

প্রজেক্টর বহুবিধ গুণ থাকা সত্ত্বেও এর কতগুলি অসম্পূর্ণতা উল্লেখযোগ্য।

প্রথম, পাঠক্রমের কোন কোন অংশ প্রজেক্টের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে শেখান সম্ভব হলেও সম্পূর্ণ পাঠক্রমটি প্রজেক্টের াধ্যমে শেখান যায় না। বৎসরের শেষে প্রায়ই দেখা যায় যে পাঠক্রমের বেশ কিছুটা অংশ অপঠিত রয়ে গেছে। সে সব জায়গায় বাধ্য হয়ে গতানুগতিক পদ্ধতি গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। প্রজেক্টের সমর্থকরা অবশ্য এর উত্তরে বলেন যে এর জন্য দায়ী হল ত্রুটিপূর্ণ পাঠক্রম। শিক্ষার্থীর প্রয়োজন যখন প্রকৃতপক্ষে প্রজেক্টের মাধ্যমেই তৃপ্ত হয়ে থাকে তখন শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুযায়ী পাঠক্রমেরও পরিবর্তন করা উচিত।

দ্বিতীয়, একটি উৎকৃষ্ট প্রজেক্ট গড়ে তুলতে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা, পরিশ্রম ও সময় লাগে। গতানুগতিক প্রথায় শিক্ষাদান কাজটি অত্যন্ত সহজ ও আয়াসহীন এবং

সেখানে শিক্ষককে তেমন কোন গুরুতর পরিশ্রম করতে হয়না। কিন্তু একটি প্রজেক্ট গড়ে তুলতে সুদীর্ঘ পরিকল্পনা বিবেচনা, ও প্রচুর পরিশ্রমের প্রয়োজন। তাছাড়া সাধারণ শিক্ষকের পক্ষে একটি পূর্ণাঙ্গ কার্যকরী প্রজেক্ট গড়ে তোলা সম্ভবও নয়। এর জন্য অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা দুইই লাগে। সুচিন্তিত পরিকল্পনার দ্বারা গঠিত না হলে দেখা যায় যে পাঠক্রমের অনেক প্রয়োজনীয় অংশ প্রজেক্ট থেকে বাদ পড়ে গেছে। এই ধরনের ত্রুটিপূর্ণ প্রজেক্টের দ্বারা মিথ্যা সময় ও পরিশ্রমের অপব্যয় হয়, প্রকৃত শিক্ষা হয় না।

তৃতীয়, প্রজেক্টের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ হল যে এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী যা শেখে সেগুলি বিচ্ছিন্ন ও আংশিক জ্ঞান ছাড়া কিছুই নয়। সেগুলির মধ্যে কোনরূপ সুসংহত সংগঠন বা সমন্বয় থাকে না। প্রজেক্ট সম্পর্কে এই অভিযোগ কিছুটা পরিমাণে সত্য তা সন্দেহ নেই কিন্তু যদি বিচক্ষণতার সাথে প্রজেক্টের পরিকল্পনা করা হয় তবে এ দোষ অনেকখানি দূর করা যায়।

চতুর্থ, প্রজেক্টের পরিকল্পনা থর্নডাইকের প্রসিদ্ধ শিখনতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই তত্ত্বানুযায়ী শিখন আসে প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে ও তার জন্য প্রয়োজন হয় অনুশীলন (exercise), প্রস্তুতি (readiness এবং তৃপ্তি বা সন্তোষ (satisfying effect)।

থর্নডাইকের এই শিখন তত্ত্বটির মৌলিক নীতিকে গেস্টাল্টবাদী তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন ও নানা পরীক্ষণের সাহায্য প্রমাণ করে দিয়েছেন যে তত্ত্বটির মৌলিক নীতি বা ধারণাটি বহুলাংশে ভুল। গেস্টাল্টবাদীদের দাবী মেনে নিলে স্বভাবতই আমরা এই সিদ্ধান্তে আসব যে প্রজেক্টের মনোবিজ্ঞানমূলক ভিত্তিটিই ত্রুটিপূর্ণ।

পঞ্চম, প্রজেক্টের বিরুদ্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য অভিযোগ হল যে শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রজেক্টের উদ্দেশ্যের চেয়ে উপায়কে বড় করে তোলার আশঙ্কা থাকে। এর অর্থ হল যে প্রজেক্ট মাত্রেরই উদ্দেশ্য হল কোন কাজ সম্পন্ন করা বা কোন কিছু তৈরী করার মাধ্যমে কোন জ্ঞান ধারণা বা কাজ শেখা। কিন্তু শিক্ষার্থীদের কাছে অনেক সময় শেখার বিষয়বস্তুর চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায় কাজটি বা কাজের কর্মপ্রসূত বস্তুটি। তার ফলে প্রজেক্টের শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যটাই সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। শিক্ষার্থী যাতে প্রজেক্টের প্রকৃত উদ্দেশ্যের রূপ জানতে পারে এবং প্রজেক্টের অন্তর্গত কাজগুলিই যে চরম উদ্দেশ্য নয়

কেবলমাত্র সোপানবিশেষ সে সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকে, সেদিকে শিক্ষকের বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

ষষ্ঠ, অনেকের মতে উচ্চ শ্রেণীর পাঠক্রমের পক্ষে প্রজেক্টের কার্যকারিতা খুবই কম এবং নিম্নশ্রেণীতেই প্রজেক্ট সন্তোষজনক ফল দিয়ে থাকে। একথা অবশ্য সত্য যে উচ্চশ্রেণীর পাঠক্রমেও এমন কতগুলি বিষয় থাকে যেগুলি প্রজেক্টে রূপায়িত করা বেশ কষ্টকর, তবে সবশ্রেণীতেই আংশিকভাবে যে প্রজেক্ট প্রয়োগ করা যায় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রশ্নাবলী

1. Describe the Project Method and comment on its basic principles.

2. Give a critical estimate of the efficacy of the Project as a method of learning in the schools. What are its imperfections ?

3. Discuss the advantages and limitations of the Project Method. (B. T. 1955, '61)

ডাল্টন প্ল্যান (Dalton Plan)

ডাল্টন প্ল্যানের প্রবর্তক হলেন হেলেন পার্কহার্স্ট (Helen Parkharst) নামে একজন আমেরিকান মহিলা। মন্টেসরীর মত তিনিও শিশুদের ব্যক্তিগত বিকাশে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁর ডাল্টন প্ল্যানের মাধ্যমে শিশুদের ব্যক্তিমূলক শিক্ষাদানের একটি অভিনব পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। ১৯২০ সালে ম্যাসাচুসেট রাজ্যে ডাল্টন সহরের স্কুলে এই পরিকল্পনাটি প্রথম প্রয়োগ করা হয় বলে এটি ডাল্টন প্ল্যান নামে পরিচিত।

ডাল্টন প্ল্যানটি ব্যক্তিগত কর্ম সম্পাদনের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণভাবে নিজের প্রয়োজন, পছন্দ ও সামর্থ্যানুযায়ী কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। গতানুগতিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রচলিত যৌথভাবে শিক্ষাদানের পদ্ধতি এই পরিকল্পনায় সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা হয়েছে। সেখানে শিক্ষা দেওয়া হত শ্রেণীগতভাবে কিন্তু ডাল্টন প্ল্যানে শিক্ষা দেওয়া হয় সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ভাবে। এই পরিকল্পনায় শ্রেণী, শ্রেণীগত শিক্ষক, বক্তৃতামূলক শিক্ষাদান ইত্যাদি গতানুগতিক প্রথাগুলির কোনরূপ স্থান নেই। বহু প্রচলিত শ্রেণী বা ক্লাশের জায়গায় এতে আছে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের জন্য নির্ধারিত স্বতন্ত্র ঘর। এই বিষয় ঘরগুলিকে গবেষণাগার(laboratory) বলা হয়। শিক্ষার্থীরা হল এই গবেষণাগারের গবেষক। এই বিষয়-ঘর বা গবেষণাগারগুলি প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামে সজ্জিত থাকে এবং এক একজন করে শিক্ষকের হাতে সেগুলির ভার থাকে। এই ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের কাজ হল গবেষণাগারে সাজসরঞ্জামের ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের তথ্য সরবরাহ করা ও পরামর্শ দেওয়া। তাছাড়া কেমন করে সমস্যাগুলির সমাধান করতে হয় সে সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়াও শিক্ষকের কাজ।

এই নতুন ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা পূর্বের মতো নিষ্ক্রিয় শ্রোতার অংশ অভিনয় করে না। তারাই এখন সমগ্র শিক্ষা-প্রক্রিয়াটির নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক। শিক্ষক এখানে নিছক সাহায্যকারী পরিচালক নন। সমস্ত সক্রিয়তার উৎস এখানে শিক্ষার্থী। শিক্ষকের কাজ হল শিক্ষার্থীর এই সক্রিয়তাকে পরিপুষ্ট ও সার্থক করতে সাহায্য করা।

এই বিভিন্ন বিষয়ঘরগুলিকে গবেষণাগার বলার উদ্দেশ্য হল যে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান করে। উদাহরণস্বরূপ, সাহিত্যের ঘরে শিক্ষার্থীদের সেক্সপীয়ারের সমস্ত বইগুলি উল্টেপাল্টে দেখতে দেওয়া হয়। কেবলমাত্র একটি বা দুটি নাটক পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত করে তাদের স্বাভাবিক জ্ঞানের স্পৃহাকে সঙ্কুচিত করে রাখা হয় না।

একক-বিভাজন ও কর্মভার প্রথা (Unit division & Assignment System)

ডাল্টন প্ল্যানের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল এর একক-বিভাজন অনুযায়ী কার্য-ভার বণ্টন। এক কথায় একে একক কার্য-ভার বণ্টন (Unit Assignment) বলা হয়। এই প্রথা অনুযায়ী প্রত্যেকটি পাঠ্যবিষয়ের সম্পূর্ণ পাঠক্রমটিকে প্রথমে প্রত্যেকটি মাস অনুযায়ী কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেকটি ভাগে থাকে এক একটি মাসে যতটা কাজ করতে হবে তার সম্পূর্ণ অংশটা। এটাকেই কার্য-ভার (assignment) বা চুক্তি (contract) বলা হয়। তারপর আবার ঐ কার্যভারকে চারটি সপ্তাহ অনুযায়ী চারটি পিরিয়ডে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক পিরিয়ডে থাকে এক একটি সপ্তাহে করণীয় কাজের অংশটুকু। তারপর আবার প্রত্যেকটি পিরিয়ডের কর্মবণ্টনকে দৈনিক কাজে ভাগ করা হয়। এই দৈনিক কর্মতালিকাকেই ডাল্টন প্ল্যানে একক (unit) বলা হয়। এইভাবে প্রত্যেকটি পাঠ্যবিষয়ের একবৎসরের পূর্ণ পাঠক্রমটিকে মাসিক, সাপ্তাহিক এবং দৈনিক কাজে ভাগ করে দিয়ে দেওয়া হয়।

এই একক-বিভাজান অনুযায়ী কাজ করে যাওয়ার দায়িত্ব সম্পূর্ণ শিক্ষার্থীর। শিক্ষকের কাজ হল প্রতি মাসে একটি করে কার্যভারের তালিকা শিক্ষার্থীর হাতে উঠিয়ে দেওয়া এবং মাসের শেষে ঐ মাসিক কার্যভারটি শেষ হল কি না তার পরীক্ষা করা। যদি তিনি দেখেন যে মাসের পূর্ণ কার্যভারটি শিক্ষার্থী শেষ করেছে তখন তিনি তাকে পরের মাসের কার্যভারটি তালিকা দেন। আর যদি শিক্ষার্থী তা শেষ না করে থাকে তবে দ্বিতীয় মাসের কার্যভার সে পায় না। প্রতি মাসের প্রথমে কার্যভারটি নেবার সময় শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যভার শেষ করার চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হয়।

এই একক-বিভাজন ও কার্যভার প্রথার সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে শিক্ষার্থীকে গতানুগতিক প্রথার মত পাঠসংক্রান্ত কোনরকম নির্ধারিত বা আরোপিত পদ্ধতি বা নিয়মকানুন মেনে চলতে হয় না। কোন বাঁধাধরা পাঠের সময়-তালিকা তাকে অনুসরণ করতে হয় না। তার যখন যে বিষয়টি পড়তে ইচ্ছা বা ভাল লাগে সে সেই বিষয়-ঘরে গিয়ে বিষয়টি পড়তে পারে। কোন বিষয়টির পড়া সুরু করলে সে যতক্ষণ ইচ্ছা ঐটি পড়ে যেতে পারে, কোন নির্ধারিত সময়ের শেষে সে থামতে বাধ্য হয় না। তাছাড়া পঠন-পদ্ধতি সম্পর্কেও তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে। নিজের রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী পড়ার পদ্ধতি সে নিজেই উদ্ভাবন করে নেয়, শিক্ষকের আরোপিত কোন পদ্ধতি অনুসরণ করতে সে বাধ্য হয় না।

সম্মেলন (Conference)

ডাল্টন প্ল্যানে সনাতন বক্তৃতা পদ্ধতি একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয় নি। তবে শিক্ষকের একমুখী বক্তৃতার স্থান অধিকার করেছে সম্মেলন (Conference)। এই সম্মেলনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এক সম্মিলিত আলোচনায় যোগ দেন এবং শিক্ষার্থীরা এই আলোচনার মাধ্যমে তাদের অসমাধিত সমস্যাগুলির সমাধান করে নেয়।

তাছাড়া এই সম্মেলনগুলির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। এগুলি শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিসত্তার সামাজিক দিকটিকে সুদৃঢ় করে তোলে। ডাল্টন প্ল্যানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর অধিকতর জোর দেওয়া হয় বলে এই ধরনের সম্মেলনের প্রয়োজন খুব বেশী।

যৌথ কার্যাবলী (Group activities)

কেবলমাত্র ব্যক্তিগত শিখনের দিকটা দেখলেই শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ পূর্ণভাবে হয় না। সেই সঙ্গে তার মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক দিকগুলির বিকাশের আয়োজনও রাখতে হবে। এইজন্য ডাল্টন প্ল্যানে নানা যৌথ কার্যাবলীর ব্যবস্থা আছে। যেমন ইংরাজী শেখার সহায়করূপে সাহিত্যসভা, বিতর্ক, বক্তৃতা, অভিনয় ইত্যাদির আয়োজন করা হয়ে থাকে। সেইরকম

ইতিহাসের ক্ষেত্রে বর্তমান রাজনীতি, বিভিন্ন যুগের আচরণ ও প্রথা প্রভৃতির আলোচনা শিক্ষার্থীর অঙ্গীভূত করা হয়। এই ধরনের যৌথ আলোচনায় যোগদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক সম্প্রীতি ও একতাবোধকে পুষ্ট করা হয়। তাছাড়া খেলাধূলা, ব্যায়াম প্রভৃতি যৌথ কার্যাবলীর সাহায্যেও শিক্ষার্থীদের সামাজিক সচেতনতার বিকাশসাধন করা হয়।

ডাল্টন প্ল্যানের গুণাবলী

ডাল্টন প্ল্যানটি মূলগতভাবে একটি অতি-গুরুত্বপূর্ণ মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেটির নাম হল ব্যক্তিগত বৈষম্যের তত্ত্ব (Theory of Individual Difference)। এই তত্ত্ব অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শেখার নিজস্ব ক্ষমতা, রুচি ও পদ্ধতি বিভিন্ন। অতএব সনাতনকাল থেকে চলে আসছে যে দলগতভাবে শিক্ষা দেবার পদ্ধতি সেটি মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে বিশেষভাবে ত্রুটিপূর্ণ। একটি শ্রেণী বা ক্লাশে অনেকগুলি শিক্ষার্থীকে একসঙ্গে রেখে শিক্ষা দেওয়ার অর্থ হল যে আমরা ধরে নিচ্ছি যে তাদের সকলের বোঝবার, শেখবার ও মনে রাখবার শক্তি সমান। কিন্তু এটি যে নিতান্তই ভ্রমাত্মক ধারণা সেটি আজ বহু পরীক্ষণ-প্রমাণিত নিঃসংশয় সত্য। ব্যক্তির শিক্ষাকে কার্যকরী করতে হলে তাকে ব্যক্তিগতভাবে নিজস্ব শক্তি, পন্থা ও পছন্দমত শিখতে দিতে হবে। এই মনোবৈজ্ঞানিক সত্য থেকেই জন্ম নিয়েছিল বিংশশতাব্দীর শিক্ষাকে ব্যক্তিমুখীকরণের (Individualisation) আন্দোলন। মারিয়া মণ্টেসরি যে এই তত্ত্বের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তার প্রমাণ হল তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা। আর ডাল্টন প্ল্যান হল এই তত্ত্বটির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবরূপ। এই পরিকল্পনায় সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে শেখার সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে।

ডাল্টন প্ল্যানের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা। শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন সর্বতোমুখী স্বাধীনতা বোধ করি অন্য কোন শিক্ষাব্যবস্থায় নেই। শিক্ষার্থীর যখন যেমন তার অভিরুচি সেইভাবে পড়াশোনা করতে পারে। বিষয়-নির্বাচন, পড়ার সময় নির্ধারণ, পদ্ধতির অনুসরণ প্রভৃতির ব্যাপারে শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ নিজের পরিকল্পনা অনুসরণ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। তবে একথা ভাবলে ভুল হবে যে শিক্ষার্থীদের যথেচ্ছাচার করার অধিকার আছে। প্রতিমাসের

প্রথমেই শিক্ষার্থীকে পুরো মাসের কাজ সম্পর্কে একটা চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হয় এবং সেই মাসের মধ্যে তাকে সেই নির্ধারিত কাজ শেষ করতে হয়। এই চুক্তি বা কার্যভার প্রথার ব্যবস্থার ফলে শিক্ষার্থীর স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার থাকলেও যথেচ্ছাচার করার অধিকার থাকে না।

ডাল্টন প্ল্যানের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল যে এতে শিক্ষার্থীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর যথেষ্ট মূল্য দেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনার স্রষ্টা মিস্ পার্কহার্ষ্ট এই বৈশিষ্ট্যটিকে "দৃষ্টিকোণের মনোবিজ্ঞান" (Psychology of a point of view) বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর ভাষায় কোন শিশুই যা সে বোঝে না তা স্বেচ্ছায় করতে চায় না। যে কাজ সে বুঝতে পারে তাই সে গ্রহণ করে এবং কাজটিকে সম্পন্ন করার জন্য সেটিকে সর্ব দিক দিয়ে সে বিচার করে এবং নিজের লক্ষ্যে পৌছবার উপযোগী পরিকল্পনা তৈরী করে নেয়।

ডাল্টন প্ল্যানে শিক্ষার্থীকে সর্ববিষয়ে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয় বলে শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যা সেখানে থাকে না। শৃঙ্খলা সেখানে অন্তর্জাত অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখে। তাছাড়া কর্মসম্পাদনের দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের উপর দেওয়া থাকার ফলে শৃঙ্খলা স্বতঃপ্রসূতভাবেই দেখা দেয়।

এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের উপর দেওয়ার ফলে শিক্ষার্থীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা তৃপ্ত হয় এবং তাদের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় জাগে। তাছাড়া তারা স্বাবলম্বী হয় ও দায়িত্বশীল হতে শেখে।

ডাল্টন প্ল্যানের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এতে বিভিন্ন দলের মধ্যে পারস্পরিক আদানপ্রদানের প্রচুর অবকাশ আছে। যেহেতু গতানুগতিক পদ্ধতিতে শ্রেণীগতভাবে শিক্ষার্থীদের বিভাগ করা হয় নি সেহেতু এতে বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনাসম্পন্ন বহু বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হয়। এই বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে পারস্পরিক মেলামেশা ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রচুর ব্যক্তিগত ও সামাজিক শিক্ষা লাভ করে থাকে। একেই ডিউই যৌথ প্রতিক্রিয়া (Group interaction) নাম দিয়েছেন। তাঁর মতে শিক্ষার্থীরা সর্বাঙ্গীন শিক্ষা ও ব্যাপকতা নির্ভর করে এই যৌথ প্রতিক্রিয়ার উপর।

এই পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বিষয়ে সময়গত অগ্রগতির সুনির্দিষ্ট বিবরণী লিপিবদ্ধ করা হয় এবং তার ফলে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন সময়ের অগ্রগতি সম্পর্কে যে কোন সময়ের শিক্ষক, পিতামাতা সকলেই নির্ভুল ধারণা পেতে পারেন।

ডাল্টন প্ল্যানের অসম্পূর্ণতা

ডাল্টন প্ল্যানে এত অভিনবত্ব ও গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও এর কতকগুলি গুরুতর অসম্পূর্ণতার জন্য এটি সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে ওঠে নি। সেগুলি সংক্ষেপে হল—

প্রথমত, ডাল্টন প্ল্যানে শিক্ষাব্যবস্থার সনাতন রূপটির আমূল পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়। ডেস্ক, বেঞ্চ, প্লাটফর্ম ইত্যাদি সম্বলিত ক্লাশগুলিকে সম্পূর্ণ বদলে তার জায়গায় নানা প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামসমন্বিত বিষয় ঘর বা গবেষণাগার স্থাপন করতে হয়। এতে প্রারম্ভিক ব্যয় এত বেশী পড়ে যায় যে সাধারণ স্কুলের পক্ষে প্ল্যানটি গ্রহণ করা সাধ্যাতীত হয়ে ওঠে। তাছাড়া বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকেরা ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার কথা মনে করে এত বড় একটা পরিবর্তন নীতির দিক দিয়ে সহসা গ্রহণ করতে রাজী হন না। এই কারণে ডাল্টন প্ল্যানের মৌলিক তত্ত্বটি যথেষ্ট আকর্ষণীয় হলেও বাস্তবে খুব কম জায়গাতেই এটিকে রূপ দেওয়া হয়েছে।

ডাল্টন প্ল্যানটি ব্যক্তিগত শিখন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক একতা ও সম্প্রীতি বিকাশের অবকাশ খুব কম থাকে। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অতিরিক্ত পুষ্টিলাভ করায় তাদের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতা, সঙ্কীর্ণতা, অহঙ্কার ইত্যাদি অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। বিশেষ করে উন্নত শক্তির বলে যে সব ছেলেমেয়েরা কর্মসম্পাদনে অপরকে ছাড়িয়ে যায় তাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে উচ্চতাবোধ (sense of superiority) জন্মায় এবং পশ্চাদ্‌পদদের প্রতি অবজ্ঞার ভাব জেগে থাকে। তার ফলে তারা অসামাজিক, আত্মপ্রিয় ও স্বার্থপরও হয়ে ওঠে।

ডাল্টন প্ল্যানের ব্যবহারিক দিকেরও একটা বড় ত্রুটি আছে। এতে শিক্ষার্থীকে তার পছন্দ ও সামর্থ্য অনুযায়ী বিষয় পাঠের অধিকার দেওয়া হয় বলে অনেকক্ষেত্রে দেখা গেছে যে শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রিয় ও সহজ বিষয়টিতে সে অনেক এগিয়েছে কিন্তু তার পক্ষে শক্ত বা অপ্রিয় বিষয়টিতে সে পিছিয়ে রয়েছে। এর ফলে সমস্ত বিষয়ে অগ্রগতি সমান হয় না এবং যে বিষয়ে সে দুর্বল সে বিষয়ে সে উন্নতি করার চেষ্টা করে না। অবশ্য ডাল্টন প্ল্যানে প্রতি মাসের সব বিষয়ের কার্যভার শেষ না করলে পরের মাসের কার্যভার তাকে দেওয়া হয় না।

এমন কতকগুলি বিষয় আছে যেখানে দলগতভাবে শিখন বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। ডাল্টন প্ল্যানে এই সব বিষয়গুলির শিখন ভাল হয় না। উদাহরণ-

স্বরূপ প্রকৃতিবীক্ষণ (Nature Study), অভিনয়, বিতর্ক, প্রদর্শনী-আয়োজন, সমাজ সেবা ইত্যাদি শিক্ষামূলক কাজগুলিতে দলগত অনুপ্রেরণা ও কর্মপ্রচেষ্টা একান্তই আবশ্যক। ডাল্টন প্ল্যানের মাধ্যমে এগুলির সার্থক শিক্ষা হয় না।

সব শেষে ডাল্টন প্ল্যান খুব ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে কেননা নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যভার অনুসরণ করার মত বিবেচনাশক্তি ও দায়িত্ববোধ তাদের মধ্যে জাগে না।

ডাল্টন প্ল্যানে শিক্ষকদের উপর কাজের চাপ অত্যন্ত বেশী পড়ে। প্রতিটি বিষয়ের সময়গতভাবে পাঠবণ্টন প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর প্রতিটি বিষয়ে অগ্রগতির পরিদর্শন ও তার বিবরণী লিপিবদ্ধ করণ, শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্যদান ইত্যাদি বহু দায়িত্বপূর্ণ ও শ্রমবহুল কাজ সম্পন্ন করতে হয় শিক্ষকদের।

উপসংহারে বলা চলে ডাল্টন প্ল্যানের মৌলিক তত্ত্বটি সর্বজনগ্রাহ্য হলেও পরিকল্পনার নানা ব্যবহারিক দোষের জন্য সম্পূর্ণভাবে ডাল্টনীকরণ সম্ভব নয় এবং বর্তমানে পৃথিবীতে তেমন স্কুলের সংখ্যা খুবই কম। তবে আংশিক ডাল্টনীকরণ অর্থাৎ কোন কোন বিশেষ বিষয়ে ডাল্টনপ্ল্যানের প্রয়োগ অনেক স্কুলে করা হয়েছে। ইংরাজী, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, তর্কবিদ্যা ইত্যাদি কতকগুলি বিষয়ে ডাল্টন প্রথার প্রয়োগ করলে শিক্ষার্থীরা যে বিশেষভাবে উপকৃত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

উইনেটকা প্ল্যান (Winnetka Plan)

কালটন ওয়াসবার্নের উদ্ভাবিত এই পরিকল্পনাটি ডাল্টন প্ল্যানেরই অনুরূপ। এটিও ব্যক্তিগত শিখনের তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ১৯১৯ সালে ওয়াসর্বার্ন উইনেটকার স্কুলেতে এই পরিকল্পনাটির প্রয়োগ করেন বলে এর নাম দেওয়া হয় উইনেটকা প্ল্যান। ডাল্টন প্ল্যানের উদ্ভাবক পার্কহার্ষ্টের মত ওয়াসর্বার্নও বক্তৃতা-পদ্ধতির সাহায্যে দলগত শিক্ষাদানের বিরোধী ছিলেন এবং ব্যক্তিগত রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাকে ব্যক্তিমুখী করে তোলার এই পরিকল্পনাটি উপস্থাপিত করেন।

এই পরিকল্পনায় পাঠক্রমকে নতুন ভাবে সংগঠিত করা হয়েছে। সাধারণভাবে পাঠক্রমকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (ক) সাধারণ অত্যাবশ্যকীয় অংশ (Common essentials) এবং (খ) যৌথ কার্যাবলী (Group activities)।

সাধারণ অত্যাবশ্যকীয় অংশ বলতে সেই সব জ্ঞান ও কাজকে বোঝায় যেগুলি সকল শিক্ষার্থীরই কাছে সমানভাবে প্রয়োজন। আর যৌথ কার্যাবলীর অন্তর্গত হল— সমাজধর্মী আত্ম-অভিব্যক্তিমূলক এবং সৃজনমূলক কার্যাবলী।

সাধারণ অত্যাবশ্যকীয় অংশ

পাঠক্রমের সাধারণ অত্যাবশ্যকীয় অংশটুকু সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত পন্থায় শেখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই অংশের অন্তর্গত বিষয়গুলিকে কতকগুলি ইউনিট বা এককে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ইউনিট বা এককের উপর অতি সযত্নে কার্যভারের তালিকা (Assignment sheet), কার্যক্রম তালিকা (Work sheet) ত্রুটিনির্ণয়মূলক অনুশীলন অভীক্ষা (Diagnostic practice sheet) এবং সর্বশেষ অভীক্ষা (Final test) তৈরী করা হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার নিজস্ব সামর্থ্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট ইউনিট বা এককের উপর কাজ করে যায়। যখন সে একটি একক শেষ করে, তখন সে তার কাজের সঙ্গে প্রদত্ত উত্তর পত্রটি মিলিয়ে দেখে। যদি দেখে যে সে ঠিক মত করতে পেরেছে তাহলে সে অপর একটিতে হাত দেয়। আর যদি দেখে যে এককটি সে ঠিকমত শেষ করতে পারে নি তাহলে সে তার অসমাপ্ত অংশটুকু শেষ করতে বা ভুল শোধরাতে প্রবৃত্ত হয়। এইভাবে যখন সে একটি এককগুচ্ছ শেষ করে তখন তাকে একটি সর্বশেষ অভীক্ষা দেওয়া হয় এবং তারপর অপর একটি নতুন এককগুচ্ছে সে হাত দেয়। এই এককগুলি সম্পন্নের কাজে শিক্ষার্থী সম্পূর্ণ নিজস্ব রুচি, ইচ্ছা ও আগ্রহ অনুসরণ করতে পারে।

ডাল্টন প্ল্যানে প্রত্যেকটি বিষয়ের মাসিক কার্যভার শেষ না করলে পরের মাসের কার্যভার তাকে দেওয়া হয় না। কিন্তু উইনেটকায় শিক্ষার্থীর স্বাধীন শিখন প্রচেষ্টায় কোন বাধার সৃষ্টি করা হয় না। এমন হতে পারে যে কোন শিক্ষার্থী সে যে শ্রেণীতে পড়ে তার চেয়ে ভূগোলে একবৎসর তিনমাস, গণিতে দুবৎসর দু'মাস, ভাষায় এক বৎসর একমাস এগিয়ে রয়েছে।

যৌথ কার্যাবলী

উইনেটকা স্কুলগুলিতে সকাল এবং দ্বিপ্রহরের অর্ধেক সময় শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত কাজ সম্পন্ন করায় নিয়োগ করে। বাকী অর্ধেক সময় তারা নানা রকমের সামাজিক কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে ব্যয় করে। এই সমাজধর্মী কাজগুলোর

মধ্যে পড়ে সাধারণ আলোচনা, খেলাধূলা, বিদ্যালয়-পরিশাসনের জন্য বিভিন্ন অধিবেশন, স্কুলপত্রিকা, ভ্রমণ, গান, শিল্পকলা এবং এই ধরনের আরও নানাপ্রকারের যৌথ অভিজ্ঞতা। এই কাজগুলির মধ্যে দিয়ে শিশুদের মধ্যে সামাজিক মনোভাব সম্প্রীতি, পারস্পরিক সহযোগিতা, দলপ্রীতি প্রভৃতি অতিপ্রয়োজনীয় সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি জন্মে থাকে। পরস্পরের সঙ্গে এই মেলামেশার মাধ্যমে তারা শেখে তাদের নিজস্ব আগ্রহ ও শক্তিকে অপরের আগ্রহ ও শক্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে এবং সমাজজীবনের মূলভীত্তি যে একতাবোধ ও স্বার্থত্যাগ সেই মহৎ গুণগুলিতে তারা দীক্ষালাভ করে।

ডাল্টন প্ল্যানে শিক্ষার্থীদের সামাজিক দিকটির প্রতি তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না, তাদের ব্যক্তিগত বিকাশকেই সেখানে বড় করা হয়েছে। কিন্তু উইনেটকা প্ল্যানে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় দিকের মধ্যে সমতা আনার চেষ্টা করা হয়েছে। সেদিক দিয়ে উইনেটকা প্ল্যান ডাল্টন প্লানের চেয়ে অধিকতর সম্পূর্ণ।

উইনেটকা প্ল্যানের প্রয়োগ

উইনেটকা প্ল্যানের প্রথম সূত্রপাত হয় বানান শিখন ও পঠনের ক্ষেত্রে, প্রচলিত দলগত পদ্ধতির পরিবর্তে ব্যক্তিমুখী পদ্ধতির প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে। পরীক্ষা করে দেখা গেল যে স্কুল বর্ষে যতগুলো শব্দ শিক্ষার্থীকে শিখতে হবে তার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ শব্দ সে স্কুলবর্ষের সুরুতেই বানান করতে পারে। প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই দৈনিক একই বানান-শিখনের পাঠ নিতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু উইনেটকায় তা করা হয় না। সেখানে শিক্ষার্থী তার নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী বানানের পাঠগ্রহণ করে থাকে। স্কুলবর্ষের সুরুতে শিক্ষক পরীক্ষা করে দেখেন যে ঐ বর্ষের জন্য নির্ধারিত শব্দগুলির কোন্ কোন্‌গুলি সে জানে না। এইবার ঐ না জানা শব্দগুলি তাকে ঐ বর্ষের মধ্যে শিখে ফেলার ভার দেওয়া হয়। দেখা গেছে এ ব্যবস্থায় অনেক উৎসাহী শিক্ষার্থী একবৎসরের জন্য নির্ধারিত শব্দগুলি একদিনে শেষ করে ফেলেছে। মন্থরগতি শিক্ষার্থীরাও প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে এই পদ্ধতিতে অনেক ভাল ফল দেখায়।

পঠনের ক্ষেত্রেও উইনেটকায় অনুরূপ ব্যক্তিগত শিখনের প্রথার প্রবর্তন করা হয়। প্রথমে শিক্ষার্থীদের স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয় যে কার কি ধরনের পঠনের শক্তি আছে। তারপর গতানুগতিক সম্মিলিত পঠনের প্রথা তুলে দিয়ে ক্লাশে প্রত্যেককে আলাদা আলাদা পড়তে বলা হয়। এর ফলে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীরা

তাদের দোষত্রুটীগুলি শুধরে নিতে পারে এবং সকলেই নিজের নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী এগোতে পারে।

বানান-শিখন ও পঠন থেকে উইনেটকার পরিকল্পনা ক্রমশ গণিত, ভাষা, ইতিহাস এবং ভূগোল শিখনের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়।

মরিসন প্ল্যান (Morrison Plan)

চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এচ্. সি. মরিসন ((H. C. Morrison) এই পরিকল্পনাটির উদ্ভাবক। ডাল্টন প্ল্যান ও উইনেটকা প্ল্যানের মত ব্যক্তিমুখী শিখনের নীতির উপর এই পরিকল্পনাটিও প্রতিষ্ঠিত। পদ্ধতির দিক দিয়েও ঐ প্ল্যান দুটির মত এই প্ল্যানেও এককবিভাজন ও কার্য-ভার বণ্টন (Unit division and assignment) পদ্ধতিটি গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এতেও পঠনীয় বিষয়-গুলিকে কতকগুলি ইউনিট বা এককে বিভক্ত করে সেগুলি শিক্ষার্থীদিগকে পাঠ্যরূপে দিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে।

তবে এই প্ল্যানের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল যে এতে শ্রেণীপ্রথা বজায় রাখা হয়েছে। ডাল্টন প্ল্যান ও উইনেটকা প্ল্যানে যেমন গতানুগতিক শ্রেণী বা ক্লাস-গুলিকে উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় ব্যক্তিমুখী শিখনপ্রথা (প্রথমটিতে সম্পূর্ণভাবে, দ্বিতীয়টিতে আংশিকভাবে) প্রচলিত করা হয়েছে, মরিসন প্ল্যানে তা করা হয় না। এতে সনাতন ক্লাসকে বজায় রেখে সেখানেই ব্যক্তিমুখী শিখনের পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। মরিসন প্ল্যানে অনুসৃত পদ্ধতিটি নিম্নরূপ—

প্রথমে শিখনের একক (learning unit) তৈরী করতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে এককে ভাগ করতে হবে। তারপর নীচের সোপানগুলি পর পর অনুসরণ করতে হবে।

(ক) প্রাক্-পরীক্ষণ (Pre-Test)—পড়ানোর আগে শিক্ষার্থীকে একবার পরীক্ষা করে দেখা হবে। (খ) শিক্ষণ (Teach)—তার পর তাকে পড়ানো হবে। (গ) ফল

পরীক্ষণ (Test the result)—এইবার কি রকম শিখল তার পরীক্ষা করা হবে। (ঘ) ব্যবস্থা অবলম্বন (Adopt procedure)—শেখার মধ্যে যে সব দোষত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা ধরা পড়বে সেগুলি দূর করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। (ঙ) পুনরায় শিক্ষণ (Teach)—আবার শেখান হবে এবং (চ) পুনরায় পরীক্ষণ (Test again)—সর্বশেষে আর একবার তার শেখার পরীক্ষা করা হবে। যতক্ষণ না শিক্ষার্থীর ভাল করে শেখা শেষ হয় ততক্ষণ এ পদ্ধতিটি অনুসরণ করতে হবে।

মরিসন প্ল্যানে ক্লাশ বজায় রাখা হয় বলে ডাল্টন বা উইনেটকা প্ল্যানের মত এখানে প্রত্যেক শিক্ষার্থী স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষালাভের সুযোগ পায় না। এখানে শিক্ষণ দেওয়া হয় দলগত ভিত্তিতেই। সেজন্য উন্নতবুদ্ধি বা নিম্নবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তবে প্ল্যানটির গুণের মধ্যে হল এটি অতি সহজ এবং যে কোন শ্রেণীতে যে কোন বিষয়ের উপর যে কোন শিক্ষক প্রয়োগ করতে পারেন। তাছাড়া এতে স্কুলের প্রচলিত শ্রেণীবিভাগ-ভিত্তিক কাঠামোটি বদলাতে হয় না বলে সাধারণ স্কুল পরিচালকদের এটি গ্রহণে কোন আপত্তি বা দ্বিধা থাকে না।

শিক্ষাকে ব্যক্তিমুখীকরণের (Individualisation) আধুনিক আন্দোলন থেকেই জন্ম নিয়েছে এককভিত্তিক পাঠ-বণ্টন পরিকল্পনা (Unit assignment Plans)। এই পাঠ-একক বা ইউনিটকে কতকগুলি সম্পর্কবিহীন ও বিচ্ছিন্ন অংশ বলে ভাবলে ভুল হবে। এগুলি পাঠ্য বিষয়ের অংশ হলেও এগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতাবিশেষ। বিলেট (Billet) ইউনিটের নিম্নরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন। ইউনিট হল একটি ধারণা, মনোভাব, রসগ্রহণ, গান বা কৌশল যেটি শিক্ষার্থীকে আয়ত্ত করতে হবে এবং যেটি শিক্ষার্থীর চিন্তা বা অন্য কোন আচরণের মধ্যে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনবে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে ইউনিট বা পাঠ-একক মাত্রেই হল সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট অর্জনীয় অভিজ্ঞতাবিশেষ।

ডাল্টন প্ল্যান, উইনেটকা প্ল্যান ও মরিসন প্ল্যান—এই তিনটি প্রসিদ্ধ শিক্ষা-পরিকল্পনায় একক-ভিত্তিক পাঠবণ্টনের পরিকল্পনা ব্যবহৃত হয়েছে।

ডেক্রলি পদ্ধতি (Decroly Method)

বেলজিয়ামের সুবিখ্যাত প্রগতিশীল শিক্ষাবিদ্ অভাইড ডেক্রলি (Ovide

Decroly) একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র শিক্ষণ-পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। এইটি ডেক্রলি পদ্ধতি নামে খ্যাত।

ডেক্রলি প্রথম জীবনে মণ্টেসরির মত চিকিৎসক ছিলেন এবং মণ্টেসরির মতই মানসিক বিকারগ্রস্তদের জন্য একটি স্কুল স্থাপন করেন। ১৯০৭ সালে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সুপ্রসিদ্ধ একোলে দ্য লার্মিটেজ (Ecole de Lermitage) স্থাপন করেন। মুষ্টিমেয় কয়েকটি শিক্ষার্থী নিয়ে স্কুলটি সুরু হলেও ধীরে ধীরে স্কুলটি বড় হতে থাকে এবং ১৯৩২ সালে ডেক্রলির মৃত্যুর সময় প্রায় দু'শ পঞ্চাশ জন ছেলেমেয়ে এই স্কুলে পড়ত।

ডেক্রলির শিক্ষাপদ্ধতির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল যে এতে শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিশুর শিক্ষা হবে অভিজ্ঞতাভিত্তিক বাস্তব জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের মূল কথা হল জীবনযাপনের মধ্যে দিয়ে জীবনের জন্য শিক্ষা (Education for life by living) তাঁর মতে সার্থক শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে নীচের এই পাঁচটি নীতির উপর—

(ক) শিশু হল সজীব প্রাণী এবং তাকে সামাজিক জীবনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।

(খ) শিশু হল সজীব ক্রমবর্ধমান একটি সত্তা। প্রতি মুহূর্তেই সে বাড়ছে। প্রতি বয়সেই সে বিভিন্ন।

(গ) একই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে পার্থক্য থাকে।

(ঘ) বিভিন্ন বয়সে শিশুর মধ্যে কতকগুলি বিভিন্ন আগ্রহ দেখা দেয়। এই আগ্রহগুলিই শিশুর মানসিক কাজকে নিয়ন্ত্রিত করে।

(ঙ) শিশুর আচরণগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আচরণ হল সঞ্চালনমূলক আচরণ। এগুলি যদি বুদ্ধির দ্বারা ঠিকমত পরিচালিত হয় তাহলে শিশুর সব কাজের সঙ্গেই এগুলি সংযুক্ত হয়ে যায়।

ওপরের পাঁচটি নীতিই হল ডেক্রলি-পদ্ধতির মূল কথা। তাঁর মতে প্রত্যেক আদর্শ বিদ্যালয়েই নীচের বৈশিষ্ট্যগুলি থাকবে।

বিদ্যালয়টি স্বাভাবিক পরিবেশে স্থাপিত হবে। শিশুর শিক্ষণীয় বিষয়গুলির সঙ্গে যেন পরিবেশের বাস্তব সংযোগ থাকে।

বিদ্যালয় যেন বৃহদায়তন না হয়। সেখানে ছেলেমেয়েদের সহপাঠের (Co-education) ব্যবস্থা থাকবে। বড় বড় স্কুলে দশ-বার বছর বয়স পর্যন্ত এবং ছোট ছোট স্কুলে আরও বেশী বয়স পর্যন্ত সহপাঠ-প্রথা থাকা উচিত।

বিদ্যালয়ের ঘরগুলি গতানুগতিক শ্রেণী বা ক্লাসের মত হবে না। সেগুলি গবেষণাগার বা কর্মশালা হবে। সক্রিয়তা হবে এই ঘরগুলির প্রধান ধর্ম। আর সেইজন্য ঘরগুলিতে থাকবে কাজ করার উপকরণ—টেবল, বেঞ্চ, আলো, জলের কল, কৃত্রিম উপায়ে তাপসৃষ্টি এবং আলোকনের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

গতানুগতিক শিক্ষকদের জায়গায় থাকবেন অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদেরা। ধীমান কল্পনাসম্পন্ন ও উদ্যমশীল ব্যক্তিরা নেবেন শিক্ষকতার ভার। তাঁরা শিক্ষার্থীদের ভালবাসবেন এবং তাদের ভাল করে জানতে চেষ্টা করবেন।

শিক্ষার্থীর পিতামাতার সঙ্গে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক হবে ঘনিষ্ঠ। কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর শিক্ষাঘটিত সমস্যা নিয়েই যে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা হবে তা নয়, সমগ্র বিদ্যালয়ের লক্ষ্য, পরিকল্পনা, পন্থা ও পদ্ধতির সঙ্গেও তাঁদের পরিচিত করতে হবে।

বিদ্যালয়ে যে দলগুলি তৈরী করা হবে সেগুলি যতদূর সম্ভব যেন সমজাতীয় হয়। দলগত এবং সম্মিলিত কাজের পরিমাণ যত বাড়ান যায় ততই ভাল, কেননা এই ধরনের কাজের মধ্যে দিয়ে সহযোগিতা ও ঐক্য এসে থাকে।

তা বলে ব্যক্তিগত কাজকে অবহেলা করার কথা ডেক্রলি বলেন না। ব্যক্তিগত কাজের মধ্যে দিয়েই শিক্ষার্থীর নিজস্ব সম্ভাবনা ও সৃজনীশক্তি বিকাশলাভ করতে পারে।

ডেক্রলির শিক্ষাপদ্ধতির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল তাঁর পরিকল্পিত 'আগ্রহের কেন্দ্র' (Centre of interest)। ডেক্রলির মতে শিক্ষাকে পূর্ণভাবে শিশুর আগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। গতানুগতিক বিষয়বস্তুগুলি মুখস্থ এবং আবৃত্তি করার পদ্ধতির পরিবর্তে শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ যে যে বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত সেই সেই বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করাই হল মনোবিজ্ঞানসম্মত পন্থা। এই নীতির উপর ভিত্তি করে ডেক্রলি শিক্ষার্থীর কতকগুলি আগ্রহের কেন্দ্রের পরিকল্পনা করেছেন। এই আগ্রহের কেন্দ্রগুলির

সাহায্যে শিক্ষার্থীর চাহিদার সঙ্গে তার শিক্ষণকে সংবদ্ধ করা হয় এবং তার ম৩ প্রকৃত আগ্রহ জাগাবার চেষ্টা করা হয়। ডেক্রলি শিশুর চাহিদাকে চার শ্রেণীতে ভাগ করেছেন যথা, (১) খাদ্যের চাহিদা (২) শীত, তাপ এবং আমাদের জীবনযাত্রায় তাদের প্রভাব ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তিগুলির সঙ্গে সংগ্রামের চাহিদা (৩) আমাদের শত্রুদের থেকে আত্মরক্ষার চাহিদা এবং (৪) কাজ করার চাহিদা।

এই প্রত্যেকটি চাহিদাকে ভিত্তি করে একটি করে আগ্রহের কেন্দ্র তৈরী করা হয় এবং এক একটি কেন্দ্রের উপর পুরো একবৎসর ধরে শিশুর শিক্ষা চলে। ফলে চার বৎসরে চার রকমের চাহিদার উপর শিক্ষা গ্রহণ শেষ হয়। এই আগ্রহের কেন্দ্রগুলিতে বহু বিভিন্নধর্মী সমস্যা নিয়ে শিশুর শিক্ষা চলে এবং তার ফলে ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ইত্যাদি বহু বিভিন্ন বিষয়ে সে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করে।

ডেক্রলির বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা নানা রকম ব্যবহারিক কাজ করার সুযোগ পেত। বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরিচালনা থেকে স্থরু করে ঘরদোর পরিষ্কার করা, সাজসরঞ্জাম সাজান সবই ছেলেমেয়েরা করত। একদলের উপর ভার ছিল স্কুলটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। স্কুলের অধিবেশন ও সম্মেলন প্রভৃতির অনুষ্ঠান করার ভার দেওয়া হত একজন বিনোদন আধিকারিকের (Entertainment officer) হাতে। অনেক ছেলে মেয়ে আবার কাজ করত বাগানে। প্রতিদিন সকালে সব চেয়ে ছোট ছেলেমেয়েরা টেবিল-চেয়ার সাজাত। আবার কোন কোন ছেলেমেয়ের দল স্কুলের পোষা জন্তুদের দেখাশোনা করত আর তাদের বাচ্চাদের বাইরে বিক্রী করত। বড় বড় ছেলেমেয়েরা মুরগী পোষার ভার নিত আর তাদের ডিম, বাচ্চা বাজারে বেচত। বড় বড় ছেলেমেয়েদের দলের উপর ভার থাকত বিদ্যালয়ের সাধারণ পরিচালনার।

ছেলেমেয়েদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগানোর জন্য তাদের সহপাঠীদের কাছে বক্তৃতা দেবার প্রথা প্রচলিত ছিল। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই বক্তৃতার বিষয়বস্তু ঠিক করত। সাধারণত তাদের নিজেদের পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু থেকেই বক্তৃতার বিষয়বস্তু নির্বাচিত হত।

বিদ্যালয় এবং পিতামাতাদের মধ্যে সম্পর্কটি ঘনিষ্ঠ করে তোলাও ডেক্রলির

পদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য। বস্তুত ডেক্রলির স্কুলের প্রতি পিতামাতারা এতই আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে ১৯২৬ সালে একটি পিতামাতাদের সঙ্ঘ স্থাপিত হয়েছিল এবং সঙ্ঘটির উদ্দেশ্য ছিল ডেক্রলির কাজে সমর্থন জানান এবং যাতে অন্যান্য স্থানে ডেক্রলির আদর্শে আরও স্কুল স্থাপিত হয় তার জন্য সাহায্য করা।

ডেক্রলির স্কুলে সকালে হত লেখাপড়া বানান শেখা এবং অঙ্কের কাজ। এগুলি অবশ্য স্বরু করা হত খেলার মধ্যে দিয়ে। বাকী সকালটা নানা রকম অনুশীলনমূলক কাজে ব্যয়িত হত,। পর্যবেক্ষণ, তুলনাকরণ, অঙ্কন, সঙ্গীত এবং নানা রকম খেলাধূলাই এই সময়ের প্রধান কাজ ছিল।

দুপুরবেলা হত হাতের কাজ এবং বিদেশী ভাষা শেখা। কোন কোন সকালে আবার বিশেষ ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হত। নানা স্থান দেখতে যাওয়া ছিল ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য। কখনও কখনও তারা কোন কারখানা বা যাদুঘর দেখতে যেত। আবার কখনও ছেলেমেয়েরা মাছ ধরতে যেত আবার কখনও প্রজাপতি ইত্যাদি ধরতে বেরোতসঞ্চয়ের জন্য ।

বুনিয়াদী শিক্ষা (Basic Education)

বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তক হলেন গান্ধিজী। এটিকে তাঁর দেশবাসীর নিকট তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ দান বলে বর্ণনা করা হয়। ইংরেজ শাসনের অধীনে ভারতে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় চরম দৈন্য ও ব্যর্থতা তাঁকে এই নতুন শিক্ষা-পরিকল্পনাটি উদ্ভাবন করতে অনুপ্রাণিত করে। ১৯৩৭ সালে হরিজন পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তিনি প্রথম এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থাটির একটি পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। ১৯৩৭ সালে ওয়ার্দায় একটি শিক্ষাসম্মেলনে এই পরিকল্পনাটি প্রথম গৃহীত হয়; সেজন্য এটি ওয়ার্ধা পরিকল্পনা (Wardha Scheme) নামে পরিচিত।

পরাধীন ভারতে এই শিক্ষাপরিকল্পনাটির নানা কারণে তেমন প্রসারলাভ ঘটেনি। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হবার পর বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাথমিক স্তরের আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা বলে গ্রহণ করেছেন এবং

প্রচলিত গতানুগতিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার স্থানে যাতে এই নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থাটি গৃহীত হয়, তার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। তাছাড়া বুনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও পাঠক্রম নিয়ে নানারূপ পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং বহুদিক দিয়ে এর সংগঠন ও পদ্ধতিতে নানা পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করা হয়েছে।

বুনিয়াদী শিক্ষার সংগঠন ও পাঠক্রম

বর্তমানে বুনিয়াদী শিক্ষা বলতে ৭ থেকে ১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাকে বোঝায়। ১৯৪৯ সালে জাকীর হোসেন কমিটি এর প্রথম পাঠক্রম তৈরী করেন। পরে এই পাঠক্রমটির প্রয়োজনমত নানা পরিবর্তন করা হয়। এই পরিবর্তিত পাঠক্রমের বর্তমানে গৃহীত রূপটির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

(১) পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যকর ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনযাপনের জন্য অতি প্রয়োজনীয় জ্ঞান অভ্যাস এবং কৌশলসমূহ।

(২) নাগরিকতার শিক্ষা—ব্যবহারিক এবং তত্ত্বমূলক—গৃহে, বিদ্যালয়ে, গ্রামে, শহরে এবং সারা বিশ্বে। এর মধ্যে আছে ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান এবং অর্থ বিজ্ঞানের পাঠ।

(৩) খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় ইত্যাদিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতার ক্ষমতা অর্জন।

(৪) যে কোন একটি বুনিয়াদী শিল্প—কৃষি এবং উদ্যান গঠন, সুতো কাটা এবং বয়ন, কাষ্ঠশিল্প, গৃহনির্মাণ এবং গৃহ সংস্কার।

(৫) সাধারণ বিজ্ঞান এবং গণিত।

বুনিয়াদী শিক্ষার প্রাথমিক পরিকল্পনায় ইংরেজী শিক্ষাকে একেবারেই বাদ দেওয়া হয়েছিল, পরে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ইংরেজীকে একটি বিকল্প বিষয়রূপে নেবার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষান্তর থেকে পাশ করে অন্যান্য শিক্ষায়তন-গুলিতে প্রবেশ করতে হলে ইংরেজীর জ্ঞান অপরিহার্য বলেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষায় হিন্দী একটি অবশ্য পাঠ্য বিষয়।

বুনিয়াদী শিক্ষার সুরু হয় ৭ বৎসর বয়স থেকে এবং ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত। এর পূর্বের স্তরকে বলা হয় পূর্ব বুনিয়াদী স্তর, অর্থাৎ ৭ বৎরের কম বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার স্তর। আর এর পরের স্তরকে বলা হয় উত্তর বুনিয়াদী স্তর, অর্থাৎ ১৪ বৎসর উপরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার স্তর। এই তিন স্তরের শিক্ষার সঙ্গে প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষার স্তর যোগ করলে ব্যক্তির সারা জীবনের শিক্ষাই এই নতুন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। সকল মানুষের সকল স্তরের শিক্ষার এই নতুন পরিকল্পনার নাম দেওয়া হয়েছে নই তালিম বা নতুন শিক্ষা।

বুনিয়াদী শিক্ষাস্তরকেও অনেক জায়গায় দুভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে: নিম্নবুনিয়াদী স্তর—৬ বৎসর বয়স থেকে ১১ বৎসর এবং উচ্চ বুনিয়াদী স্তর—১১ বৎসর বয়স থেকে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত। এই বিভাগ অনুযায়ী বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থা হল মোট আটবৎসর ব্যাপী। অনেক বুনিয়াদী শিক্ষাবিদ বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থাকে এই ভাবে বিভক্ত করার বিরোধী। তাঁদের মতে এতে বুনিয়াদী শিক্ষার অবিভাজ্যতা ও সমগ্রতা নষ্ট হয়ে যায়।

বুনিয়াদী শিক্ষার পদ্ধতি

বুনিয়াদী শিক্ষার প্রথম অভিনবত্ব হল এর কর্মভিত্তিক পাঠসূচী। বুনিয়াদী শিক্ষার কেন্দ্রে থাকবে একটি শিল্প (craft)। শিক্ষার্থীরা সেই শিল্পটি সম্পাদনের মাধ্যমেই অন্যান্য পাঠ্যবিষয়গুলি শিখবে। এই শিখনের পদ্ধতির নাম হল অনুবন্ধ (correlation) পদ্ধতি। উদাহরণস্বরূপ, মনে করা যাক সুতো কাটা ও বয়ন হল কেন্দ্রীয় শিল্প। শিক্ষার্থীদের এই শিল্পটি সম্পাদন করতে নানা রকম কাজ করতে হয়; যেমন, জমিকে চাষের উপযোগী করে তৈরী করা, তুলোর বীজ বপন করা, তুলো কেটে সুতো তৈরী করা, সেই সুতো রঙ করা, তাঁতে সুতো থেকে কাপড় বোনা, নানা রকম নক্সা করা ইত্যাদি। এখন এই কাজগুলি করার সময় শিক্ষার্থীরা প্রাসঙ্গিকভাবে নানা জ্ঞান অর্জন করে। তারা জমি চাষ করার সময় শেখে মাটির প্রকৃতি, বিভিন্ন দেশের মাটির ধর্ম, কোন্ মাটিতে কি ধরনের জিনিস জন্মায় এককথায় ভূবিদ্যা (Geology) ও ভূগোলের (Geography)

নানা প্রয়োজনীয় তথ্য। তেমনই যখন তারা তুলোর গাছ চাষ করে তারা সাক্ষাৎভাবে গাছ, পাতা, ফুল ইত্যাদি সংক্রান্ত বহুবিধ জ্ঞান অর্জন করে, এক কথায় তাদের উদ্ভিদ্‌বিদ্যাও (Botany) পড়া হয়। তারপর যখন তারা কাপড় তৈরী করে তখন তারা শেখে মানুষের পরিধেয়ের বিভিন্ন যুগের মধ্যে ক্রমবিবর্তনের ইতিবৃত্ত। সেই সঙ্গে তারা জানতে পারে বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের পোষাকের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য, পোষাকের সঙ্গে মানুষের সভ্যতা ও শিক্ষার কতটুকু সম্পর্ক—এককথায় তাদের পড়তে হয় ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব (Sociology), এমন কি মনোবিজ্ঞানেরও কিছুটা। কাপড়ের নক্সা তৈরী করার সময় শিক্ষার্থীরা পরিচিত হয় অঙ্কনশিল্পের সঙ্গে। সেই সঙ্গে বেশ কিছু পরিমাণে তাদের সৌন্দর্যবোধের অনুশীলন হয়। কত তুলোয় কত সুতো হল, কত সুতোয় কটা কাপড় হয় ইত্যাদি নির্ণয় করবার সময় তাদের প্রচুর গাণিতিক হিসাব-নিকাশ করতে হয়। তার ফলে তাদের শেখা হল গণিত। আর ভাষার শিক্ষা এই সবরকম জ্ঞান অর্জনের মধ্যে দিয়েই হয়ে থাকে।

এই ভাবে একটি কেন্দ্রীয় শিল্প সম্পাদনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী ভাষা, গণিত থেকে সুরু করে ভূগোল, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি প্রভৃতি সমস্ত পঠনীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রয়োজণীয় জ্ঞানলাভ করে থাকে।

তত্ত্বের দিক দিয়ে এই পরিকল্পনাটি যথেষ্ট প্রশংসনীয় হলেও বাস্তবে শিক্ষকেরা এই পদ্ধতিকে কার্যকরী করতে বেশ অসুবিধা অনুভব করতে লাগলেন। তাঁরা দেখলেন যে একটিমাত্র কেন্দ্রীয় শিল্পের মধ্যে দিয়ে সমস্ত পাঠ্যবিষয়গুলি পড়ান যায় না এবং গেলেও তাদের নির্ধারিত পাঠক্রমটি শেষ করা যায় না। যেমন বয়ন শিল্পের মধ্যে দিয়ে ইতিহাসের অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি শেখান গেলেও পুরো ইতিহাসের পাঠক্রমটি কোনক্রমেই নিছক অনুবন্ধের সাহায্যে শেষ করা যায় না। মাঝে মাঝে বহু ফাঁক থেকে যায় এবং তার ফলে সমস্ত পড়াটাই অসংলগ্ন, বিচ্ছিন্ন ও অসম্পূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। সেইজন্য বর্তমানে কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় শিল্পটিতে অনুবন্ধ প্রণালীকে সীমাবদ্ধ না রেখে শিশুর শারীরিক ও সামাজিক পরিবেশকেও অনুবন্ধের কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। এর ফলে অনুবন্ধ সৃষ্টি করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও স্বাভাবিক হয়েছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থাটি সর্বজনীনভাবে গৃহীত হবার পথে

একটা বড় বাধা থেকে যাচ্ছে। সেটি হল এর শিল্প-কেন্দ্রিকতা। একটি শিল্পকে শিক্ষার কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করার মূলে গান্ধিজীর দুটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম শিশু শিক্ষাকে এর দ্বারা কর্মভিত্তিক করে তোলা হবে, দ্বিতীয়, কোন শিল্পে দক্ষতা লাভ করলে শিশু নানা বস্তু সৃষ্টি বা উৎপাদন করতে শিখবে, এমন কি ভবিষ্যতে ঐ শিল্পকে সে তার বৃত্তি (vocation) বলে গ্রহণ করতে পারবে। গান্ধিজী যে সময়ে এই শিক্ষাব্যবস্থাটির পরিকল্পনা করেন সে সময় ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না, বৃত্তিমূলক শিক্ষার কথা দূরে থাকুক। গান্ধিজী ভাবলেন যে শিল্পের মধ্যে দিয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে শিল্পটি থেকে উৎপন্ন বস্তু বিক্রী করে শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করা যাবে এবং শিশুরাও ভবিষ্যতের জন্য একটি বৃত্তি শিখতে পারবে। এইভাবে তিনি শিক্ষাকে স্বয়ংনির্ভর করতে চেয়েছিলেন। শিক্ষার্থীদের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে বিক্রী করে শিক্ষকদের পারিশ্রমিক দেবার পরিকল্পনাটিকে ইতিপূর্বে সকলেই অবাস্তব ও আদর্শবিরোধী বলে সমালোচনা করেছেন এবং প্রথম থেকেই এই বৈশিষ্ট্যটি পরিত্যক্ত হয়েছে। শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেবার পরিকল্পনাটি প্রগতিশীল হলেও একটিমাত্র শিল্পে শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য নানা দিক দিয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য এর দ্বারা ব্যাহত হয়ে থাকে। প্রথমত ঐ কেন্দ্রীয় শিল্পটি শিক্ষার্থীর কাছে সব সময়েই আকর্ষণীয় না হতে পারে। মনে রাখতে হবে যে বিশেষ কোন শিল্পে শিক্ষার্থীকে পারদর্শিতা লাভ করানই বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য নয়, ঐ শিল্পসংশ্লিষ্ট নানা কাজের মধ্যে দিয়ে শিশুর দেহ-মনের সর্বাঙ্গীণ গঠন আনাই প্রকৃত লক্ষ্য। অতএব দেখতে হবে যে শিল্পটির প্রতি যেন শিক্ষার্থীর আগ্রহ সব সময় সজীব থাকে। দ্বিতীয়ত যে সব শিল্প বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয় তার অধিকাংশ গ্রামে প্রচলিত। যান্ত্রিক শিল্পে উন্নত শহরাঞ্চলে ঐ সব শিল্পের কোন সমাদর নেই। ফলে শহরবাসী পিতামাতারা ছেলেমেয়েদের ঐ সব গ্রামীণ শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে চান না। তৃতীয়ত, এমন অনেক পিতামাতা আছেন যাঁরা ছেলেমেয়েদের শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ারই পক্ষপাতী নন। তাছাড়া বহু শিক্ষাবিদেরই এই মত যে একটিমাত্র শিল্পের মধ্যে দিয়ে শিশুর সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। যে কোন শিল্পেরই সংশ্লিষ্ট কাজের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। ঐ সীমাবদ্ধ কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষাও হয়ে উঠবে সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ।

আধুনিক শিক্ষাবিদেরা এবং আমাদের দেশের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ বুনিয়াদী শিক্ষায়

এই অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করেন। বস্তুত এই কারণেই বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার আমাদের দেশে এত মন্থর। ফলে সাম্প্রতিক কালে বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে কতকগুলি অতিপ্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হয়েছে।

প্রথমত, কেন্দ্রীয় শিল্পকে আর গ্রামীণ শিল্পে সীমাবদ্ধ রাখা হচ্ছে না। বিভিন্ন যান্ত্রিক শিল্পকে কেন্দ্রীয় শিল্পরূপে ব্যবহার করারও ব্যবস্থা হচ্ছে। এর ফলে শহরাঞ্চলের পিতামাতাদের বুনিয়াদী শিক্ষার উপর বিতৃষ্ণা থাকবে না।

শিল্প-কেন্দ্রিক থেকে কর্ম-কেন্দ্রিক

দ্বিতীয় পরিবর্তনটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এতদিন কোন না কোন শিল্পকেই বুনিয়াদী শিক্ষার কেন্দ্রে রাখা হত এবং তার মধ্যে দিয়েই অন্যান্য বিষয়গুলি শেখান হত। কিন্তু বর্তমানে শিল্প ছাড়াও অন্যান্য ধরনের সক্রিয়তাকে শিক্ষণের কেন্দ্ররূপে ধরা হয় এবং তার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন বিষয়গুলি শেখান হয়। এই কেন্দ্রীয় কর্মটি বেশ ব্যাপক ধরনের নেওয়া হয় এবং তার ফলে অনুবন্ধ তৈরী করাও যেমন সহজ হয়ে ওঠে তেমনই বিভিন্ন বিষয়গুলির সূক্ষ্ম ও জটিল অংশগুলি শেখাবার অবকাশ পাওয়া যায়। এই ধরনের সক্রিয়তা কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা যে অনেক বেশী কার্যকরী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। উদাহরণস্বরূপ 'গ্রাম-পরিদর্শন'কে কেন্দ্রীয় কর্মরূপে গ্রহণ করে অনুবন্ধের সাহায্যে ভাষা, ভূগোল, সমাজবিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস ইত্যাদি শেখানো চলতে পারে। যেমন গ্রামটির পুরোনো ইতিহাস আলোচনা, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষগুলির ইতিহাস সংগ্রহ, জনসংখ্যা, অধিবাসীদের ধর্ম, বৃত্তি ইত্যাদি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে ভাষা শেখানো চলতে পারে; সেই সঙ্গে ইতিহাসের পড়াও বেশ ভালোভাবে হয়ে যাবে। গ্রামের উৎপন্ন শস্য ফল, মূল অন্যান্য দ্রব্য রপ্তানী, আমদানী, পথঘাটের বিবরণ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়ে ভূগোল পড়ানো হবে। তেমনি গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য, চিকিৎসার ব্যবস্থা রোগ ও রোগের কারণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যতত্ত্বও পড়া হয়ে যাবে। তেমনি আবার গ্রামের কত ছেলে স্কুলে পড়ে, কত ছেলে পড়ে না, কত লোক নিরক্ষর, মেয়েদের শিক্ষার অবস্থা, গ্রামপঞ্চায়েতের গঠন ও কার্য প্রভৃতির বিবরণী সংগ্রহ করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে

যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করা হবে। আবার গ্রামের মোট ভূখণ্ডের পরিমাণ, লোকসংখ্যা গণনা, নারীপুরুষের অনুপাত নির্ণয়, জমিপিছু শস্য উৎপাদনের হিসাব, কৃষকদের জমির পরিমাণ ইত্যাদি নির্ণয়ের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের গণিত শেখাও হবে।

ওপরের উদাহরণ থেকে এ সিদ্ধান্ত করা যায় যে এই ধরনের ব্যাপকধর্মী কোন সক্রিয়তা বা কর্মকে যদি অনুবন্ধের কেন্দ্ররূপে ধরে নেওয়া হয় তাহলে শিক্ষা অপেক্ষাকৃত অনেক সম্পূর্ণ, চিত্তাকর্ষক ও আয়াসহীন হয়ে উঠতে পারে। কেবলমাত্র একটি শিল্পকে শিক্ষণের কেন্দ্ররূপে ধরে নেওয়ার চেয়ে এই ধরনের সক্রিয়তাকে অনুবন্ধের কেন্দ্ররূপ করা যে অনেক কার্যকরী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এই ধরনের পরিবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনাকে আর শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষা (craft-centred) বলা চলে না। এটিকে আমরা কর্মকেন্দ্রিক (activity-centred) বুনিয়াদী শিক্ষা নাম দিতে পারি। পশ্চিমবঙ্গের বহু স্থানে বুনিয়াদী শিক্ষাকে এই পরিবর্তিতরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

যৌথ কার্যসূচী ও চরিত্রগঠন

বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় যৌথ কর্মসূচী ও ব্যক্তিগত চরিত্র গঠনের উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। পাঠক্রমের অন্তর্গত সমস্ত কার্যাবলীই সম্মিলিতভাবে করার ব্যবস্থা থাকায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলপ্রীতি, সহযোগিতা ও স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি অবশ্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী জন্মলাভ করে থাকে। গান্ধিজী নিজে আদর্শবাদী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষার্থীর মধ্যে ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের পক্ষে অপরিহার্য গুণ ও অভ্যাসগুলি সৃষ্টি করাই হবে প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য। সত্যবাদিতা, স্বাবলম্বন, আত্মসংযম, মিতাচার ইত্যাদি বৃত্তিগুলি যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুষ্টিলাভ করে বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতাগুলিকে সেইমত নিয়ন্ত্রিত করা হয়। স্বাবলম্বন, আত্মনির্ভরতা ও সরলজীবনযাপনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়ে থাকে। নিজেদের জলতোলা, কাপড় ধোওয়া, ঘরদোর পরিষ্কার রাখা, স্কুলঘর

পথঘাট ইত্যাদি পরিষ্কার করা প্রভৃতি সমস্ত কাজই শিক্ষার্থীদের করতে হয়। নিজেদের বোর্ডিং চালান, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা, বাগান তৈরী করা, তরিতরকারী, ফলমূল উৎপাদন করা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীরা শ্রমের মূল্য যেমন শেখে তেমনই শেখে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমাজবদ্ধ জীবনযাপনের অবশ্য প্রয়োজনীয় কাজগুলি।

বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার গুণাবলী

১। আধুনিক শিক্ষাবিদগণ সকলেই একমত যে কেবল বই পড়ে বা বক্তৃতা শুনে কার্যকরী শিক্ষা লাভ করা যায় না। তার চেয়ে কোন কর্ম-সম্পাদনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী অনেক তাড়াতাড়ি শিখতে পারে। বুনিয়াদী শিক্ষায় সমস্ত শিক্ষাই দেওয়া হয়ে থাকে একটি শিল্পের মধ্যে দিয়ে।

২। তা ছাড়া যে শিল্পটি নির্বাচিত করা হয় সেটি সৃজনমূলক ও সামাজিক উপযোগিতা-সম্পন্ন। ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে সামাজিক কল্যাণের বোধ জন্মায়।

৩। শিল্পটি থেকে যে সব বস্তু উৎপন্ন হয় সেগুলি বাজারে বিক্রয় করা যায় এবং তার অর্থে শিক্ষাকে অন্তত কিছু পরিমাণে স্ব-নির্ভর করা যেতে পারে। বুনিয়াদী শিক্ষার এই বৈশিষ্ট্যটি অবশ্য বিশেষভাবে সমালোচিত হয়েছে।

৪। শিল্পের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেবার ফলে নিছক সাহিত্যমূলক শিক্ষার একঘেয়েমি বা বিরক্তি এখানে থাকে না। এখানে শিক্ষা স্বতঃস্ফূর্ত ও আনন্দময়।

৫। কায়িক পরিশ্রমকে পুরোভাগে স্থান দিয়ে এই শিক্ষাব্যবস্থায় কায়িক পরিশ্রমের মর্যাদাকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

৮। গতানুগতিক পুঁথিগত শিক্ষার চেয়ে এই শিক্ষাব্যবস্থা যে অনেক পরিমাণে বাস্তবধর্মী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই ব্যবস্থায় শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীর জীবনের মধ্যে সত্যকারের যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

৯। বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষার্থীর বৃত্তিমূলক পরিচিতি ঘটে। শিক্ষার্থী ইচ্ছা করলে তার শিক্ষাজীবনের শিল্পকে তার জীবনের বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে পারে।

১০। মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে।

১১। শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষা ও সামাজিক জীবনযাত্রার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সমগ্র ব্যক্তিসত্তার বিকাশই এই শিক্ষাব্যবস্থার মূল পরিকল্পনা।

৬। বুনিয়াদী শিক্ষা দেওয়া হয় সামাজিক পরিবেশে। প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীই দলের মধ্যে নিজের স্থান সম্বন্ধে সচেতন এবং বিভিন্ন সমষ্টিগত কাজের মাধ্যমে প্রত্যেককেই সহযোগিতা, বন্ধুপ্রীতি, আত্মত্যাগ প্রভৃতি গুণগুলি শেখে। তাছাড়া স্বাবলম্বন, নততা, আত্মসংযম, মিতাচার ইত্যাদি সদগুণগুলি এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা হয়।

৭। কর্মসম্পাদনের মধ্যে দিয়ে শেখে বলে এই ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী তার সাফল্যের আনন্দ প্রতি পদে ভোগ করে। এর ফলে শিক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হয়। (থর্নডাইকের শিক্ষার ফলভোগের সূত্র)

বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার দোষ

১। একটি মাত্র শিল্পের মধ্যে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তাকে সীমাবদ্ধ রাখার ফলে অনেক সময় তার সহজ কর্মতৎপরতা ব্যাহত হয়ে যেতে পারে এবং তার সৃজনী-শক্তি পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারে না।

২। অনুবন্ধ পদ্ধতি হল বুনিয়াদী শিক্ষাপ্রণালীর প্রধানতম ভিত্তি। কিন্তু এই পদ্ধতিটির কার্যকারিতা সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন। প্রথমত, সব সময় বা সব ক্ষেত্রে বাঞ্ছিত অনুবন্ধ আনা যায় না এবং তার ফলে শিক্ষাদান যান্ত্রিক ও অবাস্তব হয়ে উঠতে পারে। অবশ্য একটি মাত্র শিল্পের মাধ্যমে সমস্ত বিষয়গুলি অনুবন্ধ পদ্ধতির সাহায্যে পড়ানোর অসুবিধা দেখে আজকাল আরও দুটি বিষয়কে মাধ্যম রূপে বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রহণ করা হয়েছে,—শিক্ষার্থীর প্রাকৃতিক পরিবেশ ও শিক্ষার্থীর সামাজিক পরিবেশ।